লেভ তলস্তয়

দুটি বড়ো গল্প

লেভ তলস্তয়

দুটি বড়ো গল্প

লেভ তলস্তয় · দুটি বড়ো গল্প

লেভ তলস্তয় · দুটি বড়ো গল্প

দুটি বড়ো গল্প

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

অনুবাদ: সমর সেন

ছবি এঁকেছেন: মিখাইল রুদাকভ

অঙ্গসজ্জা: ইয়াকভ মালিকভ

Лев Толстой
ПОВЕСТИ
(«Смерть Ивана Ильича»,
«Крейцерова соната»)
На языке бенгали

ইভান
ইলিচের
মৃত্যু

১

আদালতের বড়ো বাড়িটায় মেলভিনস্কি মামলার শুনানি চলেছে, বিরতির সময়ে আদালতের হাকিমরা সবাই অভিশংসকের সঙ্গে জড়ো হলেন ইভান এগরভিচ শেবেকের দপ্তরে, কথা উঠল বিখ্যাত ক্রাসভ মামলার। ফিওদর ভাসিলিয়েভিচ বেশ গরম হয়ে বললেন ওটা আদালতের এক্তালার বাইরে, কিন্তু ইভান এগরভিচকে টলায় কে। গোড়া থেকেই আলোচনায় যোগ দেন নি পিওতর ইভানভিচ, সদ্য আসা খবরের কাগজ পড়ছিলেন তিনি।

'আরে, জানেন আপনারা!' তিনি বললেন, 'ইভান ইলিচ যে মারা গিয়েছেন।'

'সত্যি না কি?'

'এই দেখুন না,' ছাপাখানার গন্ধ-ভরা টাটকা খবরের কাগজটা ফিওদর ভাসিলিয়েভিচের হাতে দিতে দিতে তিনি বললেন।

কালো বর্ডার-দেওয়া জায়গাটায় লেখা ছিল: 'প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা গলোভিনা শোকার্ত হৃদয়ে

আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে জানাইতেছেন যে তাঁর প্রিয় স্বামী, আদালতের বিচারকমণ্ডলীর সদস্য, ইভান ইলিচ গলোভিন ১৮৮২ সালে ৪ঠা ফেব্রুয়ারিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শুক্রবার বেলা এক ঘটিকার সময় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইবে।'

সেখানে সমবেত ভদ্রলোকদের সহকর্মী ছিলেন ইভান ইলিচ, তাঁকে পছন্দ করতেন সবাই। বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর অসুখ; লোকে বলাবলি করত রোগটা আরোগ্যের বাইরে। চাকরি তাঁর বহাল ছিল বটে, কিন্তু কানাঘুষো চলেছিল যে তিনি মারা গেলে হয়ত পদটা পাবেন আলেক্সেয়েভ, আর আলেক্সেয়েভের জায়গায় আসবেন হয় ভিন্নিকোভ নয় শ্তাবেল। তাই ইভান ইলিচের মৃত্যুসংবাদে অফিসে সমবেত ভদ্রলোকদের প্রথমেই মনে হল নিজেদের বা বন্ধুবান্ধবদের চাকরিতে অদলবদল ও পদোন্নতির কথাটা।

ফিওদর ভাসিলিয়েভিচ ভাবলেন, 'শ্তাবেল বা ভিন্নিকোভের জায়গাটা এবার হয়ত পাব। অনেক দিন আগে থেকে আমাকে কথা দেওয়া আছে, আর পদোন্নতির মানে মাইনে বাড়বে আরো আট শ' রুবল, তাছাড়া অফিস খরচার জন্য তো উপরি আছে।'

'কালুগা থেকে শ্যালককে বদলি করাবার জন্য একটা দরখাস্ত ঠুকতে হবে দেখছি,' ভাবলেন পিওতর

ইভানভিচ, 'তাহলে গিন্নী খুশি হবেন। তাঁর বাড়ির লোকের জন্য কিছু করি না বলে আর গঞ্জনা দিতে পারবেন না এখন।'

তারপর সবাইকে শুনিয়ে বললেন পিওতর ইভানভিচ, 'জানতাম ইভান ইলিচ এ ধাক্কা সামলাতে পারবেন না, দুঃখের কথা!'

'ওর ঠিক হয়েছিল কী?'

'ডাক্তাররা সেটা ঠিক করতে পারে নি। মানে, যা ঠিক করেছিল তাতে নানা মুনির নানা মত। শেষবার যখন ওঁকে দেখি তখন সেরে উঠবেন মনে হয়েছিল।'

'ছুটির শুরু হবার পর থেকে আমি আর ওঁর কাছে যাই নি। যাবো-যাবো করে যাওয়া হয় নি।'

'ওঁর টাকাপয়সা কেমন ছিল?'

'স্ত্রীর কিছু সম্পত্তি আছে, মনে হয়, আহা মরি কিন্তু কিছু নয়।'

'হুঁ, এখন একবার যাওয়া দরকার। বাড়িটা বেজায় দূরে।'

'মানে আপনার কাছে দূর। সবকিছুই তো আপনার কাছ থেকে দূর।'

শেবেকের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন পিওতর ইভানভিচ, 'নদীর ওপারে থাকি সেটা আপনার

সইছে না দেখছি।' এর থেকে কথা উঠল সহরে কোনটা কাছে, কোনটা দূরে, তারপর সবাই গেলেন এজলাস ঘরে।

মৃত্যুসংবাদে চাকরির অদলবদল ও পদোন্নতির সম্ভাবনা নিয়ে নানা ভাবনাচিন্তা ছাড়া বরাবরের মতোই আর একটি কথা যা ভেবে সবাই খুশি হলেন সেটি হল — তাঁদের অতি পরিচিত লোকটি মারা গিয়েছে বটে, তাঁরা নিজেরা বেঁছে আছেন।

প্রত্যেকে ভাবলেন বা অনুভব করলেন, 'দেখ দিকি: উনি তো মারা গেলেন, কিন্তু এ শর্মা বেঁচে আছে।' ইভান ইলিচের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁর তথাকথিত বন্ধুদের আপনা থেকেই মনে হল যে এবার বিধবাকে শোক নিবেদন ও অন্ত্যেষ্টির সামাজিকতার ক্লান্তিকর কর্তব্য ঘাড়ে এসে পড়ল।

ইভান ইলিচের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতা ছিল ফিওদর ভাসিলিয়েভিচ ও পিওতর ইভানভিচের।

আইনের শিক্ষায় তাঁর সহপাঠী ছিলেন পিওতর ইভানভিচ, তাছাড়া তাঁর কাছে কিছুটা নিজেকে ঋণীও মনে করতেন তিনি।

সেদিন ডিনারের সময়ে ইভান ইলিচের মৃত্যুর খবর স্ত্রীকে দিয়ে নিজের এলাকায় শ্যালকের বদলি হবার সম্ভাবনার কথাটা তুললেন। তারপর শুয়ে আরাম করে

নেবার বদলে ফ্রক-কোট পরে চললেন ইভান ইলিচের বাড়ি।

ইভান ইলিচের বাড়ির সদর দরজার কাছে একটি বড়ো আর দুটি ছ্যাকড়া গাড়ি। একতলায় টুপি কোট রাখার জায়গার পাশে থোবনা আর মাঞ্জা করা সোনালী লেস দেওয়া কফিনের জরিদার ঢাকনাটা দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা। কালো পোষাক পরা দুটি মহিলা ফার কোট খুলছেন। তাঁদের একজন চেনাশোনা — ইভান ইলিচের বোন; অন্যটি অপরিচিতা। পিওতর ইভানভিচের বন্ধু, শ্ভার্ৎস, সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করে উপরের ধাপ থেকে পিওতর ইভানভিচকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে চোখ ঠারলেন, যেন বলতে চান: 'বোকার মতো পটল তুলে বসলেন ইভান ইলিচ, তবে আপনার আমার কথা আলাদা।'

ইংরেজী কায়দায় গালপাট্টা রাখা, রোগাসোগা দেহে ফ্রক-কোট চাপানো শ্ভার্ৎসের চেহারায় বরাবরকার মতো একটি শালীন গাম্ভীর্যের ভাব; সর্বদাই সরস মেজাজের বিপরীত এই গাম্ভীর্যটায় আজকে বিশেষ একটি ঝাঁঝ এসেছে। তাই মনে হল পিওতর ইভানভিচের।

মহিলাদের আগে যেতে দেবার জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে পিওতর ইভানভিচ তাঁদের পিছনে আস্তে আস্তে

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। শ্ভার্ৎস্ না নেমে দাঁড়িয়ে রইলেন সিঁড়ির মাথায়। কেন সেটা আন্দাজ করলেন পিওতর ইভানভিচ: তাসের আড্ডা কোথায় বসবে ঠিক করার জন্য নিশ্চয়। বিধবার সঙ্গে দেখা করতে ঘরে ঢুকলেন মহিলা দুটি, আর গম্ভীরভাবে ঠোঁট চেপে, চোখে চপল ঝিলিক এনে, পিওতর ইভানভিচকে শ্ভার্ৎস্ ভুরু দিয়ে ইসারা করলেন ডানপাশে মৃত ব্যক্তির ঘরের দিকে।

বরাবর যা হয় ঠিক সেখানে কী করা তাঁর উচিত সেটা স্থির করতে না পেরেই ঘরে ঢুকলেন পিওতর ইভানভিচ। এসব উপলক্ষে বুকে ক্রুশ-চিহ্ন করলে কোনো ক্ষতি হবে না, অন্তত সেটা তাঁর জানা। সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে অভিবাদন জানানোটা উচিত কিনা ঠিক করে উঠতে পারলেন না বলে দুটোর মাঝামাঝি গোছের একটা জিনিস করলেন: ঘরে ঢুকে বুকে আঁকলেন ক্রুশ-চিহ্ন আর একটু যেন মাথা নোয়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে — হাত আর মাথার ঐ ভঙ্গিতে যতদূর সম্ভব — ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। দুটি ছোকরা, তাদের একজন ছাত্র, খুব সম্ভব ইভান ইলিচের ভাইপো, বুকে ক্রুশ-চিহ্ন করে বেরিয়ে গেল। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছেন একটি বৃদ্ধা। বিচিত্রভাবে ভুরু তুলে তাঁকে চুপিচুপি কী যেন বলছেন, আর

একটি পাদ্রী — দৃঢ়চিত্ত চটপটে মানুষ — জোর গলায় কী একটা আওড়াচ্ছেন, ধরনটা শুনে মনে হয় তাঁকে বাধা দেয় কার সাধ্য। ভাঁড়ারের চাকর গেরাসিম পিওতর ইভানভিচের সামনে দিয়ে মেঝেতে কী একটা ছড়াতে ছড়াতে আলতো পায়ে চলে গেল। সেটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে পিওতর ইভানভিচের নাকে এল মৃতদেহে পচ ধরার মৃদু গন্ধ। শেষবার ইভান ইলিচের সঙ্গে দেখা করতে এসে লোকটিকে দেখেছিলেন তাঁর ঘরে, রোগীর দেখাশুনো করছিল সে, ইভান ইলিচ তাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। পিওতর ইভানভিচ বুকে বারবার ক্রুশ-চিহ্ন করতে লাগলেন, আর কোণের টেবিলে রাখা আইকনগুলো, কফিন ও পাদ্রীর মাঝামাঝি একটা দিকে লক্ষ্য করে সামান্য মাথা নোয়াতে লাগলেন। তারপর ক্রুশ-চিহ্নটা বড়ো বেশি করা হচ্ছে মনে হওয়াতে তিনি থেমে মৃতকে ভালো করে দেখে নিতে লাগলেন।

মৃতদেহটি শুয়ে আছে জগদ্দল একটা ভঙ্গিতে, সব মৃতদেহ যেমন; কফিনের গদিতে আড়ষ্ট শরীর ডোবা, বালিশের ওপর দিকে বরাবরের জন্য হেলানো মাথা, মোমের মতো হলদে কপাল, সব মৃতদেহে যেমন দেখা যায়, বসে-যাওয়া রগের ওপরে টাক, উঁচনো নাক যেন ওপরের ঠোঁটটায় চাপ দিচ্ছে। অনেক বদলে

গিয়েছেন ইভান ইলিচ। শেষ যখন পিওতর ইভানভিচ তাঁকে দেখেন তাঁর চেয়ে অনেক রোগা, তবু মারা যাবার পর সবাইকার মতো তাঁরও মুখ হয়ে উঠেছে জীবদ্দশার চেয়ে আরো বেশি সুন্দর, বিশেষ করে আরো ভাবব্যঞ্জক। মুখভাব জানিয়ে দিচ্ছে যা করার ছিল তা করা হয়েছে, করা হয়েছে সঙ্গতভাবে। আরো একটা জিনিস রয়েছে মুখের ভাবে — জীবিতদের প্রতি ভর্ৎসনা বা হুঁশিয়ারি। হুঁশিয়ারিটা অযাচিত, ভাবলেন পিওতর ইভানভিচ, অন্তত তাঁর সঙ্গে এর কোনো তালুকাৎ নেই। কেমন যেন অপ্রীতিকর লাগাতে তিনি আর একবার অত্যন্ত তাড়াতাড়ি — নিজেরি মনে হল ভব্যতার সীমা ছাড়িয়ে — ক্রুশ-চিহ্ন করে, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ঘুরে দরজার দিকে গেলেন।

সদর ঘরে পা বেশ ফাঁক করে, পিছনের দিকে ধরা টপ-হ্যাটটা দুই হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন শ্‌ভার্ৎস্‌। তাঁর চটুল, ফিটফাট মাজাঘষা চেহারা একবারটি চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিওতর ইভানভিচ চ্যাঙ্গা বোধ করতে শুরু করলেন। বুঝতে পারলেন তিনি যে এই ব্যক্তিটি শ্‌ভার্ৎস্‌ হলেন এ সবকিছুর ঊর্ধ্বে, শোকের কবলে নিজেকে ছেড়ে দিতে তিনি নারাজ। তাঁর সমস্ত হাবভাবে একটা জিনিস ব্যক্ত: ইভান ইলিচের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আমাদের

রোজকার জমায়েৎ বাতিল করার মতো কারণ নয়, অর্থাৎ আমাদের সান্ধ্য আড্ডায় নতুন প্যাকেট খুলে তাস ভাঁজায় কোন বাধা দিতে পারবে না, এমনকি ঠিক সে সময়ে ইভান ইলিচের চাকর কফিনের চারপাশে চারটে মোমবাতি বসাতে থাকলেও নয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, ঘটনাটি এমন কিছু নয় যে তার জন্য অন্তত আজকের সন্ধ্যাবেলায় আমাদের ফুর্তি করা চলবে না, এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। ঘর ছেড়ে পিওতর ইভানভিচ বেরিয়ে আসতেই তাঁর কানে কানে তিনি ঠিক এই কথাই জানিয়ে ফিওদর ভাসিলিয়েভিচের বাড়িতে জমায়েৎ হতে বললেন।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় তাসখেলাটা পিওতর ইভানভিচের কপালে নেই মনে হল। খাসকামরা থেকে অন্য কয়েকটি ভদ্রমহিলার সঙ্গে বেরিয়ে এসে প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা যে ঘরে মৃতদেহটি সে ঘরের দরজার কাছে তাঁদের নিয়ে গিয়ে বললেন, 'অন্ত্যেষ্টি এখনি শুরু হবে; ভেতরে চলুন।' ভদ্রমহিলা বেঁটেখাটো, স্থূলকায়া, শতচেষ্টা সত্ত্বেও কাঁধ থেকে নিম্নাংশটা চওড়াই হয়ে আছে, পরনে কালো পোষাক, লেসের ওড়না মাথায়; কফিনের কাছে দণ্ডায়মান মহিলাটির মতো তাঁরো ভুরু বিচিত্রভাবে ওপর দিকে তোলা।

নমস্কার গোছের একটা ভঙ্গি করে, ঘরে ঢোকবার অনুরোধে হ্যাঁ কি না কিছু না বলে দাঁড়িয়ে পড়লেন শ্ভার্ৎস্। পিওতর ইভানভিচকে চিনতে পেরে দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা, সটান কাছে এসে তাঁর হাত ধরে বললেন:

'জানি, আপনি ওঁর সত্যিকারের বন্ধু ছিলেন...' তারপর একথার উপযোগী একটা আচরণের প্রত্যাশায় তাকালেন তাঁর দিকে।

পিওতর ইভানভিচ জানতেন ঘরের ভেতরে ক্রুশ-চিহ্ন করা যেমন উচিত ছিল ঠিক তেমনি তাঁর এখন উচিত ভদ্রমহিলার হাতে চাপ দিয়ে দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলা: 'বিশ্বাস করুন!' আর ঠিক তাই করলেন তিনি; করে বুঝলেন ঠিক ফল ফলেছে। অভিভূত বোধ করছেন তিনি, ভদ্রমহিলাও।

'প্রার্থনা শুরু হবার আগে ওদিকে একবার আসুন, কথা আছে আপনার সঙ্গে,' বললেন বিধবা, 'হাতটা দিন।'

তাঁর হাত ধরে পিওতর ইভানভিচ অন্তরের ঘরে চললেন, পাশ দিয়ে যাবার সময়ে শ্ভার্ৎস্ ক্লিষ্ট মুখে তাকিয়ে চোখ ঠারলেন। 'তাসখেলার দফারফা তাহলে! আপনার জায়গায় কাউকে বসালে কিছু মনে করবেন না যেন। যখন ছাড়া পাবেন তখন না হয়

পঞ্চম খেলুড়ে হয়ে বসবেন,' চটুল চাউনির মানেটা হল এই।

আরো গভীর, আরো বিষণ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন পিওতর ইভানভিচ, আর কৃতজ্ঞভাবে তাঁর হাতে চাপ দিলেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা। নক্সা-কাটা গোলাপী ছাপা কাপড় দেওয়া, মৃদু আলোয় উদ্ভাসিত ড্রয়িং-রুমে ঢুকে টেবিলের পাশে বসলেন দুজনে — প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা সোফায়, পিওতর ইভানভিচ একটা নিচু গদি-আঁটা স্প্রিং-ভাঙা চৌকিতে; বসাতে সেটা কাত হয়ে গেল একবার। প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা বলতে চেয়েছিলেন অন্য চেয়ারে বসুন, কিন্তু মনে হল সাবধান করে দেওয়াটা তাঁর বর্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খাবে না। চৌকিতে বসতে বসতে পিওতর ইভানভিচের মনে পড়ে গেল ড্রয়িং-রুমটা সাজাবার সময়ে সবুজ পাতার নক্সা-কাটা গোলাপী এই ছাপা কাপড়টার বিষয়েই তাঁর পরামর্শ চেয়েছিলেন ইভান ইলিচ। সোফায় বসতে গিয়ে টেবিলটা পেরিয়ে যাবার সময়ে (ঘরটাতে গুচ্ছের আসবাবপত্র আর টুকিটাকি জিনিস) তার খোদাইকরা কাজে বিধবার কালো ওড়নার কালো লেসটা আটকে গেল। ছাড়াবার জন্য অর্ধেকটা উঠলেন পিওতর ইভানভিচ, ওঠাতে চৌকিটা নড়ে চড়ে উঠল, আলগা স্প্রিংগুলো একটু ধাক্কা দিল তাঁকে। আটকে-

যাওয়া লেস নিজেই ছাড়িয়ে নিলেন বিধবা, চৌকিতে আবার বসলেন পিওতর ইভানভিচ, দাবিয়ে দিলেন অবাধ্য স্প্রিংগুলোকে। কিন্তু তখনো লেসটা পুরো ছাড়াতে পারেন নি বিধবা, আবার অর্ধেকটা উঠলেন পিওতর ইভানভিচ, আবার বিদ্রোহ করল গদি-আঁটা চৌকিটা, এমনকি ক্যাঁচকেঁচিয়েও উঠল। ব্যাপারটা সাঙ্গ হবার পরে মিহি মসলিনের রুমাল বের করে কাঁদতে শুরু করলেন বিধবা। কিন্তু লেসের ব্যাপারটায় আর চৌকিটার অবাধ্যপনায় আবেগে ভাটা পড়ে গিয়েছিল পিওতর ইভানভিচের, তিনি মুখ গোমড়া করে বসে রইলেন। এই অস্বস্তিকর অবস্থাটি কেটে গেল ইভান ইলিচের ভাঁড়ারী সকোলভের আগমনে; সে জানাল, কবরখানায় যে জায়গাটি প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা পছন্দ করেছেন তার জন্য দু'শ রুবল লাগবে। কান্না থামিয়ে ভদ্রমহিলা শহীদের দৃষ্টিতে তাকালেন পিওতর ইভানভিচের দিকে, ফরাসীতে বললেন এটা তাঁর পক্ষে খুবই দুঃসহ। কথাটায় নির্বাকে একটা ভঙ্গি করে পিওতর ইভানভিচ বুঝিয়ে দিলেন যে তাতে তিনি একান্ত নিঃসন্দেহ।

'চান তো, সিগারেট খান,' দরাজ অথচ শোকার্ত স্বরে বলে ভদ্রমহিলা কবরের খরচা নিয়ে আলোচনা চালালেন সকোলভের সঙ্গে। সিগারেট ধরিয়ে পিওতর

ইভানভিচ লক্ষ্য করলেন ভদ্রমহিলা কবরখানার নানা জায়গার খরচের বিষয়ে বেশ খুঁটিনাটি খবর নিয়ে ঠিক যেটি নেওয়া দরকার জায়গাটি বেছে নিলেন। ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হলে তিনি অন্ত্যেষ্টি গাইয়েদের কথা নিয়ে আলাপ করলেন। তারপর সকোলভ চলে গেল।

'সবকিছু আমাকে করতে হয়,' টেবিলের ওপরকার এ্যালবামগুলো একপাশে সরিয়ে দিতে দিতে তিনি জানালেন পিওতর ইভানভিচকে। সিগারেটের ছাই টেবিলে পড়ো-পড়ো দেখে তাড়াতাড়ি একটা ছাইদানি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'যদি বলি শোকের চাপে সংসারের কাজকর্মে মন দিতে পারছি না, সেটা ভান করা হবে। বরং যদি কিছু আমাকে... ইয়ে... ঠিক সান্ত্বনা নয়, যদি কিছু আমাকে অন্যমনস্ক রাখতে পারে, সেটা হল ওঁর খাতিরে নানা কাজ করা।' কাঁদার জন্য যেন আবার রুমাল বের করলেন, কিন্তু হঠাৎ জোর করে নিজেকে সামলে নিয়ে মাথা অল্প ঝাঁকিয়ে শান্ত কণ্ঠে কথা বলতে লাগলেন।

'আপনার সঙ্গে কিন্তু একটা কাজ আছে।'

সঙ্গে সঙ্গেই নড়ে চড়ে ওঠা স্প্রিংগুলোকে বেয়াড়া হতে না দিয়ে একটু মাথা নোয়ালেন পিওতর ইভানভিচ।

'শেষের কটা দিন উনি অসহ্য কষ্ট পেয়েছিলেন।'

'খুব কষ্ট?' জিজ্ঞেস করলেন পিওতর ইভানভিচ।

'উঃ, অকথ্য কষ্ট পেয়েছিলেন! শেষের দিকে ক্রমাগত চেঁচাতেন, কয়েক মিনিট ধরে নয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একেবারে হাঁফ না ফেলে একটানা তিন দিন চেঁচিয়েছিলেন। অসহ্য ব্যাপার। কী করে সয়েছি নিজেই জানি না; তিনটে ঘর ছাড়িয়েও ওঁর গলার আওয়াজ পাওয়া যেত। আমাকে যা সহ্য করতে হয়েছে যদি জানতেন!'

'তার মানে, শেষ পর্যন্ত সজ্ঞানে ছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ,' ফিসফিস করে প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা বললেন, 'একেবারে শেষ পর্যন্ত। মারা যাবার মাত্র পনেরো মিনিট আগে বিদায় নিলেন আমাদের কাছ থেকে, বললেন ভলোদিয়াকে সরিয়ে নিয়ে যেতে।'

নিজের এবং এই ভদ্রমহিলার ভণ্ডামির একটা অপ্রীতিকর চেতনা মনে, তাহলেও অতিপরিচিত একটি লোকের যন্ত্রণার কথা ভেবে অত্যন্ত বিচলিত লাগল পিওতর ইভানভিচের; মানুষটিকে তিনি প্রথম জানতেন হাসিখুশি ছোট ছেলে হিসেবে, তারপর স্কুলের ছাত্র, তারপর প্রাপ্তবয়স্ক সহকর্মী হিসেবে। আবার চোখের সামনে ভেসে এল তাঁর কপাল, ওপরের ঠোঁটের ওপর

ঝুলে-পড়া নাক, আর নিজেকে নিয়ে আতঙ্কে মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

'তিন দিন অসহ্য যন্ত্রণা, তারপর মৃত্যু। যে-কোনো সময়ে আমারো তো এটা হতে পারে,' ভেবে মুহূর্তের জন্য ভয়ঙ্কর লাগল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, কেন তাঁর নিজেরি অজানা, এই মামুলি কথাটি মনে পড়াতে তিনি স্বস্তি পেলেন যে এটা ঘটেছে ইভান ইলিচের বেলায়, তাঁকে নিয়ে নয়, এ-রকম কিছু তাঁর বেলায় ঘটতে পারে না, ঘটবে না; এ ধরনের ভাবনা-চিন্তায় মেজাজ শুধু খারাপ হয়ে যাবে, সেটা করা উচিত নয়। শ্‌ভার্ৎসের মুখে সে কথাটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে পিওতর ইভানভিচ ইভান ইলিচের মৃত্যুর বিশদ বর্ণনায় এমনকি সত্যিকার আগ্রহ পর্যন্ত দেখাতে সুরু করলেন, যেন মৃত্যু এমন একটি ব্যাপার যেটা ঘটতে পারে শুধু ইভান ইলিচের বেলায়, তাঁর নিজের নয়।

ইভান ইলিচের বাস্তবিক ভয়াবহ শারীরিক যন্ত্রণার বিস্তৃত বিবরণ দেবার পর কেবল (কী ভয়ানক স্নায়বিক কষ্ট পেয়েছিলেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা শুধু তা থেকেই ইভান ইলিচের যন্ত্রণার মাত্রাটা জানতে পারলেন পিওতর ইভানভিচ) বিধবা কাজের কথা পাড়া দরকার মনে করলেন।

‘সত্যি, পিওতর ইভানভিচ, আমার কপাল কী খারাপ, কী সাংঘাতিক খারাপ,’ বলে আবার কাঁদতে বসলেন তিনি।

দীর্ঘশ্বাস মোচন করে পিওতর ইভানভিচ কখন উনি নাক ঝেড়ে সামলে উঠবেন তার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। নাক ঝাড়া হল, তিনি বললেন:

‘বিশ্বাস করুন...’ ভদ্রমহিলা আবার কথা বলতে সুরু করে তাঁর সঙ্গে আসল কাজের কথাটি পাড়লেন। স্বামীর মৃত্যু হলে সরকারের কাছ থেকে অর্থসাহায্য কী করে পাওয়া যায়, প্রশ্নটা সে বিষয়ে। ভাবটা এমন যেন পেনসনের ব্যাপারে পরামর্শ চাইছেন কিন্তু পিওতর ইভানভিচের বুঝতে বাকি রইল না যে মহিলাটি খুঁটিনাটি এমন অনেক কিছু জানেন যা এমনকি তাঁরো অজ্ঞাত। স্বামীর মৃত্যুর দরুন কত টাকা প্রাপ্য তার পাইপয়সা পর্যন্ত জানা আছে তাঁর, উনি শুধু খোঁজ করছেন কোনো উপায়ে আরো বেশি আদায় করা যায় কিনা। সেটা কি করে করা যায় পিওতর ইভানভিচ চিন্তা করে দেখলেন; কিছুক্ষণ বিবেচনার পর শিষ্টতা বশে যা করা উচিত সেভাবে কিপটেমির জন্য সরকারের নিন্দা করে জানিয়ে দিলেন বেশি টাকা পাওয়া সম্ভব নয় মনে হচ্ছে। এতে দীর্ঘনিশ্বাস টেনে ভদ্রমহিলা স্পষ্টতই চিন্তা করতে লাগলেন কী

করে এই দেখাসাক্ষাতটা শেষ করা যায়। সেটা টের পেয়ে পিওতর ইভানভিচ সিগারেটটি নিভিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বিধবার করমর্দন করে গেলেন হলে।

খাবার ঘরে সেই ঘড়িটি টাঙানো যেটি পুরনো ছোটখাটো জিনিসের দোকানে কিনতে পেরে ইভান ইলিচ মহাখুশি হয়েছিলেন; সেখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য আগত পাদ্রী এবং আরো কয়েকটি চেনাশুনো লোককে দেখতে পেলেন পিওতর ইভানভিচ, আর দেখলেন তাঁর পরিচিতা ইভান ইলিচের সুন্দরী কন্যাকে। মেয়েটির গায়ে আগাগোড়া কালো পোষাক, তাতে তার পাতলা কোমর আরো পাতলা দেখাচ্ছে। মুখে বিষণ্ণ, দৃঢ়, প্রায় ক্রুদ্ধ একটি ভাব। এমনভাবে মাথা নুইয়ে পিওতর ইভানভিচকে নমস্কার জানাল সে যেন তিনি কী একটা অপরাধ করেছেন। পিছনে দাঁড়িয়ে যে যুবকটি, তার মুখেও ঠিক তেমনি একটা আহত ছাপ। যুবকটিকে জানেন পিওতর ইভানভিচ— অবস্থাপন্ন, তদন্তকারী হাকিম, লোকে বলে তিনি তরুণীটির বাগদত্ত। মাথা নামিয়ে শোকার্ত অভিবাদন জানিয়ে মৃতদেহ যে ঘরে সেখানে ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছেন পিওতর ইভানভিচ, এমন সময়ে ইভান ইলিচের ছেলেকে দেখা গেল সিঁড়িতে; জিমনাসিয়ামের ছাত্র সে, বাপের চেহারার সঙ্গে ভয়ানক আদল। আইনের

ছাত্র হিসেবে যে ছোকরা ইভান ইলিচকে চিনতেন পিওতর ইভানভিচ, অবিকল তারি মতো। চোখ তার কে'দে কে'দে লাল, সে চোখ তেরো-চোদ্দ বছরের এ'চড়ে পাকা ছেলেদের মতো। পিওতর ইভানভিচকে দেখতে পেয়ে কঠিন মুখে ভরু কোঁচকাল সে সংকোচভরে। তার দিকে মাথা নেড়ে, মৃতদেহ যে ঘরে সেখানে গেলেন পিওতর ইভানভিচ। সুরু হল অন্ত্যেষ্টি। মোমবাতি, কাতরোক্তি, ধূপ, অশ্রুজল, ফোঁপানি। ভুরু কুঁচকে, চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন পিওতর ইভানভিচ। মৃতদেহের দিকে চাইলেন না একবারও, শোকের প্রভাবে নিজেকে ছেড়ে দিলেন না, ঘর ছাড়লেন আগেভাগে। কোট রাখার ঘরে কেউ ছিল না। ভাঁড়ারের চাকর গেরাসিম তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তার পালোয়ানী হাত দিয়ে সবকটি ওভারকোট হাতড়ে হাতড়ে তাঁর কোটটি বের করে এগিয়ে ধরল।

'তা ভায়া, গেরাসিম,' একটা কিছু তো বলতে হয়, তাই পিওতর ইভানভিচ বললেন, 'খারাপ লাগছে?'

'ভগবানের ইচ্ছে, হুজুর। সবাইকে তো মরতে হবে একদিন,' এক পাটি শক্ত অটুট ঝকঝকে চাষীর দাঁত দেখিয়ে বলল গেরাসিম; তারপর অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত লোকের মতো দরজা খুলে হাঁক দিয়ে ডাকল কোচওয়ানকে, পিওতর ইভানভিচকে গাড়িতে তুলে

দিয়ে দৌড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠল অলিন্দে, যেন আবার কিছু একটা করার কথা মনে পড়ে গিয়েছে।

ধূপ, মৃতদেহ ও কার্বোলিক এ্যাসিডের গন্ধের পর বাইরের তাজা হাওয়া বুক ভরে নিতে বিশেষ ভালো লাগল পিওতর ইভানভিচের।

'কোথায় যাবেন, কর্তা?' কোচওয়ান জিজ্ঞেস করল।

'এখনো খুব দেরি হয় নি। একবার ফিওদর ভাসিলিয়েভিচের ওখানে ঘুরে আসি।'

রওনা দিলেন তিনি। গিয়ে দেখলেন প্রথম রাবারটা ওরা সবেমাত্র শেষ করেছে, পরের খেলায় পঞ্চম খেলুড়ের জায়গায় বসতে কোনো অসুবিধা তাঁর হল না।

২

ইভান ইলিচের জীবন কাহিনী খুবই সহজ ও সাধারণ এবং খুবই ভয়াবহ।

ইভান ইলিচ ৪৫ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি বিচারকমণ্ডলীর সদস্য। তাঁর বাবা ছিলেন সরকারী চাকুরে, পিটার্সবুর্গে নানা মন্ত্রিদপ্তরে ও বিভাগে তিনি সেই ধরনের চাকুরে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন যেটা লোককে শেষ পর্যন্ত এমন একটা

পদে বসায় যেখান থেকে তাঁদের সরানো অসম্ভব, যদিও সবাই জানে সত্যিকার কোনো কাজ করার ক্ষমতা তাঁদের নেই, তবু দীর্ঘকালের চাকরি ও উচ্চ পদের খাতিরে সরানো যায় না তাঁদের, আর তাই বানিয়ে নেওয়া নানা অবাস্তব পদে বহাল হয়ে থেকে ছ' থেকে দশ হাজার রুবলের বাস্তব মাইনে পেয়ে তাঁরা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকেন।

এ রকম একটি ব্যক্তি ছিলেন প্রিভি কাউন্সিলার ইলিয়া এফিমভিচ গলোভিন, নানা ফালতু প্রতিষ্ঠানের ফালতু সদস্য।

তিনটি ছেলে তাঁর, মেজটি হল ইভান ইলিচ। বড়োটি অন্য একটি মন্ত্রিদপ্তরে ঠিক বাপেরি মতো চাকরি বাগিয়ে বসেছেন, অনতিবিলম্বে তিনি কর্মাবস্থার সেই বয়সে উত্তীর্ণ হবেন যখন কিছু না করে বেতন পাওয়া যায়। তৃতীয় ছেলেটি কোনো সুবিধে করে উঠতে পারেন নি। নানা চাকরিতে দুর্নাম কিনে এখন রেলওয়ে দপ্তরে বহাল তিনি। বাপ এবং ভাইয়েরা, বিশেষ করে বৌদিরা তাঁকে এড়িয়ে চলেন, তাই শুধু নয়, — একান্ত কোনো প্রয়োজন না থাকলেও এমনকি তাঁর অস্তিত্বের কথাই ভুলে থাকতে পারলে তাঁরা বাঁচেন। বোনের বিয়ে হয়েছে ব্যারন গ্রেফের সঙ্গে, জামাইটি ঠিক শ্বশুরের মতোই সেণ্ট-পিটার্সবুর্গী

সরকারী চাকুরে। ইভান ইলিচ ছিলেন le phenix de la famille*, সবাই তাই বলত। বড়ো ভাইয়ের মতো কঠোর ধরাবাঁধার মধ্যে তিনি থাকতেন না, আবার ছোট ভাইয়ের মতো বেপরোয়াও ছিলেন না। দুজনের মাঝামাঝি গোছের কিছু — বুদ্ধিমান, সজীব, প্রীতিকর ও সৌজন্যশীল মানুষ, আইনের স্কুলে পড়েছিলেন তিনি ছোট ভাইয়ের সঙ্গে। পাঠ শেষ করতে পারেন নি ছোট ভাই, পঞ্চম ক্লাসে পেঁছনোর পর স্কুল থেকে বিতাড়িত হন তিনি। ইভান ইলিচ সসম্মানে উত্তীর্ণ হন পরীক্ষায়। আইনের ছাত্র হিসেবে তিনি যা ছিলেন, গোটা জীবনভর ঠিক তেমনটাই থেকে যান: দক্ষ, হাসিখুশি, দিলদরাজ ও মিশুক, কিন্তু যা কর্তব্য বিবেচনা করেন তার পালনে অত্যন্ত কড়া, আর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা যে সব জিনিসকে কর্তব্য বলে ধরে দিতেন সেগুলিকেই কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা তিনি করতেন। কী ছেলেবেলায়, কী বয়সকালে কারো পদলেহন করেন নি তিনি, কিন্তু কৈশোর থেকে মান্যগণ্য লোকেরা তাঁকে আকর্ষণ করতেন, পতঙ্গকে যেমন আকর্ষণ করে অগ্নিশিখা; তাঁদের হাবভাব ও মতামত আয়ত্ত করে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে হৃদ্যতা বজায় রেখে চলতেন। শৈশব

---

* কুলতিলক।

ও যৌবনের সমস্ত নেশা তাঁর নিশ্চিহ্নে কেটে যায়; এককালে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও আত্মাভিমানের ঝোঁক ছিল তাঁর, ছাত্র-জীবনের শেষের দিকে উদারপন্থা নিয়ে মেতেছিলেন, কিন্তু এ সবকিছু সহজাত বোধের সুচিন্তিত গণ্ডি ছাড়ায় নি কখনো।

ছাত্র-জীবনে তিনি এমন কয়েকটি কাজ করেছিলেন যা নিজের কাছে ঠেকেছিল কদর্য, এনেছিল আত্মগ্লানি, কিন্তু পরে যখন দেখলেন উচ্চপদস্থ লোকেরাও একই কাজ করেন, খারাপ বিবেচনা করেন না, সে সব স্মৃতি মুছে গেল মন থেকে। কাজগুলো যে ভালো বলে মনে করলেন তা নয়, কিন্তু পাপের স্মৃতিতে বিবেকদংশন হত না তাঁর।

আইন অধ্যয়ন শেষ হল, পোষাকের দরুন বাবার কাছে টাকা পেয়ে শার্মারের দোকানে কয়েকটি স্যুটের অর্ডার দিলেন ইভান ইলিচ, কোটের বুকে respice finem* লেখা বড়ো একটা পদক পিন দিয়ে এঁটে বিদায় নিলেন স্কুলের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের কাছ থেকে, দোননে মহা আড়ম্বরে খানাপিনা চলল বন্ধুদের সঙ্গে, তারপর সেরা সেরা দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে

---

* শেষ দেখে রাখো।

বানানো বা কেনা সৌখীন ব্যাগ, স্যুট, অন্তর্বাস, দাড়ি কামাবার ও প্রসাধনের সামগ্রী নিয়ে চললেন একটি মহকুমা সহরে; সেখানে প্রদেশপালের অধীনে বিশেষ কার্যাধ্যক্ষের পদ তাঁর জন্য জোগাড় করে রেখেছিলেন তাঁর পিতৃদেব।

মহকুমা সহরে ছাত্র-জীবনের মতোই সহজে স্বাচ্ছন্দ্যে গুছিয়ে বসতে এতটুকু সময় লাগল না ইভান ইলিচের। খাটতেন তিনি, চাকরি উন্নতিতে মন ছিল, সঙ্গে সঙ্গে চলত প্রীতিকর ও ভব্য অবসরবিনোদন। বড়োকর্তার নির্দেশে মাঝেমাঝে উয়েজ্‌দে যেতেন তিনি, তখন নিম্ন ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যবহারে নিজের মর্যাদা বজায় রেখে চলতেন, নিখুঁতভাবে ন্যস্ত কাজের ভার (বেশি ভাগ সময়ে বিরোধী খৃষ্টানদের নিয়ে তাঁর কাজ থাকত) সম্পন্ন করতেন ঘুষ না নিয়ে, সততার সঙ্গে, সে নিয়ে গর্ব করার যথার্থ কারণ তাঁর ছিল।

সরকারী কর্তব্যকর্মের সম্পাদনে নিজের অল্প বয়স ও আমোদপ্রীতি সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংযত, চালচলনে সরকারী, এমনকি কড়া। কিন্তু সামাজিক জীবনে তিনি হাসিখুশি, রসিক, খোশমেজাজী, সভ্য মানুষ; বড়োকর্তা ও তাঁর স্ত্রীর

কাছে তিনি ছিলেন বাড়ির লোকের মতো, তাঁরা তাকে বলতেন bon enfant*।

সৌখীন নতুন এ্যাডভোকেটকে দেখে পাগল অনেক মহিলার মধ্যে একজনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হল মফঃস্বলে; তাছাড়া ছিল একটি মেয়ে টুপি-নির্মাতা; ছিল কাজে-আসা বাইরের অফিসারদের সঙ্গে মদের পার্টি আর সাপারের পর দূরের পাড়ার রাস্তায় একটি বাড়িতে গমন। বড়োকর্তার এমনকি তাঁর স্ত্রীরও কিছু তোষামোদ করতে হত; কিন্তু এ সব করা হত এমন মার্জিত ভব্য ভাবে যে নিন্দে করা শক্ত; এ সবই পড়ে একটি ফরাসী প্রবচনের আওতায়: il faut que jeunesse se passe**। এ সবই চলত হাতে বা শার্টে ময়লা না লাগিয়ে, ফরাসী বাক্যের মাধ্যমে আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল, চলত উচ্চ-সমাজে, তার মানে এ সব অনুমোদন করেন সমাজের চাঁইরা।

পাঁচ বছর এ পদে ইভান ইলিচ বহাল থাকার পর চাকরিতে রদ-বদল হল। প্রতিষ্ঠিত হল আইনের নতুন নানা বিভাগ, দরকার পড়ল নতুন লোকের।

নতুন লোকেদের একজন হলেন ইভান ইলিচ।

---

* খাসা ছেলে।

** যৌবনে সবকিছু মাফ।

তদন্তকারী হাকিমের পদে যাবার প্রস্তাব এল। পদটি নিলেন তিনি, যদিও নেওয়ার মানে অন্য গুবেরনিয়ায় বদলি হওয়া, বর্তমান সমস্ত সম্পর্কের বিচ্ছেদ, নতুন সম্পর্ক পাতানো। ইভান ইলিচের বিদায় উপলক্ষে একটি পার্টি দেওয়া হল, একসঙ্গে জমলেন বন্ধুরা, রুপোর সিগারেট-কেস বন্ধুদের কাছে উপহার হিসেবে পেয়ে তিনি গেলেন নতুন চাকরিতে যোগ দিতে।

প্রদেশপালের বিশেষ কার্যাধ্যক্ষ থাকার সময়ে যেমনটা ঠিক তেমনটা রইলেন ইভান ইলিচ তদন্তকারী হাকিম হিসেবে: ঠিক সেই সুসমীচীন ও ভব্য ভাব, চাকরির কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনকে আলাদা রাখা ও নিজের প্রতি সাধারণের সমীহ জাগানোর সেই ক্ষমতা। নতুন কাজটি আগেকার তুলনায় অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক ও প্রীতিকর মনে হল তাঁর। অবশ্য আগের চাকরিতে, শার্মারের তৈরী পরিপাটি পোষাক চাপিয়ে স্বচ্ছন্দ দীর্ঘ পদক্ষেপে, বসবার-ঘরে প্রতীক্ষমাণ, তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত উৎকণ্ঠিত উমেদার ও কেরানিবৃন্দ সটান পার হয়ে বড়োকর্তার ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে চা ও ধূমপান করাটায় বেশ আত্মপ্রসাদ হত। কিন্তু সেখানে সরাসরি তাঁর অধীনস্থ লোকের সংখ্যা বেশী ছিল না — শুধু ছিল থানাদার আর বিরোধী খৃষ্টানরা,

গ্রামাঞ্চলে বিশেষ কাজে গেলে দেখা হত তাদের সঙ্গে। আর তাদের মতো অধীনস্থ লোকেদের সঙ্গে ভব্য, প্রায় দোস্তের মতো ব্যবহার, তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যে যদিও তাদের পিষে ফেলার ক্ষমতা তিনি ধরেন তবু ব্যবহারটা করছেন বন্ধুর মতো সহজভাবে — এটা ভালো লাগত তাঁর। কিন্তু এরকম কটা লোকই বা ছিল! আর এখন তদন্তকারী হাকিম হিসেবে তাঁর মনে হল যে সবাই— বিনা ব্যতিক্রমে সবাই — যতই হর্তাকর্তা ও দাম্ভিক লোক হোক না কেন — সবাই তাঁর নাগালে, সরকারী কাগজে কয়েকটি কথা লিখে দিলেই, ব্যস, অত্যন্ত হর্তাকর্তা ও দাম্ভিক এই ব্যক্তিকেও আসতে হবে তাঁর কাছে আসামী বা সাক্ষী হিসেবে, আর তিনি অনুগ্রহ করে তাদের বসতে না বললে সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। নিজের ক্ষমতার সুযোগ কখনো নেন নি ইভান ইলিচ; বরং সেটাকে নরম করে প্রকাশেরই চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নিজের ক্ষমতার এই উপলব্ধি, সদাশয় হবার এই সুযোগ তাঁর কাছে ছিল নতুন চাকরিটির সবচেয়ে বড়ো কথা এবং আকর্ষণ। কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের সময়ে, অর্থাৎ শুনানির সময়ে যেসব বিষয়ে তদন্তকারী হাকিম হিসেবে তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নেই, সেসব বাদ দেবার কৌশল তিনি সত্বর রপ্ত করে নিলেন, আর এমনকি সবচেয়ে জটিল

মামলাগুলিকেও এমন রূপে পেশ করতেন, যাতে দলিলে থাকত শুধু তার বাহ্য দিকটা, ব্যক্তিগত মতামতের নামগন্ধ থাকত না, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন মানা হত কাঁটায় কাঁটায়। কাজটি নতুন: বিচারবিধিতে ১৮৬৪-এর নানা সংস্কারকে বাস্তব রূপ যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন ইভান ইলিচ।

তদন্তকারী হাকিম হিসেবে নতুন সহরে এসে নতুন আলাপ পরিচয় ও যোগাযোগ হল তাঁর, ব্যবহারে নতুন কায়দা, কথাবার্তায় নতুন সুর আনলেন তিনি। এবারে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে সসম্মানে নিজেকে দূরে রেখে আদালতী মহল ও ধনী অভিজাতদের মধ্যে থেকে বাছাই করলেন বন্ধুবান্ধব, ভাব নিলেন একটি নরম উদারনীতি ও সুসভ্য সামাজিক সচেতনতার, মাঝে মাঝে সরকারকে অল্প সমালোচনা করতে ছাড়তেন না। পোষাকে আষাকে যত্নের ত্রুটি ছিল না, কিন্তু দাড়ি কামানো ছেড়ে দিলেন, দাড়ি যেমন খুসি গজাক গে।

নতুন সহরে তাঁর জীবনযাত্রা বেশ প্রীতিকর হয়ে দাঁড়াল। প্রদেশপালের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীটা দেখা গেল বেশ বন্ধুভাবাপন্ন ও ভালো; আয় বেড়েছে, হুইস্ট খেলা শিখে নেওয়াতে তাঁর মনোরঞ্জনের মশলা বেড়ে

গেল। সাধারণত খোশমেজাজে তাস খেলার ও দ্রুত কূটচাল দেবার ক্ষমতা ছিল বলে তিনি বেশীর ভাগ সময়ে জিততেন।

নতুন সহরে দু'বছর কাটার পর ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল ইভান ইলিচের। যে গোষ্ঠীতে তিনি ঘুরতেন তার মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী, চোখ-ধাঁধানো, মন-মাতানো মহিলা হলেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা মিখেল। তদন্তকারী হাকিমের কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিজের অন্যান্য নানা অবসর বিনোদনের মধ্যে প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনার সঙ্গে একটা হালকা ফষ্টিনষ্টি গোছের একটা সম্পর্ক পাতালেন ইভান ইলিচ।

বিশেষ কার্যাধ্যক্ষ থাকার সময় ইভান ইলিচ সাধারণত নাচতেন; তদন্তকারী হাকিম হিসেবে কদাচিৎ। নাচতেন এইটা দেখাবার জন্য যে নতুন বিধির সিদ্ধদাতা ও উচ্চশ্রেণীর আইনজ্ঞ হলেও নাচের ব্যাপারে তিনি কারোর পিছনে পড়ে নেই। তাই পার্টির শেষ দিকটায় মাঝে মাঝে তিনি নাচতেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনার সঙ্গে, আর বিশেষ করে এ সময়টাতেই তিনি জয় করে ফেললেন তাঁকে। তাঁর প্রেমে পড়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। বিয়ে করার কোনো পরিষ্কার, সুনির্দিষ্ট অভিলাষ ছিল না ইভান ইলিচের,

কিন্তু মেয়েটি তাঁর প্রেমে পড়াতে নিজেকে শুধাবার সময় এল, 'সত্যি, বিয়ে না করারই বা কী আছে?'

প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা কুলীন অভিজাত ঘরের মেয়ে, চেহারাটি বেশ; তাছাড়া কিছু টাকাকড়ি ছিল তাঁর। হয়ত আরো ভালো বিয়ে করতে পারতেন ইভান ইলিচ, কিন্তু এটিও তো বেশ। নিজের বেতন আছে; মেয়েটির আছে নিজের টাকা, সেটা তাঁর বেতনের সমানই হবে আশা করলেন ইভান ইলিচ। যোগ্য শ্বশুরশাশুড়ী মিলবে। মেয়েটি মধুর সুন্দর, অত্যন্ত মার্জিতা। তাঁকে ভালোবাসেন বলে, তাঁর সঙ্গে মেয়েটির মনের মিল আছে বলে যে ইভান ইলিচ বিয়ে করলেন, সেটা বলা যেমন ভুল হবে, নিজের দলের লোকেরা বিয়েটির পক্ষপাতী বলে বিয়ে করলেন একথা বলাও ঠিক তেমনি অন্যায় হবে। দুটো জিনিসই ভেবেচিন্তে বিয়ে করলেন তিনি: বিশেষ এই মেয়েটিকে ঘরে এনে নিজের প্রীতিকর একটি কাজ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে উচ্চপদস্থরা যেটা তাঁর করা সমীচীন বলে মনে করতেন সেটিও করা হল।

সুতরাং বিয়ে করলেন ইভান ইলিচ।

বিয়ের ক্রিয়াকাণ্ড, বিবাহিত জীবনের প্রথম পর্বটি, দাম্পত্য সোহাগ, নতুন আসবাপত্র, নতুন বাসনকোসন, নতুন জামাকাপড়, — স্ত্রী প্রথম সন্তানসম্ভবা হওয়া

পর্যন্ত এসব কাটল বেজায় ভালো ভাবে; বাস্তবিক এত ভালো করে কাটল যে ইভান ইলিচ ভাবতে শুরু করলেন সাধারণভাবেই জীবনের যা বৈশিষ্ট্য তেমন একটা খাসা, নিরুদ্বেগ, হাসিখুশি এবং সর্বদাই সভ্যভব্য ও সমাজ-অনুমোদিত জীবনের পথে বিয়েটা কোনো বাধাই নয়, বরং সহায়। কিন্তু স্ত্রীর গর্ভাবস্থার প্রথম কয়েক মাসেই তিনি নতুন একটি জিনিসের সম্মুখীন হলেন, যেটি অপ্রত্যাশিত, অপ্রীতিকর, অভব্য, সহ্য করা কঠিন; সেটি আগে থেকে জানবারও উপায় ছিল না, কোনো উপায় নেই সেটাকে এড়ানোরও।

বিনা কারণে — ইভান ইলিচের মতে, de gaité de coeur* তাঁর স্ত্রী জীবনযাত্রার আনন্দ ও ভব্যতায় ব্যাঘাত ঘটাতে শুরু করলেন: একেবারে অকারণে ঈর্ষা করতে লাগলেন তাঁকে, জিদ ধরতেন তাঁর মনোযোগ কাড়তে, যা কিছু ইভান ইলিচ করেন তাতে খুঁত ধরা আরম্ভ হল, শুরু হল স্থূল, অপ্রীতিকর তুলকালাম কাণ্ড।

প্রথম জীবনে সাফল্য এনেছিল যে মার্জিত স্বচ্ছন্দ হাবভাব, প্রথম প্রথম সেটি বজায় রেখে অপ্রীতিকর

---

* শুধু খামখেয়ালি করে।

অবস্থাটির হাত থেকে রেহাই পাবার আশা ছিল ইভান ইলিচের। স্ত্রীর মেজাজ বিগড়োলে চেষ্টা করতেন গায়ে না মাখতে, দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন আগের মতোই আনন্দে, লঘুচিত্তে: তাস খেলতে ডাকতেন বন্ধুদের, নিজে যেতেন ক্লাবে বা বন্ধুদের বাড়িতে। কিন্তু একবার সহধর্মিণী এত কদর্য ভাষায় ধমকালেন তাঁকে এবং তারপর থেকে কথা না শুনলেই (নিজের বশ না মানা পর্যন্ত, অর্থাৎ তাঁর মতো বাড়িতে মুখ গোঁজ করে বসে না থাকা পর্যন্ত রেহাই দেবেন না স্বামীকে তিনি ঠিক করেছেন বোঝা গেল) এত প্রবল গালিগালাজ চলতে লাগল যে ইভান ইলিচ ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর বোধগম্য হল যে বিয়ে ব্যাপারটায়— অন্তত ওঁর মতো স্ত্রী থাকলে — জীবনের সুখ ও শালীনতা যে বেড়ে যায় তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, বরং ব্যাঘাত ঘটে তাতে; তাই এ থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে তাঁকে। কী করে সেটা করা যায় ভেবে দেখতে লাগলেন তিনি। একটি মাত্র জিনিসে গুরুত্ব দিতেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা, সেটি হল স্বামীর কাজ, তাই স্ত্রীকে প্রতিরোধ করার জন্য ইভান ইলিচ নিজের কাজ ও কাজ-সংক্রান্ত নানা দায়িত্বের স্বতন্ত্র জগতে আশ্রয় নিলেন।

শিশু ভূমিষ্ঠ হল, তাকে খাওয়ানো নিয়ে গণ্ড-গোল, শিশু ও মায়ের আসল ও কল্পিত নানা অসুখ, তা নিয়ে দরদ দেখানো সমুচিত ইভান ইলিচের, কিন্তু এ বিষয়ে কোনো জ্ঞান ছিল না তাঁর; সংসারের বাইরে আর একটি পৃথিবীতে নিজেকে সরিয়ে নেবার প্রয়োজনীয়তা হল আরো প্রখর।

স্ত্রীর মেজাজ যত খিটখিটে, যত তাঁর দাবিদাওয়া তত বেশী করে ইভান ইলিচের জীবনের ভারকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল অফিস। অফিসের প্রতি টান আরো বেড়ে গেল, বাড়ল উচ্চাশা।

বেশ তাড়াতাড়ি, বিয়ের মাত্র বছরখানেক পরে, ইভান ইলিচের হৃদয়ঙ্গম হল যে দাম্পত্য জীবনে কিছুটা সুযোগ-সুবিধা থাকলেও ব্যাপারটা আসলে অত্যন্ত জটিল ও কঠিন; এক্ষেত্রে নিজের কর্তব্যপালনের জন্য, অর্থাৎ সমাজের অনুমোদিত একটা ভদ্রগোছের দিনযাপনের জন্য, কয়েকটি নির্দিষ্ট রীতিনীতি বানানো অবশ্যকর্তব্য, নিজের পেশার বেলায় ঠিক যেমনটা না করলে নয়।

ইভান ইলিচ বানালেন সে-রকম রীতিনীতি। বিবাহিত জীবনে তাঁর দাবি হল শুধু বাড়িতে খাওয়ার, স্ত্রীর ও শয্যার সুযোগ-সুবিধে যেটুকু পাওয়া যায়, আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল, সমাজের মতামত

নির্ভর বাহ্যিক ভব্যতাটা বজায় রেখে চলা। বাকি জিনিসে আমোদ ফুর্তি চাইতেন তিনি। পেলে কৃতজ্ঞ বোধ করতেন; তাতে ব্যাঘাত ঘটলে, বা খিটিমিটি বাধলে তিনি তৎক্ষণাৎ আশ্রয় নিতেন তাঁর বেড়া-দেওয়া কাজের জগতে, সুখ মিলত সেখানে।

ভালো চাকুরে বলে নাম ছিল ইভান ইলিচের, তিন বছরের মধ্যে পদোন্নতি হল, সহকারী অভিশংসক হলেন তিনি। নতুন নানা কাজ, তাদের গুরুত্ব, লোকজনকে আদালতে আনার ও জেলে দেবার অধিকার, জনসমক্ষে বাগ্মিতা, বাগ্মিতার সাফল্য — এ সবকিছুর জন্য কাজের প্রতি তাঁর টান আরো বেড়ে গেল।

আরো বাচ্চা হল। স্ত্রী আরো ঝগড়ুটে, আরো বদমেজাজী, কিন্তু পারিবারিক জীবনের যে-সমস্ত রীতিনীতি ইভান ইলিচ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর ফলে স্ত্রীর গজরানিতে গায়ে আঁচড় লাগত না আর।

এ সহরে সাত বছর কাজের পর অন্য গুবেরনিয়ায় অভিশংসকের পদে বদলি হলেন ইভান ইলিচ। সেখানে গেলেন তাঁরা; পয়সাকড়িতে টান পড়ল, নতুন সহরটি ভালো লাগল না তাঁর স্ত্রীর। মাইনে অবশ্য আগের চেয়ে বাড়ল বটে, কিন্তু খরচা হত বেশি। তাছাড়া দুটি সন্তান মারা যাওয়াতে ইভান ইলিচের

পারিবারিক জীবন আরো অপ্রীতিকর হয়ে পড়ল।

নতুন সহরে তাঁদের সবকিছু মন্দভাগ্যের জন্য স্বামীকে দোষ দিতেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা। স্বামীস্ত্রীর কথাবার্তার প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়বস্তু, বিশেষ করে সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে, এমন সব প্রশ্ন উঠত যেগুলো নিয়ে কোন না কোন সময়ে ঝগড়া হয়েছে দুজনের মধ্যে, সর্বদা আশঙ্কা ছিল পুরনো ঝগড়াগুলো নতুন করে বাধবে। দাম্পত্য অনুরাগের পালা আসত মাঝে মাঝে, কিন্তু টিকত না বেশীক্ষণ। সেগুলি ছিল দ্বীপের মতো, গুপ্ত আক্রোশের সমুদ্রে যাত্রা করার আগে দুজনের জিরিয়ে নেবার জায়গা গোছের, সে আক্রোশ প্রকাশ পেত দুজনের সম্পূর্ণ ছাড়াছাড়ি ভাবটায়। ছাড়াছাড়িটা উচিত নয় ভাবলে হয়ত কষ্ট পেতেন ইভান ইলিচ, কিন্তু এরি মধ্যে তিনি অবস্থাটাকে শুধু যে স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছিলেন তা নয়, এটাকেই ভাবতেন তাঁর পারিবারিক ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্য। এই সব অপ্রীতিকর ব্যাপার থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর, তিনি চাইতেন যাতে এগুলি হানিকর বা অভব্যগোছের না দেখায়। বাড়িতে ক্রমশ কম থেকে, এবং থাকতে বাধ্য হলে বাইরের লোকের উপস্থিতিতে আত্মরক্ষা করে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি করতেন তিনি। সবচেয়ে বড়ো কথা হল তাঁর

কাজ। চাকরিই হল তাঁর জীবনের একমাত্র স্বার্থ, সে স্বার্থে আমগ্ন হয়ে থাকতেন তিনি। নিজের শক্তির বোধ, ইচ্ছে করলে যাকে খুশি তার সর্বনাশ করার অধিকার, আদালতে ঢুকে অধীনস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে নিজের ভারিক্কি চেহারা, ওপরের এবং নীচের সবায়ের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা, মোকদ্দমা পরিচালনায় নিজের দক্ষতা ও সে দক্ষতায় আত্মশ্লাঘা — এ সবকিছু আনন্দ আনত মনে, আর সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ, খানাপিনায় নিমন্ত্রণ, তাসখেলা — সবকিছু মিলিয়ে পরিপূর্ণ করে তুলল তাঁর জীবন। আর তাই মোটের ওপর ইভান ইলিচের জীবনযাত্রা চলল তেমনভাবে যেমনটা হওয়া তিনি উচিত মনে করতেন — প্রীতিকর ও ভব্যভাবে।

আরো সাত বছর কাটল এভাবে। বড়ো মেয়ের বয়স এখন ষোলো, আর একটি সন্তান মারা গিয়েছে, একটি ছেলে রয়েছে — স্কুলে-পড়া এই ছেলেটিকে নিয়ে যত মনোমালিন্য। ইভান ইলিচ চেয়েছিলেন তাকে আইনের স্কুলে ভর্তি করতে, কিন্তু শুধু আক্রোশের বশে প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা তাকে জিমনাসিয়ামে পাঠান। মেয়েটি বাড়িতে পড়াশোনা করে বেশ বাড়ছে; ছেলেটিও ছাত্র হিসেবে মন্দ নয়।

৩

ইভান ইলিচের বিবাহিত জীবনের সতেরোটি বছর কাটল এভাবে। ইতিমধ্যে তিনি প্রবীণ অভিশংসক, আরো ভালো চাকরির প্রত্যাশায় কয়েকটি ভালো চাকরি নেন নি। ঠিক এই সময়ে এমন একটি অপ্রীতিকর জিনিস হঠাৎ ঘটল যাতে করে তাঁর শান্ত জীবনযাত্রা গেল বিগড়ে। একটি বিশ্ববিদ্যালয় সহরে প্রধান বিচারকের গদিতে আসীন হওয়ার মনস্কামনা ছিল তাঁর, কিন্তু কী করে যেন গোপ্পে কায়দা করে তাঁকে ছাড়িয়ে গিয়ে পেল চাকরিটা। অত্যন্ত রুষ্ট বোধ করলেন ইভান ইলিচ, নানা দোষারোপ করে ঝগড়া বাধালেন গোপ্পে এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। তাঁর প্রতি তাদের মনোভাব কঠিন হয়ে এল, পরের চাকরির বেলাতেও ফের আমল দেওয়া হল না তাঁকে।

এটি ঘটেছিল ১৮৮০-তে। ইভান ইলিচের জীবনে সবচেয়ে কষ্টের বছর এটি। একদিকে, দেখা গেল নিজের রোজগারে সংসার চলছে না; অন্যদিকে তাঁকে সবাই ভুলে গিয়েছে; যেটা তাঁর মনে হত প্রচণ্ড ও নিষ্ঠুর অন্যায় সেটা সম্পূর্ণ সাধারণ ব্যাপার বলে ধরে নিত অন্যরা। এমনকি তাঁর বাবা পর্যন্ত তাঁকে সাহায্য করাটা দরকার মনে করলেন না। ইভান ইলিচ ভাবলেন

সবাই তাঁকে ত্যাগ করেছে, ওদের ধারণা, তিনি যে ৩,৫০০ রুবল করে পাচ্ছেন সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, এমনকি সৌভাগ্য বলে ধরা উচিত। শুধু তাঁরি জানা ছিল, যেসব অন্যায় তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, স্ত্রীর অবিরাম গঞ্জনা, আয়ের চেয়ে বেশী ব্যয়ের ফলে ঋণের বোঝা, এসব মিলিয়ে তাঁর অবস্থাটি স্বাভাবিক নয় মোটেই।

সে বছর গ্রীষ্মকালে খরচ কমাবার জন্য তিনি ছুটি নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে গেলেন গ্রামে শ্যালকের বাড়িতে।

সেখানে, চাকরির কাজ না থাকায় জীবনে এই প্রথম ইভান ইলিচের শুধু যে একঘেয়ে লাগল তা নয়, এতই অকথ্য শোচনীয় লাগল যে তিনি ঠিক করলেন এভাবে থাকা চলে না, চূড়ান্ত ব্যবস্থা করতে হবে একটা।

বারান্দায় পায়চারি করে একটি বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়ে তিনি মনস্থির করলেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে গিয়ে ধরাধরি করবেন, বদলী হবেন অন্য কোনো মন্ত্রিদপ্তরে; তাহলে তাঁর কদর যারা বোঝে না তারা সায়েস্তা হবে।

পরের দিন, স্ত্রী ও শ্যালকের সমস্ত ওজরে কান না দিয়ে তিনি রওনা হলেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে।

যাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য: পাঁচ হাজার রুবলের একটা চাকরি বাগানো। কোন মন্ত্রিদপ্তর বা বিভাগ, কী ধরনের কাজ তাতে কিছু এসে যায় না। যে-কোনো প্রশাসনিক সংগঠনে চাকরি হোক, ব্যাঙ্কে, রেলওয়েতে, সম্রাজ্ঞী মারিয়ার কোনো প্রতিষ্ঠানে, এমনকি শুল্কবিভাগে, শুধু চাকরিটা হওয়া চাই পাঁচহাজারী এবং যে করেই হোক তাঁর কদর না-বোঝা মন্ত্রিদপ্তর ছেড়ে চলে যেতে হবে।

আর এই যাত্রার ফলে এল বিস্ময়কর, অপ্রত্যাশিত সাফল্য। কুর্স্কে প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠলেন ফ. স. ইলিন নামের একটি বন্ধু, বললেন এই মাত্র কুর্স্কের গভর্ণর একটি টেলিগ্রাম পেয়েছেন; তাতে বলা হয়েছে যে মন্ত্রিদপ্তরে একটি বড়ো পরিবর্তন হবে: পিওতর ইভানভিচের জায়গায় নিযুক্ত হবেন ইভান সেমিওনভিচ্।

প্রস্তাবিত পরিবর্তনটি রাশিয়ার কাছে অর্থপূর্ণ, তাছাড়া ইভান ইলিচের কাছেও এর বিশেষ তাৎপর্য: নতুন একটি লোক, পিওতর পেত্রভিচ ও স্পষ্টতই তাঁর বন্ধু জাখার ইভানভিচের পদোন্নতি ইভান ইলিচের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। জাখার ইভানভিচ বন্ধুলোক, ইভান ইলিচের সঙ্গে পড়েছিলেন তিনি।

মস্কোতে জানা গেল খবরটি পাকা। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে পেঁছিয়ে ইভান ইলিচ দেখা করলেন জাখার ইভানভিচের সঙ্গে। তিনি কথা দিলেন যে, যেখানে ইভান ইলিচ কাজ করেন সেই বিচারবিভাগীয় মন্ত্রিদপ্তরে তাঁর যোগ্য কাজ তাঁকে জোগাড় করে দেবেন।

এক সপ্তাহ পরে ইভান ইলিচ টেলিগ্রাম করলেন স্ত্রীকে: 'মিলারের জায়গায় জাখার। প্রথম রিপোর্টের পরে আমার চাকরি।'

পরিবর্তনের দৌলতে নিজেরি মন্ত্রিদপ্তরে অপ্রত্যাশিতভাবে সহকর্মীদের দু'ধাপ ডিঙিয়ে পাঁচহাজারী একটি চাকরি পেয়ে গেলেন ইভান ইলিচ; তাছাড়া রাহাখরচ বাবদ মিলল সাড়ে-তিন হাজার রুবল। আগের শত্রু এবং মন্ত্রিদপ্তরের ওপর আক্রোশ আর মনে রইল না, বেজায় খুশি তিনি।

গ্রামে ফিরলেন ইভান ইলিচ খোশমেজাজে ও পরিতৃপ্তিতে, মনের এ রকম ভাব অনেক দিন হয় নি। প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনাও বেশ চাঙা হয়ে উঠলেন, দুজনের মধ্যে শান্তি ফিরে এল। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে তাঁকে কেমনভাবে লোকে গ্রহণ করেছিল, তাঁর পূর্বতন শত্রুরা অপদস্থ হয়ে কেমন তোষামোদ করছে এখন, তাঁর নতুন চাকরি, সেণ্ট পিটার্সবুর্গে তাঁর খাতির

নিয়ে তাদের কী হিংসে, বিশেষ করে কারো কারো ভালোবাসা, এসবের বিশদ বর্ণনা দিলেন ইভান ইলিচ।

মনোযোগ দিয়ে সমস্তটা শুনে তাঁর প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করার ভান করলেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা, কোনো কিছুতে বাধা দিলেন না তাঁকে; যে সহরে বদলী হয়েছেন সেখানে কী করে সংসার পাতবেন তার পরিকল্পনায় লাগলেন উঠে পড়ে। স্ত্রীর নানা পরিকল্পনা তাঁরি মতো, দুজনের মধ্যে মতের মিল, ছোট্ট একটু গণ্ডগোলের পর জীবন আবার হবে হাসিখুশি প্রীতিকর ও ভব্য, যেমনটা হওয়া স্বাভাবিক — এ দেখে ইভান ইলিচের অত্যন্ত সুখী লাগল।

অল্প ক'দিনের জন্য ফিরে এসেছিলেন ইভান ইলিচ। ১০ই সেপ্টেম্বর তাঁকে নিতে হবে নতুন চাকরিটা, তাছাড়া গুছিয়ে বসতে হবে নতুন জায়গায়, মফঃস্বল থেকে সব সরিয়ে আনতে হবে, কেনাকাটা আছে, ফরমায়েশ দিতে হবে অনেক কিছুর। এক কথায়, তিনি বুদ্ধি করে, আর প্রায় একই জিনিস প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা যা সাধ করে ঠিক করেছিলেন সেভাবে গুছিয়ে বসতে হবে।

সবকিছুর ভারি সুব্যবস্থা হল। স্ত্রীর সঙ্গে হল লক্ষ্যের মিল; তাছাড়া দাম্পত্য জীবন তো তাঁদের ছিল

খুব কম, তাই বিবাহিত জীবনের গোড়ার দিকটার পর এমন মিল তাঁদের আর হয় নি কখনো। ইভান ইলিচ ভেবেছিলেন পরিবারের সবাইকে তখনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন, কিন্তু তাঁর ও তাঁর পরিবারের প্রতি হঠাৎ হিতৈষী ও সদয় হয়ে ওঠা শ্যালক ও শ্যালাজের নির্বন্ধে তিনি একা রওনা দিলেন।

চললেন ইভান ইলিচ। নিজের সাফল্য ও স্ত্রীর সঙ্গে মিতালিতে খুশির ভাবটা রয়েছে বরাবর, একটা অন্যটার জোর বাড়াচ্ছে। চমৎকার একটি ফ্ল্যাট পেলেন, ঠিক যেমনটির স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বামী স্ত্রী। পুরনো কায়দায় প্রশস্ত, উ'চু কয়েকটি ড্রয়িং-রুম, জমকালো কাজের ঘরটি আরামের, স্ত্রী ও কন্যার কামরা, ছেলের পড়াশোনার একটি ঘর — সবকিছু যেন আগে থেকে তাঁদের জন্য ঠিক করা। বাড়ি সাজানো গোছানোর ভার ইভান ইলিচ নিজে নিয়ে দেয়াল কাগজ বাছাই করলেন। খরিদ করলেন আসবাবপত্র; বেশীর ভাগ পুরনো, যা তাঁর মনে হল বিশেষ করে comme il faut*। সবকিছু আস্তে আস্তে বেড়ে নিজের মনের মতো প্রায় হয়ে দাঁড়াল। কাজটা অর্ধেক সমাপ্ত, মনে

---

* সুশোভন।

হল জিনিসটা প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। একেবারে সাজানো হয়ে গেলে ফ্ল্যাটটি কী রকম সুন্দর ও সুষ্ঠু দেখাবে, স্থূলতার লেশমাত্র থাকবে না তাতে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ইভান ইলিচের। লোকজনকে অভ্যর্থনা করার ঘরটা সাজানোর পর কেমন দেখাবে ভাবতে ভাবতে রাত্রে ঘুম এল। অসমাপ্ত ড্রয়িং-রুমের দিকে একবার তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন ফায়ার-প্লেস, পর্দা, étagère, এখানে ওখানে বসানো চেয়ার, দেয়ালে টাঙানো চীনেমাটির রেকাবি, যথাস্থানে বসানো ব্রোঞ্জের জিনিসগুলি। স্ত্রীর ও মেয়ের রুচিও এ ধরনের, তাদের কেমন খুশি করে দেবেন ভেবে ভালো লাগল তাঁর। এসে কী দেখবে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না তারা। কপাল বিশেষ ভালো বলতে হবে, এমন কিছু পুরনো জিনিস পেয়ে গেলেন সস্তায়, যা সবকিছুর বনেদীয়ানা বাড়াবে বিশেষ করে। ওরা এলে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য চিঠিপত্রে তিনি ইচ্ছে করে এসব বিষয়ে কমিয়ে লিখতেন। বাড়ি গোছানোর কাজে তিনি এত ব্যস্ত যে তাঁর পেয়ারের নতুন চাকরিটায় যতটা ভেবেছিলেন ততটা মন আর গেল না, এজলাসে মাঝে মাঝে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন, ভাবতে বসতেন পর্দা টাঙাবার তাকটা এমনি থাকবে না কাপড় দিয়ে মোড়া হবে। এসব ব্যাপার নিয়ে তিনি এত উৎসাহী

যে মাঝে মাঝে নিজেই তিনি হাত লাগাতেন, আসবাবপত্র সরাতেন এদিক থেকে ওদিকে, নিজেই টাঙাতেন পর্দা। কী করে পর্দা ঝোলাতে হয় সেটা নির্বোধ মজুরের দেখিয়ে দেবার জন্য একদিন মই বেয়ে উঠেছেন, হঠাৎ পা ফস্কে পড়ে যান, কিন্তু বলিষ্ঠ ও চটপটে হওয়ায় সামলে নেন, শুধু জানলার কাঠামোয় ধাক্কা লাগে। পাঁজরে চোট-টা কিছু দিন ব্যথা করে সেরে গেল। এ দিনগুলোয় ইভান ইলিচের বিশেষ সুস্থ মনে হল নিজেকে, মনে বেশ ফুর্তি। চিঠিতে লিখলেন: 'মনে হচ্ছে বয়স পোনেরো বছর কমে গিয়েছে।' তাঁর আশা ছিল সমস্ত কিছু সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ হবে, কিন্তু কাজ চলল ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। ফলটা হল চমৎকার। এটা যে শুধু তাঁর একার ধারণা তা নয়, যাঁরা স্বচক্ষে দেখলেন তাঁরা সবাই বললেন।

প্রকৃতপক্ষে, যা হল সেটা ঠিক তাঁদের বেলাতেই হয় যাঁরা সত্যিকার বড়লোক নন, কিন্তু বড়লোকের মতো হতে চান, ফলে হয়ে দাঁড়ান কেবল নিজেরা পরস্পরের মতো: পর্দা, আবলুস কাঠের জিনিস, ফুল, গালিচা আর ব্রোঞ্জের মূর্তি, — কালচে আর ঝকঝকে এমন সবকিছুই যা এক বিশেষ মহলের লোকেরা জোটায় সেই মহলের অন্যান্য সমস্ত

লোকের মতো দেখাবার জন্য। আর ইভান ইলিচের ফ্ল্যাটটা দেখতে এত বেশী করে অন্যান্যদের ফ্ল্যাটের মতো যে মনে কোনো দাগ কাটে না। কিন্তু তাঁর নিজের মনে হল ফ্ল্যাটটা বিশেষ করে অসাধারণ। স্টেশনে গিয়ে স্ত্রী পুত্র কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে আলোয় আলোময় ফ্ল্যাটে এলেন ফিরে, সাদা নেকটাই পড়া আর্দালি ফুল দিয়ে সাজানো ঢোকবার ঘরটার দরজটা খুলল, সবাই গেলেন ড্রয়িং-রুমে, তারপর কাজের ঘরে, আনন্দে সবাই অস্ফুটোক্তি করল। তখন তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে সবাইকে সমস্ত ফ্ল্যাটটা ঘুরে ঘুরে দেখালেন, ওদের প্রশংসা শুনলেন বার বার, মুখে তৃপ্তির জ্যোতি। সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় চা খাবার সময়ে কথায় কথায় প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা কেমন করে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন জিজ্ঞেস করাতে ইভান ইলিচ স্মিত হেসে কী করে পা ফস্কে গিয়েছিল, কী ঘাবড়ে গিয়েছিল মজুরটা, মুখে তার একটা ছবি ফুটিয়ে তুলে বললেন।

'জিমন্যাস্ট তো আর মিছিমিছি হই নি। অন্য কেউ হলে প্রাণে মারা পড়ত, কিন্তু আমার পাঁজরে এই এখানে অল্প একটু চোটের ওপর দিয়েই গিয়েছে; ছুঁলে ব্যথা করে, কিন্তু কমে যাচ্ছে। সামান্য একটা কালশিটে।'

শুরু হল নতুন ফ্ল্যাটে তাঁদের জীবনযাত্রা। আর

বাড়িতে বেশ কিছুদিন থাকার পর সর্বদা যেমন মনে হয়, আর একটি মাত্র ঘর হলেই সর্বাঙ্গ সুন্দর হত; নতুন রোজগারে যেমনটা সবায়ের মনে হয়, আর একটু— মাত্র পাঁচশ রুবল বেশী হলেই — সব সুরাহা হত। এই সব মিলিয়ে মোটের ওপর সবকিছুই চলল খাসা। শুরুতে বিশেষ করে, তখনো ফ্ল্যাট সাজানো একেবারে শেষ হয় নি, তখনো কিছু কিছু জিনিসপত্র কেনা, অর্ডার দেওয়া বা সারানো, এদিক থেকে ওদিক সরানো বাকি। সত্যি বটে, মাঝে মাঝে ছোটখাটো গোছের মনোমালিন্য হত, কিন্তু স্বামী স্ত্রী দুজনে তখনো এত খুশি আর নানা কাজে এত ব্যস্ত যে বড়ো রকম বচসায় পরিণত হবার আগেই সব মিটে যেত। ফ্ল্যাট একেবারে সাজানো হয়ে যাবার পর কেমন যেন একঘেয়ে লাগল, মনে হল কী যেন একটা নেই; কিন্তু এরি মধ্যে আলাপ-পরিচয় শুরু হয়েছে, নতুন নানা অভ্যাস, জীবন পূর্ণ হয়ে উঠল।

ইভান ইলিচের সকাল কাটত আদালতে, বাড়ি ফিরতেন খাবার সময়; প্রথম প্রথম তিনি ছিলেন অত্যন্ত খোশমেজাজে, অবশ্য বাড়ির ব্যাপার নিয়ে মনে অল্প স্বল্প বেদনা তিনি পেতেন। (টেবিল ঢাকায় বা গৃহসজ্জায় কোনো দাগ, পর্দার দড়ি ছেঁড়া দেখলে বিরক্ত লাগত তাঁর — সত্যি তো সাজাতে

গোছাতে তিনি এত পরিশ্রম করেছেন, কোনো কিছু নষ্ট হবার সামান্যতম লক্ষণে মনে ব্যথা পেতেন।) কিন্তু মোটের ওপর ইভান ইলিচের জীবনযাত্রা ঠিক তাঁর ধ্যানধারণায় যেমনটা হওয়া উচিত ঠিক সে রকম হয়ে দাঁড়াল: সহজ, সানন্দ, মার্জিত। ঘুম থেকে উঠতেন ন'টায়, কফি খেতেন, খবরের কাগজ পড়া হত, তারপর সরকারী পোষাক চাপিয়ে যেতেন আদালতে। সেখানে তাঁর জন্য প্রস্তুত দৈনন্দিন কাজের যোয়ালে সহজে ঘাড় পেতে দিতেন। উমেদার, দলিল-পত্র, খোদ অফিস, এজলাস — মঞ্চাশ্রয়ী, কর্তৃত্বমূলক। কাঁচা জীবন্ত যা কিছু সর্বদাই সরকারী কাজের সঠিকতায় ব্যাঘাত ঘটায় তা সব অপসারণ করতে পারা চাই: সরকারী সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক রাখা চলবে না লোকজনের সঙ্গে; সম্পর্কের উপলক্ষটাকে হতে হবে সরকারী কাজের প্রয়োজনে, এবং সম্পর্কটাই হওয়া উচিত নিছক সরকারী। যেমন, কিছু একটা জানতে এলেন কেউ; নিজের সরকারী পদের বাইরে তাঁর সঙ্গে কোনো কারবার রাখতে পারেন না ইভান ইলিচ; কিন্তু আদালতের সদস্য হিসেবে যদি তাঁর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে ইভান ইলিচের (সরকারী শিরোনামা দেওয়া কাগজে প্রকাশ করা যায় যে সম্পর্ক), তাহলে সে সম্পর্কের গণ্ডির মধ্যে তাঁর জন্য সবকিছু,

সাধ্যমতো সবকিছুই করবেন ইভান ইলিচ, তাঁর সঙ্গে মানবিক, বন্ধুজনোচিত ব্যবহার করবেন তিনি, অর্থাৎ সৌজন্য দেখাবেন। কিন্তু সরকারী সম্পর্ক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চুকে যাবে অন্যান্য সবকিছু। সরকারী সম্পর্ককে তফাতে রাখার, নিজের সত্যিকার জীবন থেকে একেবারে আলাদা রাখার অসাধারণ গুণ ছিল ইভান ইলিচের, প্রতিভা ও অভ্যাসের ফলে সে গুণকে তিনি এমন মাত্রায় তুলেছিলেন যে ওস্তাদের মতো সরকারী সম্পর্কের সঙ্গে মানবোচিত সম্পর্ক মেশাবার সুযোগ মাঝে মাঝে নিজেকে দিতেন মজা করে যেন। এ সুযোগ নিজেকে তিনি দিতে পারতেন এজন্য যে দরকার হলে সরকারী সম্পর্ক আবার আলাদা করে নেবার, মানবোচিত সম্পর্ক ছাঁটাই করার মতো ইচ্ছাশক্তি তাঁর ছিল। সহজে, মিষ্টি করে, সুষ্ঠুভাবে এটা তিনি করতেন শুধু তা নয়, করতেন ওস্তাদের মতো অবলীলাক্রমে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলত ধূমপান, চা-পান, রাজনীতির বিষয়ে অল্প কথাবার্তা, সাধারণ ব্যাপার নিয়ে কিছুটা, কিছুটা তাস নিয়ে, আর সবচেয়ে বেশী, চাকরি-বাকরি নিয়ে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে তিনি বাড়ি ফিরতেন, কিন্তু মনে থাকত সেই তৃপ্তি যেটা অদ্ভুত খেল দেখাবার পর বোধ করে ওস্তাদেরা। তার নিজের বেলায় খেলটা অর্কেস্ট্রার প্রথম ভায়োলিনের মতো।

বাড়িতে স্ত্রী কন্যা হয় কোথাও বেড়াতে গেছেন, নয় কেউ হয়ত এসেছেন; ছেলে হয় স্কুলে নয় গৃহশিক্ষকের কাছে পড়া তৈরী করছে, জিমনাসিয়ামে যা কিছু শেখানো হয় চলেছে তার অনুধ্যান। সবকিছু মনোরম। খাবার পর অতিথি না থাকলে মাঝে মাঝে ইভান ইলিচ এমন একটা বই নিয়ে বসতেন যার কথা সবায়ের মুখে, তারপর সন্ধ্যায় কাজে লাগাতেন, অর্থাৎ দলিলপত্র পরীক্ষা করতেন, আইনের সূত্র বের করতেন, সাক্ষ্য খুঁটিয়ে সেটা আনতেন আইনের ধারায়। কাজটা না বিরস, না প্রীতিকর। তাসখেলা বাদ দিতে হলে কাজটা বিরস, কিন্তু তাসখেলা না থাকলে, একলা বা স্ত্রীর সঙ্গে বসে থাকার চেয়ে ভালো। ইভান ইলিচের কাছে সবচেয়ে প্রীতিকর ব্যাপার ছিল সমাজে যাঁদের খাতির তেমন সব মহিলা ও মহাশয়দের ছোটো খাটো নেমন্তন্নে ডাকা। এমনভাবে সময় কাটানো যা ঠিক এই ধরনের লোকেরা বরাবর কাটিয়ে থাকেন, ঠিক যেমন ইভান ইলিচের ড্রয়িং-রুম অন্য সমস্ত ড্রয়িং-রুমেরই মতো।

এমনকি একদিন তাঁরা নৃত্য সান্ধ্যপার্টি পর্যন্ত দিলেন। ইভান ইলিচের বেজায় খোশমেজাজ, সবকিছু চমৎকারভাবে চলল, শুধু মিষ্টি আর পেস্ট্রি নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে একটা জোর বচসা হল, এই যা। প্রাসকোভিয়া

ফিওদরভনার নিজের প্ল্যান ছিল, কিন্তু ইভান ইলিচ গোঁ ধরলেন যে সবচেয়ে দামী মিষ্টির দোকান থেকে জিনিস আনাতে হবে; গুচ্ছের পেস্ট্রি এল; ঝগড়াটা বাঁধলো এই কারণে যে অনেকগুলো পেস্ট্রি পড়ে রইল, আর মিষ্টির বিল হল ৪৫ রুবল। ঝগড়াটা এত তীব্র ও কটু হয়েছিল যে প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা তাঁকে 'বোকা' ও 'ঘ্যানঘেনে' বলে সম্বোধন করলেন, আর ইভান ইলিচ নিজের মাথা জোরে চেপে ধরে বিবাহবিচ্ছেদের কীসব কথা বললেন। কিন্তু পার্টিটা চলেছিল বেশ ফুর্তিতে। সেরা লোকেদের সমাগম হল, ইভান ইলিচ নাচলেন প্রিন্সেস ত্রুফনভার সঙ্গে, 'আমার গুরুভার তুমি নাও' নামের প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাত্রী ত্রুফনভার ভগিনী যিনি। সরকারী কাজে তাঁর যে আনন্দ সেটা ছিল উচ্চাশা পরিপূরণের আনন্দ; সামাজিকতার আনন্দ ছিল অহমিকা পরিতৃপ্তির আনন্দ; কিন্তু যেটাতে তিনি সবচেয়ে আন্তরিক আনন্দ পেতেন সেটা হল তাসখেলা। তিনি মানতেন যে, যা কিছু হোক, জীবনে যত দুঃখের ঘটনাই ঘটুক, সবকিছু ভেদ করে প্রদীপের মতো জ্বলে একটি আনন্দ, সেটি হল কয়েকটি ভালো খেলুড়ের সঙ্গে, চেঁচায় না এমন জুড়ি নিয়ে চার-হাতের 'ভিণ্ট' খেলতে বসা (পাঁচ-হাতের খেলায় পঞ্চম সঙ্গী হয়ে বসে থাকাটা অত্যন্ত

কষ্টকর, যদিও ভাণ করতে হয় যেন খুবই ভালো লাগছে); খেলাটা চলুক গভীর মনোযোগে বুদ্ধিমানের মতো (তাস যখন হাতে আসে); তারপর নৈশাহার আর এক গেলাস মদ্যপান। তাসখেলার পরে বিশেষ ভালো মেজাজে শুতে যেতেন ইভান ইলিচ, বিশেষ করে অলপস্বলপ কিছু জিতলে (খুব বেশী জিতলে অস্বস্তি হত তাঁর)।

এইভাবে চলল তাঁদের জীবনযাত্রা। সমাজের সেরা স্তরের সঙ্গে মেলামেশা, বাড়িতে প্রায়ই আসেন হোমরাচোমরা ও ছেলেছোকরারা।

তাঁদের গোষ্ঠীর লোক কারা হবে সে বিষয়ে স্বামী স্ত্রী ও কন্যার কোনো মতান্তর ছিল না; সাজসজ্জাহীন যেসব আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব তাঁদের জাপানী প্লেট টাঙানো ড্রয়িং-রুমে খাতির জানাতে ছুটে আসত তাদের কাটানোর ব্যাপারে স্বামী স্ত্রী ও কন্যা পরস্পরকে জিজ্ঞেস না করেই সমান নৈপুণ্যে দেখাতেন। বেশী দিন যেতে না যেতে এই সব অবাঞ্ছিত জীব আসা ছেড়ে দিল, গলোভিনদের বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে রইলেন শুধু সমাজের সেরা ব্যক্তিরা। উদীয়মান তরুণেরা লিজার পাণিপ্রার্থী; দ্মিত্রি ইভানভিচের পুত্র ও তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী, তদন্তকারী হাকিম পেত্রিশ্চেভ এত সোৎসাহে লিজার মনোরঞ্জনে ব্যস্ত যে

ইভান ইলিচ কথাটা পাড়লেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনার কাছে, বললেন ওদের নিয়ে একটা তিন-ঘোড়ার স্লেজ ভ্রমণ বা নাট্যাভিনয়ের বন্দোবস্ত করলে কেমন হয়।

এইভাবে জীবনযাপন করতে লাগলেন তাঁরা। এইভাবেই সবকিছু চলল অপরিবর্তিত, সবকিছু চমৎকার।

৪

সবাই বহাল তবিয়তে। মাঝে মাঝে মুখে কী একটা অদ্ভুত স্বাদ ও পেটের বাঁদিকে একটা অস্বস্তির কথা নিয়ে অনুযোগ করতেন ইভান ইলিচ, কিন্তু ওটাকে তো ব্যাধি বলা চলে না।

কিন্তু অস্বস্তিটা দিনে দিনে বেড়ে চলল; যদিও তখনো পর্যন্ত আসল ব্যথায় দাঁড়ায় নি সেটা তবু পাঁজরে সর্বদা ভারি একটা চাপ, সর্বদা মনমরা একটা ভাব। সে ভাবটা উত্তরোত্তর বেড়ে চলল, ব্যাঘাত ঘটাতে শুরু করল সেই সহজ সুষ্ঠু জীবনযাত্রার আনন্দে যেটা ফিরে পেয়েছিলেন গলোভিন পরিবার। স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া আগের চেয়ে বেশী করে বাঁধতে লাগল, আর বেশী দিন যেতে না যেতে জীবনযাপনের সহজ আনন্দটা গেল উবে, শালীনতা টিকিয়ে রাখা হল

কোনোক্রমে। ঝগড়া হতে লাগল বারবার। আবার রইল শুধু কিছু দ্বীপ, কয়েকটি মাত্র দ্বীপ, যেখানে স্বামী স্ত্রী বিস্ফোরণ বিনা থাকতে পারতেন একসঙ্গে।

আর প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা তখন যথার্থই বলতেন যে স্বামীর প্রকৃতি বড়ো দুর্বহ। স্বভাবসুলভ অত্যুক্তি করে বলতেন, বরাবরই ওঁর প্রকৃতি ওরকম সাঙ্ঘাতিক, বিশ বছর সইয়ে থাকতে পারে শুধু তাঁরি মতো শুভ লক্ষ্মী। সত্যি বটে, এখন বাগবিতণ্ডার সূত্রপাত করেন ইভান ইলিচ নিজে। ঠিক খেতে বসার আগে, বিশেষ করে সূপ দেবার সময়ে সাধারণত দোষ ধরা শুরু হত। তাঁর চোখে পড়ত, বাসনে কী একটা খুঁত আছে নয় খাবারটা খারাপ, ছেলে হয়ত কনুই রেখেছে টেবিলে কিম্বা মেয়ে ঠিকমতো খোঁপা বাঁধে নি। আর সবকিছুর জন্য তিনি দোষ দিতেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনাকে। প্রথম প্রথম পাল্টা জবাব দিতে ছাড়তেন না তিনি, অপ্রিয় নানা কথা বলতেন স্বামীকে, কিন্তু দু'বার ঠিক খেতে শুরু করার পর ইভান ইলিচ এত ভয়ঙ্কর রেগে গেলেন যে প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা বুঝতে পারলেন, যে ওটা একটা রোগ, খেতে গেলেই তা দেখা দেয়। তাই নিজেকে সামলে নিয়ে আর জবাব দিতেন না; শুধু খাবার জন্যে তাড়া দিতেন। নিজের আত্মসংযমের অত্যন্ত তারিফ করলেন

প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা। স্বামীর স্বভাবটা অসম্ভব, তাঁর জীবন অস্থির করে তুলেছেন তিনি, এই সিদ্ধান্ত করে নিজের প্রতি করুণা হতে লাগল তাঁর। আর আত্ম-করুণা যত বাড়ল তত বাড়ল স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ। স্বামী মরুক এই কামনা করতে চাইতেন তিনি, কিন্তু সেটা তো ঠিক করা যায় না, কেননা তাহলে অর্থাগমের কোনো পথ থাকবে না। ফলে স্বামীর প্রতি আরো বিরাগ হল তাঁর। ভাবলেন, ইভান ইলিচের মৃত্যুতেও তাঁর পরিত্রাণ নেই, কী দারুণ অসুখী তিনি; এতে বিরক্ত লাগল তাঁর, সে ভাবটা চেপে রাখলেন তিনি, আর তাঁর চেপে-রাখা বিরক্তি ইন্ধন জোগাতো স্বামীর বিরক্তিতে।

বিশেষ অন্যায় একটা ঝগড়ার পর মিটমাটের সময়ে ইভান ইলিচ নিজের খিটখিটানি স্বীকার করে বললেন যে অসুস্থতার দরুন এটা হয়; প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা তাঁকে বললেন, যদি অসুখ হয়ে থাকে, তাহলে চিকিৎসা করা দরকার, নাম-করা একটি ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে তাঁকে।

গেলেন ইভান ইলিচ। ঠিক যেমনটি ভেবেছিলেন তাই হল, যেমনটা হয় সচরাচর তাই হল: সেই বসে থাকা, ডাক্তারের ভারিক্কি চাল; চালটা তাঁর চেনা, কেননা আদালতে তিনি নিজে ঠিক এ-রকম ভারিক্কি

চালে চলেন; সেই ঠুকঠুক করে বুক পিঠ দেখা, সেই শোনা, সেই সব প্রশ্ন যার উত্তর নিরর্থক, কেননা সেগুলো সব বাঁধা-ধরা, মুখভাবে সেই অর্থঘন ইঙ্গিত যার মানে এই যে, ডাক্তারের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলে সবকিছু বিলকুল ঠিক হয়ে যাবে, কেননা ঠিক কী করা উচিত সব তাঁদের নিঃসন্দেহে জানা — রোগী নির্বিশেষে ডাক্তারের সেই এক আচরণ। আদালতে যেমন, সবকিছু ঠিক তেমনি। অভিযুক্তদের সামনে তিনি নিজে যে ভাব করতেন তাঁর সামনে নামজাদা ডাক্তারের ভাবটাও তেমনি ভারিক্কি।

বললেন ডাক্তার: এই-এই জিনিস থেকে মনে হচ্ছে আপনার ভেতরে অমুক-অমুকটায় গড়বড়, কিন্তু এটা-ওটা বিশ্লেষণ করে যদি দেখা যায় আমাদের ডায়োগ্‌নসিস্‌ ঠিক নয়, তাহলে ধরে নিতে হবে আপনার এই-এই রোগ হয়েছে। তাই যদি ওইটে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে... ইত্যাদি। ইভান ইলিচের কাছে শুধু একটি প্রশ্ন জরুরী ছিল: তাঁর অবস্থাটা কি বিপজ্জনক, হ্যাঁ কি না? কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন ডাক্তার। ডাক্তারের দৃষ্টিভঙ্গিতে, এ প্রশ্ন অনর্থক ও বিবেচনার অযোগ্য। শুধু যেগুলো সম্ভব তেমন কয়েকটি জিনিস নিয়ে ভাবা চলতে পারে:

কিডনির দোষ, দীর্ঘকালস্থায়ী শ্লেষ্মা কিম্বা অন্ত্রের কোনো ব্যাধি। ইভান ইলিচের জীবনটা কোনো ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না — মামলাটা কেবল কিডনি ও অন্ত্রের মধ্যে। ইভান ইলিচের সামনে ডাক্তার আন্ত্রিক ব্যাধির স্বপক্ষে সমাধান দিলেন চমৎকারভাবে, শুধু বলে রাখলেন যে প্রস্রাব পরীক্ষার ফলে নতুন কোনো সূত্র মিলতে পারে, তখন হয়ত কেসটাকে নতুন করে বিবেচনা করতে হবে। কাঠগড়ায় আসামীর সামনে ঠিক এই জিনিসটা, এবং ঠিক এত চমৎকারভাবেই হাজার বার করেছেন ইভান ইলিচ নিজে। অতঃপর চশমার কাঁচের ওপর দিয়ে আসামীর দিকে বিজয়গর্বে, এমনকি হৃষ্টচিত্তেই তাকিয়ে ডাক্তার ঠিক তেমনি চমৎকারভাবে একটি সংক্ষিপ্তসার দিলেন। ডাক্তারের চুম্বক থেকে ইভান ইলিচ ঠিক করলেন তাঁর অবস্থাটা খারাপ, কিন্তু তাতে ডাক্তারের কিছু এসে যায় না, এসে যায় না কারুর। এই সিদ্ধান্তে উপণীত হয়ে মনে বেজায় ব্যথা পেলেন ইভান ইলিচ, নিজের প্রতি গভীর করুণার উদ্রেক হল, এবং ঠিক সমান আক্রোশের ভাব হল ডাক্তারের প্রতি, এমন একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি এতটা উদাসীন।

কিন্তু কিছু না বলে তিনি শুধু উঠে পড়লেন, টেবিলে ফি রেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন:

'রোগীদের কাছ থেকে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন শোনা আপনার অভ্যেস আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু বলুন তো, সাধারণভাবে আমার রোগটা বিপজ্জনক কি না?'

চশমার ওপর দিয়ে একটি চোখে তাঁর প্রতি কঠোর দৃষ্টিক্ষেপ করলেন ডাক্তার, যেন বলতে চান: 'আপনাকে যে সব প্রশ্ন করা হয়েছে, আসামী, তার বাইরে গেলে আদালত থেকে বের করে দিতে বাধ্য হব।'

'যা বলা দরকার ও উচিত মনে করি আপনাকে তো বলেছি,' বললেন ডাক্তার। 'বাকি সব বিশ্লেষণে ধরা পড়বে।' ইভান ইলিচকে নমস্কার ঠুকলেন ডাক্তার।

আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেন ইভান ইলিচ, বেজার মুখে স্লেজে বসে চললেন বাড়িমুখো। সারা পথটা ডাক্তার যা বলেছেন তা নিয়ে বারবার ভাবলেন, অস্পষ্ট গোলমেলে সব বৈজ্ঞানিক শব্দকে সহজ ভাষায় রূপান্তরিত করে চাইলেন তাঁর সেই প্রশ্নের উত্তর: 'খারাপ — খুব খারাপ, না এখনো কিছু নয়?' আর তাঁর মনে হল ডাক্তার যা বলেছেন তার সারার্থ এই যে অবস্থাটা বিশেষ খারাপ। রাস্তায় সবকিছু তাঁর চোখে বেজার ঠেকতে লাগল: কোচওয়ানগুলো বেজার, বাড়িগুলো বেজার, পথচারীরা বেজার, দোকানগুলো — সবকিছু বেজার। সেই ব্যথাটা — সেই চাপা টনটনে ব্যথাটা, এক মুহূর্ত যার বিরাম

নেই — ডাক্তারের নানা অবোধ্য মন্তব্যের আলোয় অন্য একটা আরো গুরুতর একটা রূপ গ্রহণ করল। নতুন একটা উৎকণ্ঠার বোধে তিনি মনোনিবেশ করলেন ব্যথাটায়।

বাড়িতে পেঁাছিয়ে যা ঘটেছে বলতে শুরু করলেন স্ত্রীকে। স্ত্রী শুনছিলেন, কিন্তু কথার মাঝখানে টুপি মাথায় ঘরে ঢুকল কন্যা। মা মেয়ে বাইরে যাচ্ছেন। জোর করে কিছুক্ষণ বসে মেয়ে বাপের বিরস কাহিনী শুনল, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, আর স্ত্রীও শেষ পর্যন্ত শুনলেন না।

'তা, ভালোই তো,' বললেন সহধর্মিনী, 'এবার থেকে নিয়ম করে ওষুধ খেও কিন্তু। প্রেসক্রিপসনটা দাও তো। গেরাসিমকে ওষুধের দোকানে পাঠাই।' তারপর জামাকাপড় বদলাতে তিনি চলে গেলেন।

যতক্ষণ স্ত্রী ঘরে ছিলেন দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে ছিলেন ইভান ইলিচ, এবার সেটা মোচন করলেন গভীরভাবে।

'যাক গে,' তিনি বললেন, 'ব্যাপারটা হয়ত এখনো এমন কিছু নয়...'

ওষুধ খাওয়া শুরু হল আর ডাক্তারের সমস্ত নির্দেশ মেনে চলা; নির্দেশগুলো প্রস্রাব বিশ্লেষণের পর বদলে গেল। কিন্তু হয় বিশ্লেষণে নয় বিশ্লেষণের পর কী করা উচিত তা নিয়ে কিছু একটা গণ্ডগোল

হয়েছিল; ডাক্তারকে ধরা যায় নি, কিন্তু কেন জানি না যেটা হবে তিনি বলেছিলেন সে রকমটা হল না। ডাক্তার হয় কিছু একটা ভুলে গিয়েছিলেন, নয় মিথ্যে বলেছিলেন, কিম্বা হয়ত কিছু একটা তাঁর কাছ থেকে গোপন রেখেছেন।

যাই হোক, ইভান ইলিচ অক্ষরে অক্ষরে ডাক্তারের নির্দেশ মেনে চললেন, গোড়ার দিকে তাতে কিছু সান্ত্বনাও পেতেন।

ডাক্তারের কাছে যাবার পর থেকে ইভান ইলিচের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা, ওষুধ খাওয়া, ব্যথা ও শারীরযন্ত্রের সমস্ত ক্রিয়ায় নজর রাখা। তাঁর কাছে জীবনের প্রধান কথা হয়ে দাঁড়াল মানুষের রোগ ও মানুষের স্বাস্থ্য। তাঁর সামনে কোনো রোগ, মৃত্যু বা আরোগ্যলাভের কথা উঠলে, বিশেষ করে তাঁর রোগের সঙ্গে মিল আছে এমন ব্যাধির কথা, নিজের অস্থিরতা গোপন রাখার প্রয়াস করে একাগ্রচিত্তে তিনি তা শুনতেন, নানা প্রশ্ন করে নিজের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করতেন।

ব্যথাটা কমল না, কিন্তু ইভান ইলিচ জোর করে ভাবলেন আগের চেয়ে ভালো আছেন। অন্য কোনো কিছুর দুশ্চিন্তা না থাকলে নিজেকে ঠকাতে তিনি

পারতেন, কিন্তু যখনি স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হত, অফিসে ব্যর্থকাম হতেন বা তাসে খারাপ হাত আসত তখনি অত্যন্ত তীক্ষ্নভাবে অনুভব করতেন নিজের ব্যাধিকে। আগে বিপাক সইতে পারতেন তিনি; বিশ্বাস ছিল শিগগিরই উদ্ধার পাবেন, সাফল্য নিশ্চিত, 'কিস্তিমাৎ' করতে পারবেন। আর এখন যে-কোনো দুর্বিপাকে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়, মনে আসে গভীর হতাশা। নিজেকে বলতেন: এই দেখো, সবেমাত্র একটু ভালো হতে শুরু করেছি, ওষুধ সবে কাজ দিতে আরম্ভ করেছে, অমনি এই নচ্ছার কাণ্ডটা, বিপাকটা না ঘটলে নয়... আর দুর্দশার ওপরে বা যেসব লোক তাঁর দুর্ভাগ্য ঘটাচ্ছে, তাঁকে মেরে ফেলছে তাদের ওপরে ফুঁসতেন তিনি। টের পেতেন ফোঁসানিটা মৃত্যুর মুখে নিয়ে চলেছে তাঁকে, কিন্তু গত্যন্তর নেই। তাঁর তো নিশ্চয় বোঝা উচিত যে লোকজন এবং ঘটনার ওপর মনের ঝাল ঝাড়াতে অসুখটা আরো বেড়ে যাচ্ছে, অপ্রীতিকর ঘটনায় মনোযোগ দেওয়া একেবারে উচিত নয়। কিন্তু তাঁর বিচারবুদ্ধি চলল ঠিক উল্টো পথে: তিনি বলতেন তাঁর দরকার শান্তিতে থাকা, শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে পারা সবকিছুর বিষয়ে তিনি হুঁশিয়ার; অথচ সামান্য ব্যাঘাত ঘটলে তিনি খিটখিটিয়ে উঠতেন। ডাক্তারী বই পড়ে আর ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ

করে অবস্থাটা আরো খারাপ করে তুললেন ইভান ইলিচ। এত মাপা তালে অবস্থাটা খারাপের দিকে চলল যে একটা দিনের সঙ্গে পরের দিনের তুলনা করে নিজেকে ঠকানো তাঁর পক্ষে সহজ হত — পার্থক্যটা প্রায় ধরা না পড়ার মতো। কিন্তু ডাক্তারদের কাছে পরামর্শ নেবার পর মনে হত অবস্থাটা শুধু খারাপের দিকে যাচ্ছে তা নয়, যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। তবু ডাক্তারদের কাছে ধন্না দেওয়া তিনি ছাড়লেন না।

সেই মাসেই তিনি গেলেন আর একজন নামজাদা ডাক্তারের কাছে। প্রথম ডাক্তারটি যা বলছিলেন প্রকৃতপক্ষে তাই বললেন এই ডাকসাইটে ডাক্তার, শুধু সমস্যাটি উত্থাপন করলেন অন্যভাবে। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে ইভান ইলিচের ভয়ভাবনা আরো বেড়ে গেল। আর একটি চমৎকার ডাক্তার — বন্ধুর বন্ধু তিনি — যা রোগনির্ণয় করলেন সেটা সম্পূর্ণ অন্য রকমের। ইভান ইলিচ ভালো হয়ে উঠবেন, এই কথা তিনি দিলেন বটে, কিন্তু তাঁর নানা প্রশ্ন ও অনুমানে তাঁকে আরো থতমত খাইয়ে দিল, ধোঁকার ভাবটা গেল বেড়ে। হোমিওপ্যাথ একজন আবার সম্পূর্ণ অন্য কথা বললেন, দিলেন খেতে অন্য ওষুধ; এক সপ্তাহ গোপনে সে ওষুধসেবন চলল। কিন্তু সাতদিন পরেও অবস্থার উন্নতি না হওয়াতে সে চিকিৎসা এবং আগের চিকিৎসা,

দুইয়েতেই তাঁর বিশ্বাস চলে গেল, ফলে মনটা গেল দমে আগেকার চেয়ে বেশী করে। আইকনের দৈবগুণে সেরে ওঠার কথা একবার বললেন চেনাশোনা একটি মহিলা। ইভান ইলিচ দেখলেন তিনি খুব মন দিয়ে মহিলাটির কথা শুনছেন, এ ধরনের আরোগ্যের সম্ভাবনায় বিশ্বাস হচ্ছে তাঁর। ঘটনাটিতে ঘাবড়ে গেলেন তিনি। 'সত্যি সত্যি এ রকম বেকুব বনে গেছি না কি?' জিজ্ঞেস করলেন আপনাকে। 'যত সব ছাইপাঁশ! আমার উচিত রোগ-রোগ বাই নিয়ে অস্থির না হওয়া, একজন ডাক্তারকে মেনে নিয়ে তাঁর কড়া চিকিৎসায় থাকা। তাই করব। অনেক হয়েছে। আর মাথা না ঘামিয়ে একেবারে ডাক্তারের কথামতো চলব গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত, তারপর দেখা যাবে। দোমনা করা আর চলবে না!..' সিদ্ধান্তটা করা সহজ, পালন করা অসম্ভব। পাঁজরার ব্যথাটা একেবারে কাহিল করে দেয়। মনে হয় দিনে দিনে সেটা বাড়ছে, একদণ্ড বিরাম নেই; মুখের স্বাদটা হয়ে দাঁড়াল আরো অদ্ভুত, বোধ হল মুখে বিচ্ছিরি একটা গন্ধ এসেছে, ক্ষিধে চলে গেল, আরো দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি। নিজেকে আর ধোঁকা দেওয়া চলে না: ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে ইভান ইলিচের, বিচিত্র কিছু, সেটার গুরুত্ব এত বেশী যে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু কখনো ঘটে নি

তাঁর। আর এ বিষয়ে জানেন কেবল তিনি; আশেপাশের লোক হয় সেটা বোঝে না, নয় বোঝার কোনো আগ্রহ নেই; তারা ভাবে পৃথিবীতে সবকিছু আগেকার মতো চলেছে। এটাতেই সবচেয়ে বেশী যন্ত্রণা পেতেন ইভান ইলিচ। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে বাড়ির লোকেরা — বিশেষ করে স্ত্রী ও কন্যা, যাদের নিমন্ত্রণ-যাত্রায় তখন মরশুম লেগেছে, — বোঝে না কিছু; তাঁর মনমরা ভাব, তাঁর দাবী দাওয়া নিয়ে বিরক্ত হয় তারা, যেন সবি তাঁরি দোষ। যতই না লুকোবার চেষ্টা করুক, তিনি বুঝলেন যে ওদের কাছে তিনি একটা আপদ; দেখলেন স্ত্রী তাঁর অসুখের ব্যাপারে একটা বিশেষ মনোভঙ্গি নিয়েছেন, তিনি যাই বলুন আর করুন, সেটার নড়চড় নেই। ভঙ্গিটা হল এই:

'জানেন,' নিজের বন্ধুদের তিনি বলতেন, 'ইভান ইলিচ ডাক্তারের কথা পুরোপুরি মেনে চলতে পারেন না, ভালোমানুষদের যা হয় আর কি। আজ হয়ত নির্দেশমতো ওষুধ খেলেন, খাওয়াদাওয়া করলেন, সময়মতো শুলেন আর কাল যদি ওঁকে নজরে না রাখি, ওষুধের কথা ভুলে গিয়ে স্টার্জন মাছ খেয়ে বসবেন (সেটা খাওয়া বারণ), আর রাত্তির একটা পর্যন্ত বসে বসে তাসখেলা চলবে।'

একবার বিরক্ত হয়ে ইভান ইলিচ স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে আবার এ-রকমটা করেছি? একবারই তো শুধু হয়েছে পিওতর ইভানভিচের ওখানে।'

'আর কাল রাত্তিরে শেবেকের ওখানে।'

'তাতে কী এসে যায়, ব্যথায় ঘুম আসছিল না...'

'তা যে কারণেই হোক, কিন্তু ও-রকম ভাবে চললে কখনো রোগ সারবে না, আমাদের জ্বালিয়ে খাবে।'

বন্ধুদের এবং ইভান ইলিচকে প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা যা বলতেন তা থেকে বোঝা যেত, স্বামীর রোগের ব্যাপারে তাঁর মনোভাবটা হল এই যে রোগের জন্য স্বামী নিজে দায়ী, আর সমস্ত ব্যাপারটা হল স্ত্রীকে বিরক্ত করার আর একটা ছুতো মাত্র। ইভান ইলিচ টের পেতেন মনোভঙ্গিটা ইচ্ছাকৃত নয়, কিন্তু তাতে জিনিসটা সহনীয় হয়ে উঠত না তাঁর কাছে।

আদালতে নিজের প্রতি একটি বিচিত্র মনোভঙ্গি লক্ষ্য করতেন ইভান ইলিচ; অন্তত ভাবতেন যে তিনি দেখছেন: মনে হত লোকে তাঁর দিকে চোরা চাউনি হানছে এমনভাবে যেন শীগগিরই তিনি জায়গা খালি করে যাবেন; হঠাৎ বন্ধুরা তাঁর রোগ-রোগ বাই নিয়ে হালকা ঠাট্টাতামাসা শুরু করে দিলেন, যেন তাঁর ভিতরে বেড়ে ওঠা, দিবারাত্রি তাঁকে কুড়ে কুড়ে খাওয়া, অন্য কোথায় যেন অমোঘভাবে তাঁকে টেনে নিয়ে

যাওয়া সেই ভয়াবহ, বীভৎস, অভূতপূর্ব জিনিসটা হাসিতামাসার যোগ্য খোরাক। বিশেষ করে শ্‌ভার্ৎসের ওপর বিরক্ত হতেন তিনি; তার উচ্ছল আমুদে হাবভাব, সর্বদা ফুলবাবু হবার ক্ষমতা ইভান ইলিচকে মনে করিয়ে দিত দশ বছর আগেকার নিজের কথা।

তাস খেলতে এসেছেন বন্ধুরা। টেবিলে বসে নতুন তাস ভেঙে বিলি করা হল, হাতে এল একের পর এক রুইতন, মোট সাতটা — পার্টনার 'তুরুপ নেই' বলে ঠেকালেন দুটো রুইতন। এর বেশী কী আশা করতে পারেন তিনি? অত্যন্ত আহ্লাদ হওয়া উচিত তাঁর — এবার তো 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম'। হঠাৎ ফিরে এল সেই কুড়ে কুড়ে খাওয়া ব্যথাটা, মুখে সেই বিস্বাদ, মনে হল এ অবস্থায় 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম'এ আহ্লাদ হওয়াটা স্রেফ পাগলামি।

চেয়ে দেখলেন কী ভাবে তাঁর পার্টনার, মিখাইল মিখাইলভিচ, চটপটে হাতে টেবিল ঠুকে, সৌজন্য বজায় রেখেও পিঠগুলো অনুকম্পার ভাব দেখিয়ে তুলে না নিয়ে ঠেলে দিচ্ছেন ইভান ইলিচের দিকে, যাতে কষ্ট করে হাতটা খুব না বাড়িয়ে সেগুলো ঘরে তোলার আনন্দ পান ইভান ইলিচ। 'ও কি ভাবে আমি এত দুর্বল যে হাত বাড়াবার ক্ষমতা নেই,' ভেবে ইভান ইলিচ ভুলে গেলেন তুরুপের কথা, নিজেদের পিঠেই

মারলেন তুরুপ; তাতে তিন পয়েণ্টে 'গ্র্যাণ্ড স্ল্যামটা' ফসকে গেল। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এই যে, মিখাইল মিখাইলভিচ কতটা বিচলিত হয়েছেন টের পেলেও কোনো পরোয়া নেই তাঁর। আর কেন যে পরোয়া নেই সেটা ভাবতে যাওয়াও ভয়াবহ।

তাঁর অত্যন্ত অসুস্থ লাগছে বুঝতে পেরে সবাই বলতেন, 'আপনার ক্লান্ত লাগলে আমরা খেলা থামাই। একটু জিরিয়ে নিন।' জিরিয়ে নেওয়া? কেন, তাঁর তো একটুও ক্লান্ত লাগছে না; পুরো রাবার খেলা হল। ওঁরা সবাই বেজার মুখে চুপচাপ রইলেন। ওঁদের মুখভাবের কারণ তিনি নিজে, সেটা জানেন ইভান ইলিচ, কিন্তু সেটা কাটাবার ক্ষমতা নেই। সাপার খেয়ে চলে যেতেন অতিথিরা; একা একা বসে ভাবতেন ইভান ইলিচ, নিজের জীবন তো বিষিয়ে গিয়েছে, অন্যের জীবনও বিষিয়ে তুলছেন; আর কমা দূরের কথা, তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে সে বিষে।

আর তাঁকে শুয়ে থাকতে হবে এই উপলব্ধি, এই শারীরিক ব্যথা নিয়ে, সঙ্গে থাকবে একটা বিভীষিকার ভাব। রাত্রির বেশী ভাগ কাটবে ব্যথায় বিনিদ্রায়। আর সকালে উঠতে হবে আবার, জামাকাপড় চাপিয়ে যেতে হবে আদালতে, কথা বলতে হবে, লিখতে হবে; আর আদালতে না গেলে চব্বিশ ঘণ্টা কাটাতে হবে বাড়িতে,

এক একটি ঘণ্টার মানে নরক যন্ত্রণা। এভাবে তাঁকে টিকে থাকতে হবে মৃত্যু না আসা পর্যন্ত, একেবারে একলা, কেউ বুঝবে না তাঁকে, মায়ামমতা দেখাবে না কেউ।

৫

একটি মাস কাটল এভাবে, আরো একটি মাস। নববর্ষের ঠিক আগে শ্যালক এলেন কিছুদিন কাটাতে। ইভান ইলিচ আদালতে ছিলেন। কেনাকেটা করতে বেরিয়েছেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা। বাড়িতে এসে ইভান ইলিচ দেখলেন পড়ার ঘরে নিজের জিনিসপত্র খুলছেন শ্যালক, দিব্যি স্বাস্থ্যবান মানুষটি। ইভান ইলিচের পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলে মুহূর্তখানেক কোনো কথা না বলে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। সে দৃষ্টিতে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল ইভান ইলিচের কাছে। বিস্ময়ে হাঁ করতে গিয়ে শ্যালক চেপে গেলেন। তাতে সবকিছু আরো স্পষ্ট হল।

'কী, বদলে গেছি না কি?'

'তা, হ্যাঁ... বদলেছ বটে।'

এর পর অনেক চেষ্টা করেও ইভান ইলিচ নিজের চেহারার বিষয়ে শ্যালকের কাছ থেকে আর কোনো

কথা বের করতে পারলেন না। প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা আসাতে তাঁর কাছে শ্যালক গেলেন। ইভান ইলিচ দরজা চাবি বন্ধ করে আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে দেখলেন, প্রথমে সামনাসামনি, তারপর পাশ থেকে। স্ত্রীর সঙ্গে তোলা একটি ছবি তুলে নিয়ে আয়নায় দেখা লোকটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন। সাংঘাতিক বদলে গেছেন। কনুই পর্যন্ত আস্তিন গুটিয়ে দেখলেন হাতটা একবার, তারপর হাতাটা নামিয়ে দিয়ে একটা বড়ো সোফায় এলিয়ে পড়লেন, রাত্রির চেয়ে কালো হয়ে গেল তাঁর মুখ।

'না, না, অমন করো না,' নিজেকে বলে তড়াক্ করে উঠে গেলেন লেখার টেবিলে; মামলার ফাইল খুলে পড়তে শুরু করলেন, কিন্তু পারলেন না। দরজা খুলে গেলেন হলে। ড্রয়িং-রুমের দরজা বন্ধ। পা টিপে সেখানে গিয়ে কান পেতে শুনতে লাগলেন।

'যাঃ, তুমি বাড়িয়ে বলছ,' বলছেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা।

'বাড়িয়ে বলছি মানে? নিজের চোখ নেই? ওকে তো মড়ার মতো দেখাচ্ছে। ওর চোখগুলো দেখো। একেবারে প্রাণহীন। কী হয়েছে ওর?'

'কেউ জানে না। নিকোলায়েভ' (অন্য একটি ডাক্তার) 'কী একটা বলেছেন, কিন্তু কী বলতে পারি

না... লেশেচেতিৎস্কি' (নামজাদা ডাক্তারটি) 'বলছেন ঠিক উল্টো কথা।'

সেখান থেকে চলে এসে নিজের ঘরে গিয়ে ইভান ইলিচ শুয়ে পড়লেন, ভাবনা শুরু হল: 'কিডনি, স্থানচ্যুত একটা কিডনি।' ডাক্তারদের বলা সব কথা আবার মনে করে ভাবলেন, কী করে কিডনিটা আলগা হয়ে গিয়ে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। আর কল্পনায় কিডনিটা ধরে ফেলে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিলেন তিনি। মনে হল ব্যাপারটা কী সহজ।

'না, আবার পিওতর ইভানিচের' (যে বন্ধুটির ডাক্তার-বন্ধু আছেন) 'সঙ্গে দেখা করতে হবে।' ঘণ্টা বাজিয়ে, গাড়ি আনতে বলে দেখা করার জন্য তৈরী হলেন তিনি।

'কোথায় যাচ্ছ, Jean*?' স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন বিশেষ একটা বিষণ্ণ ও অস্বাভাবিক সহৃদয় সুরে।

এই অস্বাভাবিক সহৃদয় সুরে বিরক্ত লাগল তাঁর। গোমড়া মুখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন: 'পিওতর ইভানভিচের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

যে বন্ধুটির ডাক্তার-বন্ধু আছেন তাঁর কাছে গেলেন

---

* জাঁ, রুশী 'ইভান' নামের ফরাসীকরণ।

তিনি, তারপর দুজনে মিলে গেলেন ডাক্তারের কাছে। বাড়িতেই ছিলেন তিনি, অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল তাঁর সঙ্গে।

ডাক্তারের মতে তাঁর ভিতরে যেসব শারীরস্থান ও শারীরবৃত্ত ঘটিত পরিবর্তন চলেছে তার বিশদ বিবরণ পাবার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে গেল ইভান ইলিচের কাছে।

অন্ত্রে একটা কিছু, অত্যন্ত সামান্য কিছু হয়েছে। সেটা সারানো চলে। একটি শারীরযন্ত্রের প্রক্রিয়া জোরালো করতে হবে, আর একটার কমাতে হবে, তাহলে শোষণ-ক্রিয়া চলবে এবং সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

খাবার সময় একটু দেরীতে পেঁছলেন ইভান ইলিচ। খাওয়ার পর কিছুক্ষণ খুশিতে কথাবার্তা বললেন, পড়ার ঘরে গিয়ে কাজ শুরু করতে অনেকক্ষণ পারলেন না। অবশেষে সেখানে গিয়েই বসলেন কাজে। মামলা পড়লেন, খাটলেন, কিন্তু মনের পিছনে একটি জরুরী ও গোপন ব্যাপার রয়ে গেছে, সেটা স্থগিত রেখেছেন বটে, কিন্তু কাজ শেষ হলেই সেটাকে নিয়ে পড়তে হবে, এ খেয়ালটা বরাবর রয়ে গেল। কাজ শেষ করে মনে পড়ল গোপন ব্যাপারটা কী: অন্ত্র নিয়ে চিন্তা। কিন্তু তার হাতে নিজেকে ছেড়ে না দিয়ে চা খেতে

গেলেন ড্রয়িং-র‍ুমে, সেখানে অতিথিরা, চলেছে কথাবার্তা, পিয়ানো বাজানো, গান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কন্যার বাঞ্ছনীয় পাণিপ্রার্থী তদন্তকারী হাকিমটি। প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা লক্ষ্য করলেন সবায়ের চেয়ে হাসিখ‍ুশিতে সারা সন্ধ্যা কাটালেন ইভান ইলিচ; কিন্তু ইভান ইলিচ ম‍ুহ‍ূর্তের জন্যও ভোলেন নি যে অন্ত্র নিয়ে বেশ জর‍ুরী চিন্তাটা শ‍ুধ‍ু ম‍ুলতুবী আছে। এগারোটা বাজলে সবায়ের কাছে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে গেলেন। অস‍ুখ হবার পর থেকে তিনি পড়ার ঘরের সংলগ্ন একটি ছোট ঘরে একা ঘ‍ুমোতেন। ঘরে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে জোলা'র একটি উপন্যাস টেনে নিলেন বটে, কিন্তু সেটা না পড়ে ভাবতে লাগলেন। কল্পনায় মনে হল অন্ত্রের সেই বাঞ্ছিত রোগম‍ুক্তিটা ঘটেছে, শ‍ুষে নেওয়ার কাজটা হয়েছে, হয়েছে নিষ্কাশন, ফিরে এসেছে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। মনে মনে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই; অবশ্য প্রকৃতির কাজে সহায়তা করা দরকার।' মনে পড়ে গেল ওষ‍ুধের কথা, একটু উঠে ওষ‍ুধটা খেয়ে চিৎ হয়ে শ‍ুয়ে ভাবতে লাগলেন সেটা কী উপকার দিচ্ছে, ব্যথাটা কেমন কমছে। 'শ‍ুধ‍ু নিয়ম করে এটা খেতে হবে, ক্ষতিকর জিনিস এড়িয়ে চলতে হবে। এরিমধ্যে ভালো লাগছে, অনেক ভালো লাগছে।' পাঁজরাটা টিপে দেখলেন তিনি। কণ্ট

হল না। 'কিছুই তো লাগল না, সত্যি অনেক ভালো হয়ে গেছি।' মোমবাতিটা নিভিয়ে পাশ ফিরে শুলেন... অন্ত্রটা ভালোর দিকে, শুষে নেবার কাজ চলেছে। হঠাৎ ফিরে এল সেই পুরনো পরিচিত চাপা দপদপে ব্যথাটা— মন্থর কঠোর নাছোড়বান্দা সে ব্যথা। আর মুখে সেই পরিচিত বিস্বাদ। দমে গেল বুকটা, মাথা ঘুরতে লাগল। বিড়বিড় করে বলে উঠলেন তিনি, 'হা ঈশ্বর, হা ঈশ্বর! আবার শুরু হল, আবার, এর উপশম কখনো হবে না।' আর হঠাৎ ব্যাপারটা অন্য আলোয় দেখা দিল তাঁর কাছে। মনে মনে বললেন: 'অন্ত্র! কিডনি। এটা অন্ত্র আর কিডনির ব্যাপার নয়, এটা জীবন আর... মরণের ব্যাপার। সত্যি, জীবন ছিল বটে এক কালে, এখন সেটা চলে যাচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে, রোখার সাধ্য নেই আমার। নিজেকে ঠকিয়ে কী লাভ? আমি ছাড়া আর সবায়ের কাছে এটা তো স্পষ্ট যে আমি মরতে চলেছি, সেটা কয়েক সপ্তাহ, কয়েক দিন, হয়ত এই মুহূর্তেরই ব্যাপার? আলো ছিল, এখন আঁধার। ছিলাম এখানে, যাচ্ছি ওইখানে! কোথায়?' হিম হয়ে এল শরীর, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট। হৃৎস্পন্দন ছাড়া আর কিছু কানে আসছে না।

'আমার অস্তিত্ব আর থাকবে না। কী থাকবে? কিছু না। অস্তিত্ব শেষ হলে কোথায় যাব আমি?

সত্যিই কি এটা মরণ? না, মরতে আমি চাই না!' মোমবাতিটা জ্বালাবার জন্য তিনি লাফিয়ে বসলেন, কম্পিত হাতে হাতড়ালেন সেটার জন্য, বাতি আর বাতিদানটা পড়ে গেল মেঝেতে, বালিশে, ধপাস করে আবার শুয়ে পড়লেন তিনি। 'কী এসে যায়? সব সমান,' অন্ধকারে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে মনে মনে বললেন। 'মৃত্যু। হ্যাঁ, মৃত্যু। আর ওরা জানে না সেটা, জানতে চায় না, মায়া নেই ওদের। খেলা চলছে।' (দরজার ওপাশ থেকে কানে এল একটি স্বরলহরী, পিয়ানোর সঙ্গত।) 'ওদের কাছে সবাই সমান এখন, কিন্তু ওরাও তো মরবে। বোকার দঙ্গল। প্রথমে বিদায় নেব আমি, পরে ওরাও। অথচ আমোদ আহ্লাদ করছে ওরা, জানোয়ার কোথাকার!' আক্রোশে প্রায় দম বন্ধ হয়ে এল। অসহ্য খারাপ লাগছে। সবায়ের কপালে লেখা এই বিভীষিকা, সব সময়ে লেখা, ভাবা যায় না সেটা। উঠে পড়লেন ইভান ইলিচ।

'কিছু একটা গড়বড় হয়েছে: আমার দরকার শান্ত হয়ে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ভাবা।' ভাবা শুরু হল। 'হ্যাঁ, রোগের শুরুটা। পাঁজরে ঘা খেলাম, কিন্তু তখন তো ঠিক ছিলাম, পরেও। একটু ব্যথা হয়েছিল, পরে বেড়ে গেল, তারপর শুরু হল ডাক্তারদের কাছে আনাগোনা, মনটা দমে গেল, বিষণ্ণ একটা ভাব, আরো

ডাক্তার; আর ক্রমশ খাদের মুখে এগিয়ে যাওয়া। শরীরে শক্তি রইল না। খাদের কাছে আরো কাছে। আর এখন ভেঙেচুরে পড়েছি, চোখ নিষ্প্রাণ। মৃত্যু। আর আমি কিনা ভাবছি অন্ত্রের কথা। ভাবছি অন্ত্রের রোগটা যাবে সেরে, অথচ এইতো মরণ। কিন্তু সত্যি কি তাই?' আবার আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে গেল মন; শ্বাসরোধ হয়ে এল তাঁর, নীচু হয়ে দেশলাই হাতড়াতে গিয়ে কনুই লাগল বিছানার পাশে ছোটো আলমারিটায়। সেটায় অসুবিধা হচ্ছিল, লাগছিল, চটে গিয়ে আরো জোরে সেটাতে ধাক্কা দিলেন আবার, উল্টে পড়ে গেল আলমারিটা। হতাশায়, রুদ্ধশ্বাসে, চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে সেই মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

অতিথিরা বিদায় নিচ্ছেন। ওঁদের এগিয়ে দিতে গিয়ে প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা কি একটা পড়ার শব্দ শুনে ঘরে এলেন।

'কী হল?'

'কিছু না। হঠাৎ ধাক্কা লেগে পড়ে গেছে।'

বেরিয়ে গিয়ে একটি মোমবাতি নিয়ে ফিরে এলেন তিনি। ইভান ইলিচ তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে শুয়ে আছেন, জোরে জোরে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, যেন অনেক দূর দৌড়িয়ে আসা একটা মানুষ।

'কী হল, Jean?'

'কি-কিছু না। প-ড়ে গে-ল।' ('কী বলব, বুঝবে না ও,' ভাবলেন।)

আর সত্যি বুঝলেন না স্ত্রী। আলমারিটা তুলে মোমবাতি জ্বালিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। অতিথিদের বিদায় জানাতে হবে তো।

ফিরে যখন এলেন, ইভান ইলিচ তখনো চিৎ হয়ে শুয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

'কী হল, আরো খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

মাথা নেড়ে বসলেন তিনি।

'Jean, ভাবছি লেশ্চেতিৎস্কিকে ডেকে পাঠালে হয় না?'

ডাকসাইটে ডাক্তারটিকে ডেকে পাঠানোর মানে আবার অনেক অর্থব্যয়। তিক্ত হাসি হেসে তিনি 'না' করলেন। কিছুক্ষণ বসে থেকে প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা কাছে গিয়ে তাঁর কপালে চুমু খেলেন।

চুমু খাওয়ার সময়ে মনেপ্রাণে স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা হল তাঁর; অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রইলেন যাতে ধাক্কা না দিয়ে বসেন তাঁকে।

'শুভ রাত্রি। ভগবানের দয়া হলে ঘুম এসে যাবে।'

'হ্যাঁ।'

৬

ইভান ইলিচ বুঝলেন তিনি মরতে চলেছেন; সব সময়ে হতশার ঘোর।

অন্তরের গভীরে তিনি জানতেন যে মরতে চলেছেন, কিন্তু সেটা মেনে নিতে পারছেন না, শুধু তা নয়; ওটা বুঝতেও পারলেন না, কোনোক্রমে বুঝলেন না।

কিজেওয়াটারের ন্যায়শাস্ত্র পড়ার সময়ে যে ন্যায়সূত্রটি তিনি শিখেছিলেন — 'কায়য়ুস মানুষ, মানুষেরা মর, সুতরাং কায়য়ুস মর' — সেটা সারা জীবন ধরে তিনি ভেবেছেন শুধু কায়য়ুসের বেলায় সত্য, নিজের বেলায় নয়। কায়য়ুস ছিল মানুষ, বিমূর্ত অর্থে মানুষ, তাই ন্যায়সূত্রটি খাটে তার বেলায়; কিন্তু ইভান ইলিচ তো কায়য়ুস নন, বিমূর্ত অর্থে মানুষ নন: সর্বদাই তো তিনি অন্যান্য মানুষের তুলনায় আলাদা, সমপূর্ণ আলাদা। মা-বাবার কাছে, মিতিয়া ও ভালোদিয়া, দুই ভাই'এর কাছে, কোচম্যান, আয়া ও নিজের খেলনার কাছে এবং পরে কাতিয়ার কাছে তিনি ছিলেন ভানিয়া; সেই ভানিয়া যে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সমস্ত আনন্দ বেদনা আর উচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে এসেছে। ফুটবলের চামড়ার গন্ধ এত ভালো

লাগত ভানিয়ার, সে গন্ধ কখনো পেয়েছিল কায়য়ুস? মা'র হাতে তাঁর মতো চুমু কখনো খেয়েছিল কায়য়ুস, এত ভালোবেসেছিল তাঁর সিল্কের স্কার্টের খসখসানি? স্কুলে মিঠে বিস্কুট নিয়ে কখনো কায়য়ুস হাঙ্গামা করেছিল? বা এত প্রেমে কখনো পড়েছিল? বা এজলাসের কাজ এত চমৎকারভাবে চালিয়েছিল?

সত্যি সত্যি কায়য়ুস ছিল মর, সে যে মরবে সেটা তো ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু তিনি নিজে, ভানিয়া, ইভান ইলিচ তিনি, কত না তাঁর চিন্তা ও অনুভূতি, — তাঁর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর মরাটা ন্যায়সঙ্গত হবে না। সেটা অত্যন্ত বিভীষিকাময়।

এমনি ছিল তাঁর মনোভাব।

'কায়য়ুসের মতো মৃত্যু আমার ভবিতব্য হলে সেটা ধরা পড়ত আমার কাছে, মনের ভেতর কেউ বলে দিত সেটা। কিন্তু ও ধরনের কোনো কিছু তো আমার মধ্যে নেই; সর্বদা জেনেছি কায়য়ুসের মতো আমি নই, সে কথা জেনেছে আমার বন্ধুবান্ধব সবাই। আর এখন, দেখ দিকি!' মনে মনে তিনি বললেন। 'কিন্তু এটা যে হতেই পারে না। হতে পারে না, তবু হচ্ছে। কী করে সম্ভব হল? কী করে বোঝা যায় ব্যাপারটা?'

বুঝতে না পেরে চেষ্টা করলেন ভাবনাটাকে

তাড়িয়ে দিতে, যেন ওটা মিথ্যে, বেঠিক, রুগ্ন; তার জায়গায় আনতে চেষ্টা করলেন সত্য, স্বাস্থ্যকর সব চিন্তা। কিন্তু ভাবনাটা শুধু ভাবনা নয়, বাস্তব যেন, বারবার ওটা মুখোমুখি ফিরে আসতে লাগল।

একে একে তার বদলে অন্য সব চিন্তাকে তিনি সমনজারি করলেন, যদি কিছু ভরসা পান তার আশায়। চাইলেন একটি প্রাক্তন চিন্তাধারা আবার ফিরিয়ে আনতে, যে চিন্তাধারা মৃত্যুর ভাবনাকে হটিয়ে দিত আগে। কিন্তু আশ্চর্য, যেসব জিনিস আগে মৃত্যুর চেতনাকে আড়াল, আচ্ছন্ন, বিলুপ্ত করেছিল, তারা এখন সব শক্তি হারিয়েছে। মৃত্যুকে আড়াল করে রাখা একটি প্রাক্তন চিন্তাধারা ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে হালে ইভান ইলিচের অধিকাংশ সময় কাটে। যেমন, নিজেকে তিনি বলতেন: 'কাজে ডুবে থাকতে হবে; বলতে গেলে এককালে ওটাই তো আমার মনপ্রাণ ছিল।' আর মন থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে যেতেন আদালতে। সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ চালাতেন, বসতেন চেয়ারে, আদালতে সমবেত লোকজনের ওপর চোখ বুলিয়ে নিতেন একবার, অন্যমনস্ক, চিন্তিতভাবে, শীর্ণ হাতে ওক কাঠের চেয়ারের হাতল ধরে, পাশের লোকটির দিকে আগেকার মতো ঝুঁকে কাগজপত্র উলটে ফিসফিসিয়ে কথা বলতেন,

তারপর হঠাৎ খাড়া হয়ে বসে চোখ তুলে শুনানি শুরু করার পরিচিত কথাগুলি উচ্চারণ করতেন। কিন্তু আদালতের শুনানির মাঝখানটায় পাঁজরার সেই ব্যথাটা শুরু করত তার কামরানি, শুনানি কতদূর এগিয়েছে তার পরোয়া না করে। বেশী মনোযোগ তাতে না দিয়ে মন থেকে সেটাকে হটিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন ইভান ইলিচ, কিন্তু তা নিজের কাজ করে যেত, যেন সামনে এসে সে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সোজা তাকাত চোখে; আর তিনি হতবুদ্ধি হয়ে যেতেন, চোখের আলো নিভে যেত, আবার নিজেকে শুধাতেন: 'এটাই কি একমাত্র সত্য তাহলে?' আর সহকর্মী ও অধীনস্থ কর্মচারীরা বিস্ময়ে বেদনায় লক্ষ্য করত যে মানুষটি সর্বদা এত চমৎকার ও সূক্ষ্ম বিচারে পারদর্শী ছিলেন, তাঁর গোল পাকিয়ে যাচ্ছে, ভুল করছেন তিনি। মাথা ঝটকে চেষ্টা করতেন নিজেকে আবার গুছিয়ে নিতে, কোনোক্রমে শুনানি শেষ পর্যন্ত চালিয়ে ফিরতেন বাড়ি, বিষণ্ণ এ বোধ তাঁর হত যে আদালতের কাজে যেটা তিনি চাপতে চান, আগের মতো সেটা আর চাপা যায় না; মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি তাঁকে দেবে না আইনের কোনো কাজ। আর সবচেয়ে খারাপ হল এই যে, মৃত্যু চায় তাঁর একান্ত মনোযোগ, কিছু করতে বলে না তাঁকে, শুধু চায় তিনি তাকিয়ে থাকবেন,

সে দিকে সটান তাকিয়ে থাকবেন, আর কিছু না করে কেবল ভুগবেন অকথ্য যন্ত্রণা।

মনের এই অবস্থা এড়াবার জন্য ইভান ইলিচ খুঁজতেন অন্য সান্ত্বনা, অন্য কিছুর ব্যবধান, পেতেনও সে সব ব্যবধান; কিছুক্ষণ মনে হত যেন আরাম পেয়েছেন। কিন্তু অচিরে অবসান হত সেসব ব্যবধানের শুধু তাই না, তারা বরঞ্চ যেন স্বচ্ছ হয়ে যেত, যেন সবকিছু ভেদ করে ঢোকার ক্ষমতা আছে মৃত্যুর, আড়াল রাখতে পারে সেটাকে এমন কিছু নেই পৃথিবীতে।

শেষের দিকের এই সব দিনে তিনি মাঝে মাঝে যেতেন ড্রয়িং-রুমে, এত কষ্ট করে সাজিয়েছিলেন যেটাকে, যেতেন সেই ড্রয়িং-রুমে যেখানে পড়ে গিয়েছিলেন, যার জন্য — তিক্ত বিদ্রূপের হাসি হেসে ভাবতেন তিনি, — নিজের জীবন বিসর্জন করেছেন; তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না যে রোগের সূত্রপাত হয় ওই চোট খাওয়া থেকে। ড্রয়িং-রুমে গিয়ে দেখলেন পালিশ-করা টেবিলে গভীর একটা আঁচড়। আঁচড়টার কারণ বের করতে গিয়ে দেখলেন সেটা হয়েছে ব্রোঞ্জের কাজ করা এ্যালবামের ধারটা বেঁকে যাবার ফলে। সযত্ন অনুরাগে নিজের হাতে ভরানো সেই দামী এ্যালবামটা তুলে নিয়ে কন্যা ও তার বন্ধুবান্ধবীর

অগোছালোপনার জন্য চটে উঠলেন তিনি: কোথাও ছেঁড়া, কোথাও ছবিগুলো গেছে উল্টে। সযত্নে ছবিগুলো ঠিক করে বসিয়ে ব্রোঞ্জের ধারটা সোজা করে দিলেন।

তারপর মনে হল এ্যালবামসুদ্ধ টেবিলটা ঘরের আর একটা কোণে, যেখানে টবের গাছপালা আছে, সরালে হয়। চাকরকে ডাকলেন তিনি। সাহায্য করতে এলেন স্ত্রী বা কন্যা, মতের অমিল হল দুজনের, সরানোতে তাদের আপত্তি। ইভান ইলিচ তর্ক করলেন, চটে উঠলেন। কিন্তু সবমিলে ভালো হল, কেননা তাতে তার কথা তাঁর মনে এল না, তাকে দেখা গেল না চোখে।

কিন্তু তিনি নিজে টেবিল সরাতে শুরু করলে স্ত্রী যখন বললেন, 'থাক। চাকরেরা সরাক, তোমার আবার ক্ষতি হবে,' তখন হঠাৎ পর্দার আড়াল থেকে আবার ঝলক দিল সে, তাকে তিনি দেখতে পেলেন। ঝলক দিল, কিন্তু তখনো তাঁর আশা ছিল যে আবার সরে যাবে ওটা, কিন্তু আপনা থেকে টের পেলেন পাঁজরের ব্যথাটা — সেই জিনিসটা এখনো সেখানে, এখনো চলেছে কামড়ে, ভোলা যায় না সেটাকে, টবের গাছপালার আড়াল থেকে স্পষ্ট তাঁর দিকে চেয়ে আছে সেই মৃত্যু। তাহলে এই সবে কী লাভ?

'সত্যি, এখানে, এই পর্দাটার জন্য প্রাণটা খোয়ালাম, যেন কেল্লায় হামলার সময়ে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া, সে কি হতে পারে? কী বীভৎস? কী বেকুবি! হতে পারে না এটা! পারে না... কিন্তু হচ্ছে তো।'

পড়ার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে আবার দেখলেন সেটার মুখোমুখি হয়েছেন, একা। একেবারে সামনাসামনি, করার কিছু নেই। শুধু তাকিয়ে থাকা সেটার দিকে, রক্ত হিম হয়ে যাওয়া।

৭

বলা শক্ত রোগের তৃতীয় মাসে কেমন ভাবে স্ত্রী পুত্র কন্যা, চাকরবাকর, বন্ধুবান্ধব, ডাক্তার এবং বিশেষ করে ইভান ইলিচের নিজের কাছে ধরা পড়ল যে তাঁর বিষয়ে অন্যদের শুধু একটা মাত্র ঔৎসুক্য আছে — সেটা হল কখন তাঁর চাকরিটা খালি হবে, তাঁর উপস্থিতির ভার থেকে মুক্ত হবে জলজ্যান্ত লোকগুলো, কখন নিজের দুর্ভোগ থেকে ছাড়া পাবেন তিনি নিজে। বলা শক্ত, কেননা এটা ঘটল আস্তে আস্তে, অলক্ষিতে, তিলে তিলে।

ঘুম ক্রমশ কমে গেল। আফিম খেতে দেওয়া হল, শুরু হল মরফিন ইনজেকশন। কোনো আরাম হল না তাতে। প্রথম প্রথম অর্ধ-জাগর অবস্থার ভোঁতা ব্যথাটায়

একটু আরাম হত এই অর্থে যে জিনিসটা নতুন কিছু, কিন্তু শীগগিরই সেটা অনাবৃত যন্ত্রণার মতোই হয়ে দাঁড়াল, হয়ত বা তার চেয়ে বেশী।

ডাক্তারের নির্দেশে বিশেষ বিশেষ পথ্য তৈরী হতে লাগল তাঁর জন্য, কিন্তু ক্রমশ সেগুলো সব তাঁর কাছে আরো বিস্বাদ, আরো ন্যক্কারজনক হয়ে দাঁড়াল।

পেট খোলসা যাতে হয় তার বিশেষ ব্যবস্থা করা হল। আর প্রত্যেক বারই সে এক যন্ত্রণার ব্যাপার — যন্ত্রণা, কেননা ব্যাপারটা নোংরা, অশোভন, দুর্গন্ধময়, কেননা সে কাজে সাহায্য করতে হত অন্য একটি লোককে।

অপ্রীতিকর ব্যাপারটায় কিন্তু ইভান ইলিচ একটা সান্ত্বনা পেলেন — সেটা হল এই যে, ভাঁড়ারের চাকর গেরাসিম সর্বদা আসত ময়লার পট নিয়ে যাবার জন্য।

সহুরে খাবার খেয়ে শশিকলার মতো বাড়ছে গেরাসিম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাজা এই চাষী ছোকরাটি। সবসময়ে সে হাসিখুশি, খোলা-মেলা। রুশী পোষাকে সর্বদা পরিষ্কার এই ছেলেটি এমন একটা বিচ্ছিরি কাজ করছে দেখে প্রথম প্রথম অস্বস্তি হত ইভান ইলিচের।

একবার পট থেকে উঠে আরামচেয়ারে ধপাস্ করে বসে পড়েন তিনি, প্যাণ্ট পরে নেবার শক্তি নেই, চেয়ারে এলিয়ে বসে বিভীষিকায় তাকিয়ে রইলেন থলথলে ঝুলে পড়া পেশীবহুল অনাবৃত উরুর দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকল গেরাসিম হালকা, বলিষ্ঠ পদক্ষেপে, শীতের তাজা হাওয়ার গন্ধ ছড়িয়ে, মোটা বুটজোড়া থেকে আসছে ঘষে লাগানো আলকাতরার গন্ধ। পরনে বাড়িতে বোনা এ্যাপ্রণ, পরিষ্কার সুতির শার্টের আস্তিন গুটোনো, দেখা যাচ্ছে বলিষ্ঠ নবীন দুটি হাত। ইভান ইলিচের দিকে না তাকিয়ে (তার মুখের জীবনের আনন্দের দীপ্তিতে রোগী যদি ক্ষুব্ধ বোধ করেন, বোধ হয় এই ভয়ে) সে গেল পটের কাছে।

'গেরাসিম,' ডাকলেন ইভান ইলিচ দুর্বল কণ্ঠে।

বেফাঁস কিছু হয়ত করে বসেছে, ভয়ে অল্প চমকে উঠে গেরাসিম সহজ, ভালোমানুষিতে ভরা, তাজা মুখ তাড়াতাড়ি ফেরাল রুগ্ন মানুষটির দিকে; দাড়ির প্রথম আভাস এসেছে সে মুখে।

'কী, হুজুর?'

'এটা নিশ্চয় তোর অত্যন্ত খারাপ লাগে। মাফ করিস। আমি নিজে নিজে যে পারি না।'

'কী কন যে হুজুর!' ঝলসে উঠল তার চোখ, দেখা গেল ঝকঝকে জোয়ান দাঁত, 'আপনাকে সাহায্য করব না কেন কন? আপনার তো ব্যামো হয়েছে।'

বলিষ্ঠ পটু হাতে অভ্যস্ত কাজ সেরে লঘু পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। মিনিট পাঁচেক পরে তেমনি লঘু পায়ে ফিরে এল।

তখনো আরামচেয়ারে শুয়ে ইভান ইলিচ।

পরিষ্কার পটটা ও রেখে দেবার পর তিনি বললেন, 'গেরাসিম, এদিকে এসে একটু সাহায্য কর তো।' কাছে এল গেরাসিম। 'তোল তো আমাকে। নিজে উঠতে পারছি না, আর দ্মিত্রিকে বাইরে পাঠিয়েছি।'

ঝুঁকে পড়ে গেরাসিম বলিষ্ঠ হাতে, ঠিক তার চলার মতো হালকাভাবে, তাঁকে আস্তে আস্তে, সুদক্ষভাবে তুলে একটা হাতে ধরে অন্য হাতে প্যাণ্টটা ওপরে টেনে দিল। আরামচেয়ারে আবার বসিয়ে দিতে যাচ্ছে, ইভান ইলিচ বললেন তাঁকে সোফায় নিয়ে যেতে। স্বচ্ছন্দে, শরীরে কোনো চাপ না দিয়ে, প্রায় কোলে করে সোফায় তাঁকে বসিয়ে দিল গেরাসিম।

'ধন্যবাদ। বাহাদুর ছেলে তুই — সব কাজে হাত খোলে দেখছি।'

আবার হেসে গেরাসিম বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু

সে কাছে থাকাতে ইভান ইলিচের এত খুশি লাগল যে তিনি চাইলেন না ও চলে যায়।

'শোন, ওই চেয়ারটা নিয়ে আয়। ওটা নয়, অন্যটা। পায়ের তলায় রাখ। পা তুলে বসলে হালকা লাগে।'

চেয়ার নিয়ে এসে গেরাসিম শব্দ না করে স্বচ্ছন্দভাবে সেটাকে মেঝেতে বসিয়ে ওপরে রাখল ইভান ইলিচের পা। গেরাসিম পা তুলে ধরাতে আরাম লাগছে মনে হল ইভান ইলিচের।

'পা তুলে বসলে ভালো লাগে,' বললেন ইভান ইলিচ। 'বালিশটা এনে পায়ের তলায় দে তো।'

কথামতো করল গেরাসিম। রুগীর পা আবার তুলে বালিশটা রাখল তলায়। গেরাসিম পা তুলে ধরাতে আবার ভালো লাগল ইভান ইলিচের। পা নামিয়ে দিতে খারাপ লাগল।

জিজ্ঞেস করলেন, 'গেরাসিম, তুই এখন কাজে ব্যস্ত?'

'না, হুজুর,' বলল গেরাসিম। সহুরে লোকেদের কাছে সে শিখেছে কর্তাদের কী বলে সম্বোধন করতে হয়।

‘তোর আর কী কাজ এখন?’

‘কাজ? আর কিছু না। সব তো সারা, শুধু কালকের জন্য কাঠ চেলা বাকি।’

‘আমার পাদুটো এভাবে কিছুক্ষণ ধরে তুলে রাখতে পারিস?’

‘কেন পারব না, হুজুর।’ পাদুটো উঁচু করে তুলে ধরে রইল গেরাসিম, ইভান ইলিচ কল্পনা করলেন, এ রকমভাবে থাকলে ব্যথাটা চলে যায় একেবারে।

‘আর কাঠ চ্যালার কী হবে?’

‘সে নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, হুজুর। তার সময় পাব।’

গেরাসিমকে বসিয়ে নিজের পাদুটো ধরে রাখতে বলেন ইভান ইলিচ, কথা চালালেন তার সঙ্গে। আর সত্যি অদ্ভুত, মনে হল গেরাসিম পা ধরে থাকলে সত্যি সত্যি আরাম লাগে।

এর পর থেকে থেকে গেরাসিমকে ডাকিয়ে তার কাঁধে পাদুটো রাখতে বলতেন ইভান ইলিচ, ভালো লাগত কথা বলতে ছোকরার সঙ্গে। গেরাসিম এটা করত অনায়াসে, সাগ্রহে, এত সহজে ও স্বচ্ছন্দে যে মনে নাড়া লাগত ইভান ইলিচের। লোকের স্বাস্থ্য, শক্তি ও হাসিখুশি ভাবে বিরক্তি ধরে যেত তাঁর।

কিন্তু শুধু গেরাসিমের স্বাস্থ্য ও হাসিখুশি ভাবে বিরক্ত তিনি হতেন না, বরং সান্ত্বনা পেতেন।

সবচেয়ে বেশী কষ্ট হত ইভান ইলিচের সেই প্রবঞ্চনায় — কী কারণে যেন সবাই আশ্রয় নিয়েছিল সেটির — যে তিনি শুধু অসুস্থ, মরণের মুখে নন, শান্ত হয়ে ডাক্তারের কথামতো চললেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তিনি সম্পূর্ণ জানতেন যে, যা কিছু করা হোক, অবস্থার পরিবর্তন হবে না কোনো, শুধু বেড়ে যাবে তাঁর যন্ত্রণা, মৃত্যু হবে তাঁর। প্রবঞ্চনাটি যন্ত্রণা দিত তাঁকে, যন্ত্রণা হত এইজন্য যে কেউ সে মিথ্যা স্বীকার করে না, সত্যটি তাঁর জানা, জানা সবায়ের, অথচ তাঁর ভয়ংকর অবস্থা সম্পর্কে সবাই তাঁর কাছে মিছে কথা বলছে, সবাই চাইছে এবং তাঁকে বাধ্য করছে সে মিথ্যার ভাগীদার হতে। এই প্রবঞ্চনা, আসন্ন মৃত্যুর আগে তাঁর প্রতি এই প্রবঞ্চনা যা তাঁর মৃত্যুকাণ্ডের ভয়ংকর গাম্ভীর্যকে কলুষিত করে লোকজনের দেখতে আসার স্তরে নামিয়ে দিচ্ছে, নামিয়ে দিচ্ছে দরজার পর্দা আর ডিনারে স্টার্জন খাবার স্তরে — এতে অকথ্য যন্ত্রণা হত তাঁর। আর আশ্চর্য, ওরা যখন ওঁকে নিয়ে তাদের বুজরুকি চালাত, তখন কতবার না তিনি প্রায় চেঁচিয়ে বলে ফেলতেন আর একটু হলে, 'আর ঠকাতে হবে না! তোমাদের জানতে

বাকি নেই, আমারো জানা যে আমি মরতে চলেছি। ঠকানোটা অন্তত বন্ধ করলে পারো!' কিন্তু বলার মতো বুকের পাটা কখনো হত না। বুঝতে তিনি পারতেন যে, তার ভয়ংকর দারুণ মৃত্যুকাণ্ডকে লোকে কলুষিত করে নামিয়েছে একটা আপতিক অপ্রীতিকরতার স্তরে, যে 'শালীনতার' গোলামি তিনি করে গেছেন সারা জীবন, সেই শালীনতা বশেই তারা সেটা টেনে নামিয়েছে যেন ওটা খানিকটা শালীনতা ক্ষুণ্ণতার ব্যাপার (ড্রয়িং-রুমে ঢুকে বদগন্ধ ছড়ালে লোকের প্রতি যেরকম মনোভাব নেওয়া হয়)। তিনি দেখলেন তাঁর জন্য দুঃখ পায় না কেউ, কেননা তাঁর অবস্থা বোঝার মাথাব্যথাও কারো নেই। একটিমাত্র লোক বোঝে, দুঃখ পায় তাঁর জন্য, সে হল গেরাসিম। আর তাই শুধু গেরাসিমের সঙ্গে তাঁর ভালো লাগত। মাঝে মাঝে সারারাত তাঁর পাদুটো ধরে গেরাসিম বসে থাকত, ভালো লাগত তাঁর, ঘুমোতে চাইত না গেরাসিম, বলত, 'ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না ইভান ইলিচ, পরে ঘুমোব অখন'; কিম্বা যখন হঠাৎ 'তুমি' সম্বোধনে নেমে এসে বলত, 'তোমার ব্যামো হয়েছে, সেবা করব না কেন বলো?' গেরাসিমই একমাত্র লোক যে প্রবঞ্চনা করে না; ওর সমস্ত কাজে ধরা পড়ে যে ওই একমাত্র সত্যিকার অবস্থাটা জানে, লুকোচুরির

কোনো প্রয়োজন বোধ করে না সে। আস্তে আস্তে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া দুবলা কর্তার জন্য শুধু দুঃখ পায় সে। একবার ওকে চলে যেতে বলাতে ও সোজাসুজি বলে, 'মরতে হবে আমাদের সবাইকে একদিন। কেন সেবা করব না তাহলে?' আর এটা বলে সে জানিয়ে দিল, ইভান ইলিচের দেখাশোনা করাটা তার বিরক্তিকর লাগে না এই কারণে যে সেটা করছে একটি মরণাপন্ন মানুষের জন্য, তার আশা, তারও সময় এলে অন্য কেউ সেবা করবে।

প্রবঞ্চনা আর সেই প্রবঞ্চনার সবকিছু জের ছাড়া আর যাতে তাঁর সবচেয়ে বেশী কষ্ট হত সেটা হল এই, যেভাবে তিনি চান সেভাবে কেউ দুঃখ বোধ করে না তাঁর জন্য। এমন সময় আসত যখন দীর্ঘ যন্ত্রণার পর সবচেয়ে বেশী করে তিনি চাইতেন যে, তাঁকে মমতা দেখিয়ে কেউ আদর করুক, রুগ্ন শিশুকে যেমন করে, যদিও সেটা স্বীকার করাটা তাঁর কাছে লজ্জার ব্যাপার। শিশুদের যেমন আদর করে সান্ত্বনা দেওয়া হয়, তেমনভাবে তাঁকে লোক আদর করুক, চুমো খাক, কাঁদুক, এই তিনি চাইতেন। তাঁর জানা ছিল তিনি আদালতের ভারিক্কি সদস্য, পাক ধরেছে দাড়িতে, আর তাই এমনটা হওয়া অসম্ভব। কিন্তু তবু চাইতেন সেটা। আর গেরাসিমের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে

অনেকটা এ ধরনের কিছু ছিল, তাই এতে তিনি সান্ত্বনা পেতেন। ইভান ইলিচ চাইছেন কাঁদতে, আদর আর কান্না কাড়তে, কিন্তু এই এলেন শেবেক তাঁকে দেখতে, সহকর্মী শেবেক, আদালতের সভ্য, আর কেঁদে আদর কাড়ার চেষ্টা না করে ইভান ইলিচ মুখে আনতেন কঠিন গম্ভীর চিন্তাশীল একটা ভাব, আর শুধু অভ্যাসবশে আপীল কোর্টের রায়ের তাৎপর্য নিয়ে নিজের মত প্রকাশ করতেন, আর জেদ করে সে মত ধরে থাকতেন।

নিজের আশেপাশের ও তাঁর নিজেরই ভেতরকার এই প্রবঞ্চনা সবচেয়ে বেশী করে বিষিয়ে দিয়েছিল জীবনের শেষ কটি দিন।

৮

সকাল। সকাল যে হয়েছে তার একমাত্র প্রমাণ এই যে, গেরাসিম ঘর ছেড়ে চলে গেছে, চাকর পিওতর এসে মোমবাতি নিভিয়ে একটা জানলার পর্দা সরিয়ে দিয়ে চুপচাপ ঘরটা ঠিক করছে। দিন বা রাত্রি হোক, শুক্রবার বা রবিবার, কোনো ফারাক নেই, সব সমান — শুধু সেই অবিরাম দবদবে জ্বালিয়ে-মারা ব্যথা; সেই চেতনা যে জীবন অনিবার্যভাবে সমাপ্তির দিকে যেতে

যেতে এখনো ফুরোয় নি; আর একমাত্র বাস্তব যেটা, ভয়াবহ সেই মৃত্যু আসছে এগিয়ে, আর আছে সেই প্রবঞ্চনা। দিন, সপ্তাহ, প্রহর নিয়ে ভেবে কী হবে?

'চা খাবেন, হুজুর?'

'সকালে বাড়ির লোকে চা খাবে এই নিয়মটা ওর মানা চাই,' ভাবলেন ইভান ইলিচ।

'না,' বললেন তিনি।

'হুজুর, জায়গাবদল করে সোফায় আসবেন?'

'ওকে ঘর ঠিকঠাক করতে হবে বইকি, আমি বাধা দিচ্ছি, অগোছালো করে দিচ্ছি ঘরটা, নোংরা করছি,' ভাবলেন ইভান ইলিচ।

'না। থাক,' তিনি বললেন।

চাকর আরো কিছুক্ষণ কাজ করে গেল। হাত বাড়ালেন ইভান ইলিচ। বাধ্যের মতো কাছে এল পিওতর।

'কী চান, হুজুর?'

'ঘড়িটা।'

ইভান ইলিচের হাতের কাছেই ছিল ঘড়িটা, সেটা তুলে তাঁকে দিল পিওতর।

'সাড়ে আটটা। আর সবাই উঠে পড়েছে?'

'না, হুজুর। ভাসিলি ইভানভিচ' (ইভান ইলিচের ছেলে) 'স্কুলে গেছেন আর প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা

বলে রেখেছেন যে আপনি ডাকলে যেন ওঁর জাগিয়ে দেওয়া হয়। ডাকব না কি, হুজুর?'

'থাক গে।' ('কিছু চা খেলে হয় না?' তিনি ভাবলেন।) 'হ্যাঁ, চা নিয়ে আয়।'

দরজার দিকে গেল পিওতর। একা থাকার কথা ভেবে ভয় পেলেন ইভান ইলিচ। ('কী করে ওকে আটকে রাখা যায়? ও, হ্যাঁ, ওষুধটা।') 'পিওতর, আমার ওষুধটা দে তো।' ('কেনই বা নয়? হয়ত উপকার দেবে সত্যি।') এক চামচ ওষুধ খেলেন। মুখে সেই মিষ্টি, আশাহীন স্বাদটা জেগে উঠতেই ঠিক করে ফেললেন। ('না, কোনো উপকার হবে না। বাজে কথা। নিজেকে ঠকানো শুধু। এতে আর বিশ্বাস নেই। কিন্তু কেন, কেন এই যন্ত্রণাটা? এক মুহূর্তের জন্য যদি ছাড়ান পেতাম!') কাতরিয়ে ওঠাতে পিওতর ফিরে এল। 'না, যা। চা নিয়ে আয়।'

বেরিয়ে গেল পিওতর। একা কাতরাতে থাকলেন ইভান ইলিচ, ব্যথাই যত সাঙ্ঘাতিক হোক, তার জন্য ততটা নয়, যতটা দুঃখে। 'ক্রমাগত সেই একই জিনিস, দিন আর রাতের শেষ নেই। যদি তাড়াতাড়ি হত! কোনটা তাড়াতাড়ি? মৃত্যু, তমসা। না, না! মরণের চেয়ে অন্য সব কিছু ভালো!'

পিওতর ট্রেতে করে চা নিয়ে ফিরে এল, অনেকক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন ইভান ইলিচ, লোকটা কে, কী চায়, বোঝার ক্ষমতা নেই। এভাবে তাকাতে বিব্রত লাগল পিওতরের। তার বিব্রত ভাবে হুঁশ ফিরে এল ইভান ইলিচের।

'ও, হ্যাঁ,' তিনি বললেন, 'চা এনেছিস। বেশ। নামিয়ে রাখ। হাতমুখ ধুতে সাহায্য কর তো, আর একটা পরিষ্কার শার্ট দে।'

হাতমুখ ধুতে লাগলেন ইভান ইলিচ। মাঝে মাঝে জিরিয়ে নিয়ে হাতে মুখে জল দিলেন, দাঁত মাজলেন, চুল আঁচড়ালেন, আয়নায় দেখলেন নিজের চেহারা। ভীষণ ভয় লাগল, বিশেষ করে পাণ্ডুর কপালে চাপ ধরে লেপটে থাকা চুল দেখে।

শার্ট বদলবার সময় তিনি জানতেন যে দেহের দিকে তাকালে আরো ভয় লাগবে, তাই তাকালেন না। অবশেষে হাতমুখ ধোয়া ইত্যাদি সাঙ্গ হল। ড্রেসিং-গাউন গায়ে চাপিয়ে, পায়ে কম্বল ঢাকা দিয়ে চা খেতে বসলেন একটা আরামচেয়ারে। শুধু মুহূর্তের জন্য তাজা লাগল, কিন্তু চা মুখে যেতেই আবার সেই ব্যথা, মুখের সেই স্বাদ। জোর করে চা খেয়ে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। শুয়ে পড়ে পিওতরকে বললেন যেতে।

আবার সেই একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি। মুহূর্তের জন্য এক টুকরো আশার ঝিলিক, আর পর মুহূর্তে হতাশার বিক্ষুব্ধ সাগর। আর সর্বক্ষণ ব্যথা, সেই ব্যথা, সেই ক্লেশ, বিরাম নেই তার। একা থাকলে অসহ্য খারাপ লাগে, মনে হয় কাউকে ডাকি, কিন্তু জানা তো আছে যে অন্যদের সামনে আরো খারাপ লাগে। 'যদি আবার মরফিন দেয়, হয়ত ভুলতে পারি। অন্য একটা কিছু উপায় করার জন্য বলতেই হবে ডাক্তারকে। এ অসম্ভব, অসম্ভব।'

কেটে গেল একটি ঘণ্টা, তারপর আর একটি। ঘণ্টা বাজল বাইরের হলে। ডাক্তার হয়ত। হ্যাঁ, ডাক্তারই বটে — তাজা, চাঙ্গা, মোটাসোটা, হাসিখুশি লোক, মুখের ভাবে জানাচ্ছেন, কোনো কিছুতে ঘাবড়ে গেছেন দেখছি, কিন্তু এখুনি সব ঠিক করে দিচ্ছি। মুখের এই ভাব এখানে খাপ খায় না ডাক্তার জানতেন, কিন্তু ভাবটা চিরকালের মতো মুখে চেপে বসেছে যে, সেটাকে বদলানো যায় না, যেমন বদলানো যায় না সকালে বাড়ি বাড়ি যাবার জন্য গায়ে চাপানো ফ্রক-কোটটা।

সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বেশ জোরে হাতে হাত ঘষলেন ডাক্তার।

'ঠাণ্ডায় জমে গেছি। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা। দাঁড়ান একটু, গরম হয়ে নিই,' বললেন তিনি এমনভাবে যেন শুধু গরম হয়ে নিতে মিনিট খানেক অপেক্ষা করার যা দরকার, তারপর সবকিছু ঠিক করে দেবেন।

'তা, কেমন?'

ইভান ইলিচের মনে হল ডাক্তারের বলার ইচ্ছে, 'হালচাল কেমন?' কিন্তু সেটা অনুচিত হবে ভেবে তার বদলে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাতটা কেমন কাটিয়েছেন?'

যেভাবে ইভান ইলিচ তাকালেন ডাক্তারের দিকে তার মানে, 'মিথ্যে কথা বলাতে তোমার কখনো কি লজ্জা হবে না?' কিন্তু ডাক্তার বুঝতে চাইলেন না প্রশ্নটি।

'ঠিক আগেকার মতো বীভৎসভাবে,' ইভান ইলিচ বললেন, 'ব্যথাটা যায় না কখনো, কমেও না কখনো। একটা কিছু যদি আমায় দিতেন!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনারা রোগীরা মশাই সব সমান। আচ্ছা বেশ, এখন মনে হচ্ছে শরীরটা গরম হয়ে গেছে। এমনকি প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনার মতো কড়া লোক আমার টেম্পেরাচারে কোনো খুঁত ধরতে পারবেন না। তাহলে, সুপ্রভাত,' করমর্দন করলেন ডাক্তার।

ঠাট্টাতামাসার ভাবটা দূর করে, মুখে একটা গম্ভীর

ভাব এনে ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করতে শুরু করলেন, নাড়ী দেখলেন, টেম্পেরাচার নিলেন, বুক ঠুকে ঠুকে শুনলেন কান পেতে।

ইভান ইলিচ নিঃসন্দেহে, খুব ভালো করেই জানতেন যে এ সমস্ত হল অর্থহীন, স্রেফ প্রবঞ্চনা; কিন্তু ডাক্তার যখন হাঁটু গেড়ে সামনে বসে ঝুঁকে কান রাখতেন কখনো নীচে, কখনো উঁচুতে, অত্যন্ত গম্ভীর মুখে শরীর দোমড়াতেন আর বেঁকাতেন কত না ভাবে, জিমন্যাস্টের মতো, তাতে ধরা দিতেন ইভান ইলিচ, ঠিক যেমন করে ধরা দিতেন উকিলদের বক্তৃতার জালে, যদিও তিনি জানতেন তারা মিথ্যে কথা বলছে, এমনকি কেন মিথ্যে কথা বলছে সেটা জেনেও।

সোফাতে তখনো হাঁটু গেড়ে বসে বুক ঠুকে ঠুকে দেখছেন ডাক্তার, এমন সময় দোরগোড়া থেকে এল সিল্কের খসখসানি, শোনা গেল ডাক্তারের আসার কথা তাঁকে জানায় নি বলে পিওতরকে বকছেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা।

ঘরে এসে স্বামীকে চুমো খেয়ে তক্ষুনি তিনি বোঝাতে লাগলেন যে অনেকক্ষণ হল তিনি উঠেছেন, কিন্তু একটা কিছু ভুল বোঝার জন্য ডাক্তার আসার সময়ে রোগীর ঘরে ছিলেন না।

তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলেন ইভান ইলিচ; চোখে পড়ল শরীরের খুঁটিনাটি সব। তাঁর শাদা রং, নধর ভাব, পরিষ্কার হাত আর গলা, চিকচিকে চুল, চকচকে প্রাণবন্ত চোখ, সবকিছুতে আক্রোশ হল তাঁর। মনে প্রাণে ঘৃণা বোধ করলেন তাঁর প্রতি। প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা যতবার তাঁকে ছুঁলেন ততবার ঘৃণা উথলে উঠল তাঁর।

তাঁর এবং তাঁর ব্যাধির প্রতি প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনার মনোভাব বদলায় নি। রোগীদের প্রতি ডাক্তার যেমন একটা মনোভাব খাড়া করেন, যেটা তিনি বদলাতে পারেন না, ঠিক তেমনি তাঁর প্রতি একটা মনোভাব গড়ে তুলেছেন স্ত্রী — যা করা দরকার সেটা নাকি তিনি করছেন না, ইভান ইলিচ নিজেই দায়ী, আর এর জন্য তিনি মধুরভাবে তাঁকে শুধু তিরস্কার করতে পারেন — এ মনোভাব বদলাতে পারেন না প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা।

‘কিছুতেই কথা শোনেন না উনি! নিয়মমতো ওষুধ খান না। আর সবচেয়ে খারাপ কী জানেন, জেদ করে এমনভাবে শুয়ে থাকেন যেটা ওঁর পক্ষে খারাপ নিশ্চয় — পা ওপরে তুলে।’

গেরাসিমকে দিয়ে কী করে পা তুলিয়ে রাখেন ডাক্তারকে বলা হল।

একটা মিষ্টি, অবজ্ঞার হাসি হাসলেন ডাক্তার: 'ও নিয়ে আর কী করা যায়? রোগীরা সারাক্ষণ কিছু না কিছু উদ্ভট ফন্দী বের করে, কিন্তু সেটা গায়ে মাখলে চলে না।'

রোগী দেখা শেষ করে ঘড়ির দিকে তাকালেন ডাক্তার। তখন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা ইভান ইলিচকে সাড়ম্বরে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর পছন্দ হোক বা না হোক, তিনি একটি বিখ্যাত ডাক্তারকে বলেছেন আজ এসে তাঁকে দেখতে; তিনি এবং মিখাইল দানিলভিচ (সাধারণ ডাক্তারটি) মিলে তাঁকে দেখে পরামর্শ করবেন।

'দয়া করে আপত্তি জানিও না। এটা আমি করছি নিজের জন্য,' শ্লেষের ভঙ্গিতে বলে তিনি জানিয়ে দিলেন এটা করা হচ্ছে ইভান ইলিচের খাতিরে, কথাটা বলেছেন যাতে আপত্তি করার কোনো ওজর তাঁর না থাকে। ভ্রূকুঞ্চিত করলেন ইভান ইলিচ, মুখে কিছু বললেন না। জানতেন তিনি এমন মিথ্যার জালে জড়িয়ে পড়েছেন যে কোনটা কী বের করা অসম্ভব।

স্ত্রী তাঁর জন্য যা করেন সবটা একেবারে নিজেরি জন্য, সত্যি সত্যি নিজের জন্য করেন যেটা সেটা স্বামীকে বলতেন নিজেরি জন্য করছেন, কিন্তু সেটাকে

এমন অবিশ্বাস্য একটা রূপ দিয়ে বলতেন যাতে ইভান ইলিচ অর্থটা নেন ঠিক উলটোভাবে।

সত্যি সত্যি সাড়ে এগারোটার সময়ে বিখ্যাত ডাক্তারটি এসে হাজির। আবার বুক পিঠ পেট ঠোকা, আবার ইভান ইলিচের সামনে এবং পাশের ঘরে কিডনি ও অন্ত্র নিয়ে ভারিক্কি কথাবার্তা, প্রশ্ন আর উত্তর, এমন গম্ভীর মুখে উচ্চারিত যেন এটা ফের সেই জীবন মরণের আসল প্রশ্ন নয়, একমাত্র যে প্রশ্নটার মুখোমুখি এখন ইভান ইলিচ, এটা যেন আদবকায়দা-মতো না-চলা কিডনি ও অন্ত্রের ব্যাপার, তাদের সামলে ঠিকমতো চালাবার ভার নিচ্ছেন মিখাইল দানিলভিচ ও বিখ্যাত ডাক্তারটি।

বিখ্যাত ব্যক্তিটি বিদায় নিলেন গম্ভীর মুখে কিন্তু একেবারে হাল ছেড়ে দেবার মতো করে নয়। আর ইভান ইলিচ যখন ভয় আর আশায় চিকচিকে চোখ তুলে ভীরুভাবে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন আরোগ্যের কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা, তিনি বললেন, নিশ্চিত করে সেটা বলা যায় না, তবে সম্ভাবনা একটা আছে। ডাক্তার দরজার দিকে যাবার সময়ে তাঁর দিকে ইভান ইলিচ আশাভরা যে দৃষ্টিতে তাকালেন সেটা এতই মর্মান্তিক যে ডাক্তারকে ফি দিতে পড়ার

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনাও কেঁদে ফেললেন।

ডাক্তারের আশ্বাসে চাঙ্গা লাগল ইভান ইলিচের, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। আবার সেই ঘর, সেই সব ছবি, পর্দা, দেয়ালের কাগজ, ওষুধের শিশি-বোতল আর ব্যথায় আর যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট সেই শরীর। কাতরাতে লাগলেন ইভান ইলিচ। একটা ইনজেকশন দেওয়া হল, বিস্মৃতির ঘোরে ডুবে গেলেন তিনি।

ঘোর যখন কাটল তখন গোধূলি। খাবার নিয়ে এল। মাংসের সুপ জোর করে কিছুটা খেলেন। আবার সবকিছু আগেকার মতো, রাত্রি ঘনিয়ে এল আবার।

ডিনারের পর সাতটার সময়ে সান্ধ্য পোষাকে ঘরে ঢুকলেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা, ভরাট উন্নত বুক, মুখে পাউডারের ছিটে। সকালেই স্বামীকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে থিয়েটারে যাবেন আজ। সহরে এসেছেন সারা বার্নহার্ড, ইভান ইলিচের নিজেরই নির্বন্ধে একটা বক্স নেওয়া হয়েছিল। কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন ইভান ইলিচ, স্ত্রীর সযত্ন সাজসজ্জা দেখে আহত লাগল তাঁর। কিন্তু নিজের মনোভাব তিনি প্রকাশ করলেন না, কেননা মনে পড়ে গেল যে, এ ধরনের নান্দনিক উপভোগে ছেলেমেয়েরা শিক্ষা

লাভ করবে বলে তিনি নিজেই জোর করে বক্স নিতে বলেছিলেন।

প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা ঘরে এসেছিলেন আত্মপ্রসন্নভাবে তবু অপরাধী গোছের ভাব নিয়ে। বসে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর কেমন লাগছে। তাঁর কাছে ধরা পড়ল শুধু জিজ্ঞেস করতে হয় বলে জিজ্ঞেস করেছেন, কিছু জানতে চেয়েছেন বলে নয়, কেননা জানার তো কিছু নেই। তারপর যা বলা দরকার বললেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা: থিয়েটারে যাবার কথা তিনি ভাবতেন না একেবারে, কিন্তু বক্সটা নেওয়া হয়ে গেছে, এলেন এবং তাঁদের কন্যা ও পেত্রিশ্চেভ (যে তদন্তকারী হাকিমটির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে) যাচ্ছে, ওদের একলা যেতে দেওয়া তো যায় না; অবশ্য ঘরে স্বামীর কাছে থাকতে পেলে তিনি আরো খুশি হতেন; যা হোক, যতক্ষণ তিনি বাইরে থাকবেন ততক্ষণ ডাক্তারের কথামতো তিনি যেন সবকিছু নিশ্চয় করেন দয়া করে।

'হ্যাঁ, ফিওদর পেত্রভিচ' (ভাবী জামাই) 'তোমাকে দেখতে চায়। ওকে আসতে বলব? লিজাও আসতে চায়।'

'আসুক।'

ঘরে এল সুসজ্জিতা কন্যা, নবীন দেহের অনেকটা খোলা, সে দেহ দেখে তাঁর অত্যন্ত যন্ত্রণা হল। লোক দেখানো শরীর। মেয়েটি সবল, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, স্পষ্টত প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে; রোগভোগ আর মৃত্যুর সঙ্গে মানায় না, তার সুখের ব্যাঘাত করছে তা।

ফিওদর পেত্রভিচ সান্ধ্য পোষাকে ঢুকলেন, ফরাসী অভিনেতা কাপুলের কায়দায় টেরি কাটা; দীর্ঘ শিরা-ওঠা গলা শাদা কলারে একেবারে মোড়া, বুকের ওপর চওড়া শাদা শার্ট, সরু কালো প্যাণ্ট টানটান হয়ে বসেছে জোরালো উরুর ওপর, একটা হাত শাদা দস্তানায় মোড়া, অন্যটাতে টপ-হ্যাট।

তার পেছনে সুরুৎ করে অলক্ষিতে ঢুকল ইভান ইলিচের ছেলে; স্কুলের ছাত্র, বেচারীটির গায়ে চাপানো নতুন ইউনিফর্ম, হাতে দস্তানা, চোখের কোলে বিচ্ছিরি কালি পড়েছে, যার অর্থ ইভান ইলিচের অজানা নেই।

ছেলের প্রতি তাঁর মায়া বরাবর। এখন তার সন্ত্রস্ত, সহানুভূতিপূর্ণ চাউনি কেমন যেন ভয়ংকর। মনে হল গেরাসিম ছাড়া ভাসিয়াই একমাত্র বোঝে তাঁকে, মমতা বোধ করে তাঁর জন্য।

সবাই বসল, আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল কেমন আছেন। তারপর কিছুক্ষণ কোনো কথা নেই। অপেরা-গ্লাসের কথা লিজা জিজ্ঞেস করল মা'কে। কে

কোথায় ওটা রেখেছে এ নিয়ে মা মেয়েতে অল্প একটু কথা কাটাকাটি হল। অত্যন্ত অপ্রীতিকর।

ফিওদর পেত্রভিচ জানতে চাইলেন ইভান ইলিচ সারা বার্নহার্ডকে কখনো দেখেছেন কি না। প্রথমে প্রশ্নটা ধরতে পারেন নি ইভান ইলিচ। তারপর বললেন:

'না। আপনি দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। 'আদ্রিয়েন্না লেকুভ্রিয়ার-এ'।'

প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা বললেন কী একটা পালায় নাকি ওঁর অভিনয় বিশেষ করে ভালো। আপত্তি জানাল কন্যা। তারপর শুরু হল ওঁর অভিনয়ের মধুরতা আর স্বাভাবিকতা নিয়ে আলোচনা, এ বিষয়ে সর্বদা যেসব কথা বলা হয়ে থাকে বলা হল।

আলোচনার মাঝে ইভান ইলিচের দিকে একবার তাকিয়ে ফিওদর পেত্রভিচ চুপ করে গেলেন। আর সবাইও তাকিয়ে দেখে কথা বন্ধ করল। জ্বলজ্বলে চোখে সোজা তাকিয়ে আছেন ইভান ইলিচ, মনে হল তাদের উপরে চটেছেন। কিছু একটা করা দরকার, কিন্তু করা গেল না কিছু। নৈঃশব্দটা ভাঙা দরকার, কিন্তু ভাঙার সাহস নেই কারো। সবারই ভয় যে, কিছু একটাতে ধরা পড়ে যাবে সেই শালীনতার মিথ্যাটা আর স্বরূপে হঠাৎ প্রকাশ পাবে সবকিছু। প্রথমে

সাহস হল লিজার, কথা বলল সে। সবায়ের মনোভাব গোপন করতেই চেয়েছিল সে, কিন্তু প্রকাশ করে বসল।

‘তা, যেতেই যদি হয়, তাহলে উঠতে হয় এখন,’ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, ঘড়িটা বাপের কাছে পাওয়া। বলল তার যুবকটির দিকে প্রায় অলক্ষিতে একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে; কী নিয়ে যে হাসি সেটা জানে শুধু ওরা দু’জন। তারপর সিল্কের পোষাক খসখসিয়ে উঠে পড়ল।

সবাই উঠে পড়ল, ইভান ইলিচের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

ইভান ইলিচের মনে হল ওরা চলে যাবার পর ভালো লাগছে: অন্তত সেই প্রবঞ্চনা বিদায় নিয়েছে তো, বিদায় নিয়েছে ওদের সঙ্গে। কিন্তু ব্যথা রয়ে গেল। সেই পুরনো ব্যথা, সেই পুরনো ভয়, যাতে কোনো কিছু না হয় দুর্ভার, না হয় সহজ। সবকিছু খারাপের দিকে।

আবার কাটল মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, অদলবদল নেই কোনো, শেষ নেই, কেবলি আরো ভয়ংকর সেই অমোঘ সমাপ্তি।

‘হ্যাঁ, গেরাসিমকে পাঠিয়ে দে,’ পিওতরের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন।

৯

স্ত্রী যখন ফিরলেন তখন বেশ রাত। পা টিপে ঘরে ঢুকলেও শ্বনতে পেলেন ইভান ইলিচ। চোখ খ্বলে তৎক্ষণাৎ ব্বজলেন। গেরাসিমকে পাঠিয়ে দিয়ে পাশে বসার ইচ্ছে তাঁর, কিন্তু চোখ খ্বলে ইভান ইলিচ বললেন:

'না, তুমি যাও।'

'খ্বব কষ্ট হচ্ছে ব্বঝি?'

'তাতে কিছ্ব এসে যায় না।'

'একটু আফিম খাও।'

রাজী হয়ে আফিম খেলেন ইভান ইলিচ। স্ত্রী চলে গেলেন।

সকাল তিনটে পর্যন্ত যন্ত্রণায় আধা-বেহ্বঁশ হয়ে রইলেন ইভান ইলিচ। মনে হল একটা কালো সর্ব বস্তায় তাঁকে ঠেলে ঢোকাবার চেষ্টা করা হচ্ছে, ক্রমশ ভেতরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু প্বরো ঢোকাতে পারছে না। আর এই ভয়াবহ কাণ্ডটায় যাতনা পাচ্ছেন তিনি। মনে তাঁর ভয়, তব্ব বস্তায় ঢুকে পড়তে তিনি চাইছেন, একই সঙ্গে বাধা দিচ্ছেন আর ঢোকার চেষ্টা করছেন। হঠাৎ হাতছাড়া হয়ে পড়ে গেলেন, ঘ্বম ভেঙে গেল। বিছানার পায়ের দিকটায় তখনো বসে গেরাসিম চুপচাপ ঢুলছে ধৈর্যভরে। মোজাপরা শীর্ণ

পা তার ঘাড়ে রেখে শুয়ে আছেন ইভান ইলিচ। ঢাকনার আড়ালে তখনো জ্বলছে সেই একই মোমবাতি, সেই একই ব্যথা তখনো ছাড়ে নি তাঁকে।

'শুতে যা গেরাসিম,' ফিসফিস করে তিনি বললেন।

'ঠিক আছে, হুজুর। আরো কিছুক্ষণ থাকি।'

'না, যা।'

পা নামিয়ে হাতের ওপর পাশ ফিরে শুলেন তিনি, শুরু হল নিজের প্রতি দরদ। গেরাসিম পাশের ঘরে চলে যাওয়া পর্যন্ত সবুর করে নিজেকে ছেড়ে দিলেন শিশুর মতো কান্নায়। কাঁদলেন নিজের অসহায়তার জন্য, নিজের ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার জন্য, লোকজন আর ঈশ্বরের হৃদয়হীনতার জন্য, ঈশ্বরের অনুপস্থিতির জন্য।

'কেন তুমি এ রকম করলে? কেন এনেছ আমাকে এ পৃথিবীতে? হায়, কী করেছি আমি যার জন্য আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছ এমন করে?'

জবাবের প্রত্যাশা তিনি করেন নি; তিনি কাঁদলেন এইজন্য যে, কোনো জবাব নেই, থাকতে পারে না কোনো জবাব। আবার শুরু হল ব্যথা, কিন্তু নড়াচড়া তিনি করলেন না, ডাকলেন না কাউকে। শুধু মনে মনে

বললেন: 'বেশ, আবার আঘাত করো আমাকে! কিন্তু কেন? তোমার কী করেছি, কেন?'

তারপর শান্ত হয়ে শুধু কান্না নয়, নিশ্বাসপ্রশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ করে কান পেতে শুনতে লাগলেন: মুখের উচ্চারিত কথা নয়, যেন অন্তরের কথা শুনছেন, কান পেতে শুনছেন নিজের মধ্যে প্রবাহিত চিন্তাস্রোত।

'কী চাও তুমি?' যা শুনলেন তার মধ্যে এইটি হল বাক্যে ভাষা পাবার মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠা প্রথম প্রত্যয়টি। 'কী চাও তুমি? কী চাও তুমি?' মনে মনে আওড়ালেন তিনি। 'কী?' — 'চাই না যন্ত্রণা পেতে। বাঁচতে চাই,' জবাবে বললেন।

আবার একাগ্র মনোযোগে আবিষ্ট হলেন, সে মনোযোগ এত সংহত যে এমনকি তাঁর ব্যথা পর্যন্ত তাঁকে অন্যমনস্ক করতে পারল না।

'বাঁচতে? কেমন করে বাঁচতে?' শুধাল অন্তরের সেই স্বর।

'যেভাবে বেঁচেছি আগে; ভালো করে, আরাম করে।'

'আগে যেমনভাবে ছিলে, ভালো করে, আরাম করে?' শুধাল সেই স্বর। আর নিজের সুখী জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলির কথা মনে যাচিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। কিন্তু আশ্চর্য, সুখী জীবনের শ্রেষ্ঠ

মুহূর্তগুলি তাঁর কাছে আর সে-রকমটি মনে হল না যেমনটি মনে হয়েছিল আগে। কোনোটিই নয়, ছেলেবেলাকার একেবারে প্রথম দিকের স্মৃতিগুলি ছাড়া। শৈশবে সত্যি সত্যি সুখের কিছু ছিল, আবার ফিরে এলে তা নিয়ে বাঁচা যায়। কিন্তু সে সুখ ভোগ করেছিল যে, সে আর নেই। এ যেন অন্য কারো স্মৃতি।

আজকের এই ইভান ইলিচ যেসব ঘটনার পরিণাম, তা যখন থেকে শুরু হয়েছে, তখন যা আনন্দের জিনিস মনে হয়েছিল এককালে, সবকিছু তাঁর দৃষ্টির সামনে গলে গিয়ে পরিণত হয় অকিঞ্চিৎকর, এমনকি পাষণ্ডোচিত কিছুতে।

শৈশব ছেড়ে যত তিনি এগোলেন, যত কাছে এলেন বর্তমানের, তত অকিঞ্চিৎকর আর অনিশ্চিত মনে হতে লাগল নিজের আনন্দকে। আইনের স্কুল থেকেই তার শুরু। তখনো সত্যি সত্যি ভালো জিনিস কিছু ছিল স্কুলে: ছিল আনন্দ, বন্ধুত্ব আর আশা। কিন্তু যত ওপরের ক্লাসে উঠেছেন তত কমে গেছে সুন্দর মুহূর্তগুলি। পরে, প্রদেশপালের কাছে কাজের প্রথম কটি বছরে, আবার ফিরে এসেছে সুন্দর মুহূর্তগুলি: সেগুলি হল নারীর প্রতি ভালোবাসা নিয়ে। তারপর জীবন হয়ে দাঁড়াল জটিল, কমে গেল

ভালো জিনিসের সংখ্যা। পরে আরো কমে গেল সেগুলি, যত দিন গেছে তত কমে গিয়েছে।

বিয়ে হল, হল আচমকা, আর আশাভঙ্গ, স্ত্রীর নিশ্বাসপ্রশ্বাসে সেই গন্ধ, সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, সেই ছলনার পালা! আর তাঁর সেই নিস্প্রাণ জীবিকা, টাকা নিয়ে দুশ্চিন্তা — বছরের পর বছর, এক বছর, দুই, দশ, বিশ বছর সেই একই জিনিস। যত দিন যায় তত নিস্প্রাণ। যেন পাহাড় থেকে গড়িয়ে নামা ক্রমাগত, অথচ ভেবেছিলাম উঠছি ওপরের দিকে। হ্যাঁ, ঠিক তাই। সকলের ধারণা আমি ওপরে উঠছিলাম, আর সমান পরিমাণেই জীবন সরে গেছে পায়ের তলা থেকে... আর এখন শেষ, এবার মরো!

'তাহলে কী ব্যাপার? কেন? এটা হতে পারে না। এটা হতে পারে না যে আমার জীবন ছিল এত কুচ্ছিৎ আর অর্থহীন। কিন্তু সত্যিই, এত কুচ্ছিৎ আর অর্থহীন হলেও আমাকে মরতে হবে কেন, কেন মরতে হবে এত যন্ত্রণা পেয়ে? কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে কোথাও।

'হয়ত যেভাবে বাঁচা উচিত সেভাবে বাঁচি নি?' হঠাৎ মনে হল কথাটা। 'কিন্তু তা কী করে হয়, যখন যা উচিত সবই তো করেছি,' নিজেকে শুধালেন তিনি, আর তৎক্ষণাৎ জীবন মরণের গোটা ধাঁধাটার এই একমাত্র

উত্তর মন থেকে হটিয়ে দিলেন যেন তা একেবারে অসম্ভব।

‘কী চাও এবার? বাঁচতে? কী ভাবে বাঁচতে? বাঁচো যেভাবে আদালতে বেঁচেছো, দৌবারিক চেঁচিয়ে বলেছে, “বিচার বসছে!..” বিচার বসছে, বিচার বসছে,’ পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি। ‘এই বার বিচার! কিন্তু আমার তো দোষ নেই!’ চেঁচিয়ে উঠলেন রাগে। ‘কী অপরাধ আমার?’ কান্না থামিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে একই কথা তোলপাড় করতে লাগলেন মনে: কেন, কী কারণে আমাকে সইতে হবে এই সমস্ত বিভীষিকা?

যতই না ভাবুন হদিস মিলল না কোনো। আর যখনি মনে হত (মনে হত বারবার) যে উচিতমতো না বাঁচার পরিণাম এ সব, তখনি কী রকম নিখুঁতভাবে বেঁচেছেন সে কথাটা ভেবে অদ্ভুত চিন্তাটিকে দূর করে দিতেন।

১০

আরো দু’সপ্তাহ কাটল। সোফা ছেড়ে আর ওঠেন না ইভান ইলিচ। বিছানায় শুয়ে থাকতে চান না বলে সোফায় শুয়ে থাকেন। বেশির ভাগ সময়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে সেই দুর্বোধ্য যন্ত্রণা একেবারে

একা ভোগ করেন, একা একা মনে তোলপাড় করেন সেই দুর্বোধ্য ভাবনা: 'জিনিসটা কী? সত্যি কি, এটা মৃত্যু?' আর অন্তরের সেই স্বর জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, সত্যি, মৃত্যু এটা।' 'কিন্তু কেন এ যন্ত্রণা?' জবাব দেয় অন্তরের সেই স্বর, 'এমনি, কারণ নেই কোনো।' এর পরে — এ ছাড়া আর কিছু নেই।

অসুখের সূত্রপাত থেকে, ডাক্তারের কাছে প্রথম যেদিন যান, সেদিন থেকে ইভান ইলিচের জীবন দুটি পরস্পরবিরোধী মনোভাবে বিচ্ছিন্ন, আসত তা পালা করে: তার একটি হল হতাশা, ভয়াবহ অবোধ্য মৃত্যুর প্রতীক্ষা আর একটি হল আশা, নিজ শরীরের নানা প্রক্রিয়ার সাগ্রহ পর্যবেক্ষণ। হয়ত চোখের সামনে দেখতেন কেবল কিডনি বা অন্ত্র, তখনকার মতো নিজেদের কাজ করতে গররাজী তারা; আবার কখনো দেখতেন শুধু মৃত্যু, ভয়াবহ, অবোধ্য মৃত্যু, নিস্তার নেই তা থেকে।

অসুখের গোড়া থেকে পালা করে এসেছে এদুটি মনোভাব; কিন্তু অসুখ যত বেড়ে চলল তত আজব ও অসম্ভব লাগল কিডনি নিয়ে তাঁর নানা কল্পনা, তত বাস্তব ঠেকতে লাগল আসন্ন মৃত্যুর বোধ।

তিন মাস আগে কী ছিলেন আর এখন কী, শুধু এটা ভাবলেই, কী ভাবে ক্রমশ সমানে চলেছেন অতলের

দিকে, এটা ভাবলেই আশার সমস্ত সম্ভাবনা ধূলিসাৎ হয়ে যেত।

দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে সোফায় শুয়ে নিজের নিঃসঙ্গতার শেষ কটি দিনে, জনমুখর সহরের মধ্যে নিজের সব বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের ভিড়ের মাঝে নিঃসঙ্গতায়, সমুদ্রের তলে বা পৃথিবীতে, কোথাও যার চেয়ে গভীর নিঃসঙ্গতা থাকতে পারে না, — সেই ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার শেষ কটি দিনে ইভান ইলিচ বেঁচেছিলেন শুধু অতীতকে নিয়ে। একে একে মনে আসত অতীত দিনের নানা ছবি। সর্বদা তাদের আরম্ভ হত নিকটের কোনো ঘটনা দিয়ে, তারপর চলে যেত দূর অতীতে, তাঁর শৈশবে, সেখানেই থেমে পড়ত তারা। হয়ত মনে পড়ল এখন তাঁকে খেতে দেওয়া শেদ্ধ কুলের কথা, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল শৈশবের সেই চটচটে, আকুঞ্চিত ফরাসী বদরী, তাদের অদ্ভুত স্বাদ, তাদের বীচি চাটলে কত না লালা ঝরত, আর স্বাদের এই স্মৃতির সঙ্গে জেগে উঠত সে সময়কার অনেক স্মৃতি একটার পর একটা: আয়ার কথা, ভাইয়ের কথা, খেলনাগুলোর কথা। 'ওদের কথা ভাবা চলবে না... বেজায় কষ্ট হয়,' নিজেকে বলে চিন্তাধারার মোড় ঘোরাতেন বর্তমানে। সোফার পিঠের বোতামটা, মরক্কো চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। 'চামড়াটা দামী, টেকে না

কিন্তু; এই নিয়ে তো স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম। কিন্তু বাবার ব্যাগটা যখন ছিঁড়ে ফেলি, সে মরক্কো চামড়াটা অন্যরকমের ছিল, আর হাঙ্গামাটাও হয় অন্যরকম, আমাদের সাজা দেওয়া হয়, মা কিন্তু আমাদের পেস্ট্রি এনে দিয়েছিলেন।' আবার ভাবনাচিন্তা ফিরে গেল শৈশবে, আবার তাতে কষ্ট পেয়ে অন্য কিছু ভেবে মন থেকে হটিয়ে দিয়ে চাইলেন তাদের ইভান ইলিচ।

আর এই চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় করে এল অন্য সব চিন্তা — কী করে অসুখটা বেড়েছে ও বেড়ে চলছে। অতীতে যত দূর তিনি ফিরে যান তত প্রাণবন্ত ঠেকে জীবনকে। আগে জীবনে মঙ্গলও ছিল বেশি, খোদ জীবনও ছিল বড়ো। দুইই ছিল একত্রে মিশে। 'যন্ত্রণা যেমন দিনে দিনে বেড়ে চলেছে, ঠিক তেমনি করে সারা জীবনও গিয়েছে খারাপের দিকে,' তিনি ভাবলেন। একটি আলোর ছটা ছিল পেছনে, ছিল একেবারে জীবনের সূত্রপাতের সময়টায়। তারপর ক্রমশ সব কালো, আরো কালো হয়ে এসেছে দ্রুতগতিতে। 'মৃত্যু থেকে দূরত্বের বিপরীত অনুপাতে,' ভাবলেন ইভান ইলিচ। ক্রমশ বেগবান পড়ন্ত পাথরের উপমা মনে এল এক ঝলকে। ক্রমশ বাড়ন্ত যন্ত্রণার সমষ্টি এই জীবন দ্রুত থেকে

দ্রুতগতিতে সমাপ্তির দিকে চলেছে, ভয়ঙ্করতম যন্ত্রণার দিকে। 'আমি পড়ে যাচ্ছি...' চমকে উঠে, নড়েচড়ে সেটা ঠেকাবার চেষ্টা করলেন তিনি; কিন্তু বুঝতে বাকি রইল না যে ঠেকানো অসম্ভব। সামনে চেয়ে থেকে থেকে চোখ তাঁর অবসন্ন, অথচ সেখান থেকে চোখ ফেরাবার ক্ষমতা নেই, সেই শ্রান্ত চোখেই তাকিয়ে রইলেন সোফার পিঠে, অপেক্ষা করে রইলেন — অপেক্ষা করে রইলেন সেই ভয়াবহ পতনের জন্য, চরম আঘাতের, বিনষ্টির জন্য। বললেন নিজেকে, 'ঠেকানো অসাধ্য। কিন্তু কেন এমনটা হল যদি অন্তত সেটুকুও বুঝতে পারতাম। কিন্তু সেও অসম্ভব। উচিতমতো না বেঁচে থাকলে কথাটার কিছু মানে হত। কিন্তু সেটা স্বীকার করা যে অসম্ভব,' নিজেকে বললেন, মনে পড়ল নিজের অভ্রান্ত, শালীন, সঙ্গত জীবনের সমস্তটা। 'এটা তো আমি মেনে নিতে পারি না,' বললেন নিজেকে, ঠোঁটদুটো ফাঁক করে, যেন কাউকে তাঁর হাসি দেখিয়ে প্রতারিত করা যাবে। 'কোনো অর্থ নেই! যন্ত্রণা, মৃত্যু... কেন?'

১১

আরো দুটো সপ্তাহ কাটল এভাবে। এর মধ্যে যে জিনিসটা আশা করেছিলেন তিনি এবং তাঁর স্ত্রী সেটা ঘটল। পেত্রিশ্চেভ কন্যার পাণিপ্রার্থনা করল যথারীতি।

ব্যাপারটা ঘটে সন্ধ্যাকালে। পরের দিন সকালে স্বামীর ঘরে এলেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা, প্রস্তাবটা কী করে তাঁকে শোনাবেন মনে মনে মহড়া দিতে দিতে। কিন্তু রাত্রে ইভান ইলিচের অবস্থাটা নতুন করে খারাপের দিকে গিয়েছিল। সেই সোফাতেই তাঁকে শুয়ে থাকতে দেখলেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা, কিন্তু শোবার ধরনটা অন্যরকম। উপুড় হয়ে সামনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কাতরাচ্ছিলেন তিনি।

তাঁকে ওষুধের কথা বলতে শুরু করাতে চোখ ফিরিয়ে ইভান ইলিচ চাইলেন। এত তীব্র আক্রোশ — তাঁর প্রতি আক্রোশ সে দৃষ্টিতে যে কথাটা আর শেষ করা হল না।

‘দোহাই ভগবানের, আমাকে শান্তিতে মরতে দাও,’ তিনি বললেন।

চলে যেতে চাইছিলেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা, কিন্তু ঠিক তখন কন্যা ঘরে ঢুকে বাবার কাছে গেল সুপ্রভাত জানাতে। স্ত্রীর দিকে যেভাবে তাকিয়েছিলেন ঠিক সেভাবে তিনি তাকালেন কন্যার দিকে, আর তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞেস করাতে শুকনো গলায় বললেন যে শীগগিরই তাঁর হাত থেকে রেহাই পাবে তাঁরা সবাই। স্ত্রী ও কন্যা চুপ করে গিয়ে অল্প একটু বসে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

'আমাদের কী দোষ?' মাকে বলল লিজা, 'যেন রোগটা আমরাই ঘটিয়েছি! বাবার জন্য দুঃখ হয়, কিন্তু উনি আমাদের যন্ত্রণা দেন কেন?'

যথাসময়ে ডাক্তার এলেন। জ্বলন্ত চোখে তাঁর দিকে সমস্ত ক্ষণ চেয়ে শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' করে গেলেন ইভান ইলিচ। শেষের দিকে বললেন:

'আমার কিছুতে কিছু হবে না জানেনই তো; একলা থাকতে দিন আমায়।'

'আপনার যন্ত্রণা তো কমাতে পারি,' ডাক্তার বললেন।

'না, তাও পারেন না; আমাকে রেহাই দিন।'

ড্রয়িং-রুমে গিয়ে ডাক্তার প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনাকে জানালেন যে ইভান ইলিচের অবস্থা সঙীন; ভয়াবহ যন্ত্রণা পাচ্ছেন তিনি সন্দেহ নেই, সেটা কমাবার একমাত্র উপায় হল আফিম।

ডাক্তার বললেন ইভান ইলিচের শারীরিক যন্ত্রণাটা ভয়াবহ; কথাটা ঠিক; কিন্তু শরীরের যন্ত্রণার চেয়ে বেশী ভয়াবহ তার নৈতিক যন্ত্রণা; এই-ই তাঁর আসল যন্ত্রণা।

নৈতিক যন্ত্রণা শুরু হয় রাত্রে, যখন গেরাসিমের ঘুমজড়ানো, চওড়া-হাড় ভালোমানুষিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তাঁর মনে হল: 'আমার সমস্ত জীবন,

আমার সজ্ঞান জীবন, যা হওয়া উচিত ছিল সত্যি তেমনটা যদি না হয়ে থাকে, তাহলে?'

মনে এ চিন্তাটা এল যে, যেটা একেবারে অসম্ভব ঠেকেছিল আগে — উচিতমতো যে জীবনধারণ করেন নি, সেটা সত্যি হতে পারে। মনে এল এ চিন্তাটা যে, মান্যগণ্য লোকেরা যা ভালো বলে বিবেচনা করেন তার বিরুদ্ধে লড়ার জন্য তাঁর সেই প্রায় অস্পষ্ট প্রবণতা যা তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ঝেড়ে ফেলেছেন — সেগুলিই একমাত্র হয়ত আসল জিনিস, বাকি সব আসল নয়। তাঁর সরকারী কাজকর্ম, তাঁর জীবনযাত্রার ধরণধারণ, তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সমাজ ও চাকরির এইসব স্বার্থ, এ সব হয়ত আসল নয়। এগুলির সাফাই গাওয়ার চেষ্টা তিনি করলেন, কিন্তু হঠাৎ মনে হল যাদের সাফাই গাইছেন সেগুলো কিছু নয়। সাফাই গাইবার কিছু নেই।

নিজেকে বললেন, 'তাই যদি সত্যি হয়, যা পেয়েছিলাম সবকিছু নষ্ট করছি, কিছু করার আর নেই, এই উপলব্ধি নিয়ে যদি মরতে হয়, তাহলে?' উপুড় হয়ে শুয়ে একেবারে অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজের জীবনকে যাচাই করতে লাগলেন তিনি। সকালে যখন দেখলেন চাকরকে, তারপর স্ত্রীকে, তারপর কন্যাকে এবং অবশেষে ডাক্তারকে, তখন তাঁদের প্রতিটি চলন,

প্রতিটি কথা রাত্রে তাঁর কাছে উদ্ভাসিত ভয়াবহ সত্যকে সমর্থন করল। তাঁদের মধ্যে দেখলেন নিজেকে, জীবনে যাকিছু নিয়ে থেকেছেন সেই সবকিছু, স্পষ্ট দেখলেন এসব সাঁচ্চা জিনিস নয় একেবারে, সব একটা ভয়াবহ ও বিরাট ধাপ্পা, জীবন ও মরণকে যা ধামাচাপা দিয়ে রেখেছে। উপলব্ধিটা দশগুণ বাড়িয়ে দিল শারীরিক যন্ত্রণা। কাতরাতে আর ছটফট করতে লাগলেন তিনি, নিজের জামাকাপড় টানাটানি করতে লাগলেন। মনে হল জামাকাপড়গুলো চাপ দিচ্ছে, শ্বাসরোধ করছে তাঁর, ঘেন্না ধরে গেল তাঁদের ওপর।

বড়ো এক ডোজ আফিম দেওয়াতে এল বিস্মৃতি, কিন্তু ডিনারের সময় আবার শুরু হল সব। সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে বিছানায় ছটফট করতে থাকলেন।

স্ত্রী কাছে এসে বললেন:

'ওগো শুনছ, আমার জন্য এটা করো।' (আমার জন্য?) 'এতে কোনো ক্ষতি তো হবে না, অনেক সময়ে কাজ দেয়। এ আর এমনকি। অনেক সময়ে তো সুস্থ লোকেরা পর্যন্ত...'

বিস্ফারিত চোখে স্ত্রীর দিকে তিনি তাকালেন।

'কী? সাক্রামেণ্ট? কেন? চাই না আমার... তবে...'

কেঁদে ফেললেন স্ত্রী।

'করবে তো গো? আমাদের পাদ্রীকে ডেকে পাঠাই, উনি এত ভালো লোক।'

'বেশ। খুব ভালো,' বললেন ইভান ইলিচ।

পাদ্রী এলেন, তাঁর কাছে পাপস্বীকার করে মনটা হালকা হয়ে গেল ইভান ইলিচের, মনে হল সন্দেহের অবসান হয়েছে; এতে যন্ত্রণা কমে গেল, আর নিমেষের জন্য এল আশা। আবার অন্ত্রের কথা, ওটা সেরে যাবার সম্ভাবনার কথা ভাবতে লাগলেন। সাক্রামেণ্ট নেবার সময়ে চোখে জল এল।

সাক্রামেণ্ট নেবার পর শুইয়ে দেওয়াতে অলপক্ষণের জন্য ভালো লাগল, আবার দেখা দিল আরোগ্যের আশা। ডাক্তারের প্রস্তাবিত অস্ত্রোপচারের কথা ভাবতে লাগলেন। বললেন নিজেকে, 'আমি বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই।' অভিনন্দন জানাতে এসে স্ত্রী গতানুগতিক যা বলা হয়ে থাকে বলে জিজ্ঞেস করলেন:

'সত্যি ভালো লাগছে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে তিনি জবাব দিলেন।

স্ত্রীর পোষাক, তাঁর গড়ন, মুখের ভাব, গলার স্বর — সবকিছু তাঁকে জানিয়ে দিল: 'এ সব মেকি। যাকিছু নিয়ে দিন কাটিয়েছ, এখনো কাটাচ্ছ, সব মিথ্যা, সব ধাপ্পা, জীবন ও মরণকে ঢেকে রেখেছে তোমার কাছ থেকে।' যে মুহূর্তে এই চিন্তা এল, সেই মুহূর্তে

অন্তরে জাগ্রত হল ঘৃণা; আর ঘৃণার সঙ্গে এল ভয়ঙ্কর শারীরিক যন্ত্রণা; আর যন্ত্রণার সঙ্গে এল আসন্ন, অমোঘ মৃত্যুর উপলব্ধি। শুরু হল নতুন উপসর্গ সব: কী একটা শুরু করল মোচড় দিতে, বিঁধতে, দম বন্ধ করে দিতে।

'হ্যাঁ', শব্দটি উচ্চারণ করার সময়ে মুখের ভাবটি ভয়াবহ। উচ্চারণ করে সটান স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তাঁর দুর্বল শরীরের পক্ষে অস্বাভাবিক তাড়াতাড়ি উপুড় হয়ে শুয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন:

'চলে যাও! চলে যাও! একলা থাকতে দাও আমায়!'

১২

সেই মুহূর্ত থেকে শুরু হয়ে তিন দিন ধরে অবিরাম চলল সেই চীৎকার, যে চীৎকার এত ভয়ঙ্কর যে দুটো ঘর ছাড়িয়ে কারো কানে গেলেও ভয়ঙ্কর। স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝলেন তাঁর দফারফা, আর ফিরতে পারবেন না, সমাপ্তি, চরম সমাপ্তি আসন্ন; বুঝলেন নিজের সমস্ত সন্দেহ সন্দেহই থেকে যাবে, উত্তর মিলবে না কখনো।

'আঁ! আঁ! আঁ!' চেঁচাতেন তিনি বিভিন্ন সুরে। 'চা... ই... না!' বলে শুরু করেছিলেন চেঁচিয়ে আর সেই 'আঁ'টাই চেঁচিয়ে চললেন।

তিনটে দিন সমস্তক্ষণ, সে তিনটে দিন তাঁর কাছে অসীম, তিনি ধস্তাধস্তি করলেন সেই কালো বস্তায় যেটাতে অদৃশ্য, অদম্য কী একটা শক্তি ঠেলে ঢোকাচ্ছিল তাঁকে। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত লোক নিস্তারের আশা নেই জেনেও জল্লাদের হাতে ছটফট করে যেমন, তেমনভাবে লড়াই চালালেন তিনি। আর বুঝলেন যে প্রতি মুহূর্তে, যতই মরিয়া হয়ে লড়ুন না কেন, তাঁকে আতঙ্কগ্রস্ত করে দেওয়া সেই জিনিসটার কাছে গিয়ে পড়ছেন, ক্রমশ কাছে। মনে হল সেই অন্ধকার গহ্বরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বলে তাঁর যন্ত্রণা, নিজেও সেটাতে ঢুকে পড়তে পারছেন না বলে আরো যন্ত্রণা। নিজের জীবনটা ভালো ছিল, এই বিশ্বাসের জন্য তিনি ঢুকে পড়তে পারছেন না সেটায়। নিজের জীবনযাত্রার সাফাইয়ে তিনি আটকে যাচ্ছেন, এগোতে দিচ্ছে না তা, সেটাই সবচেয়ে বেশী যন্ত্রণাকর।

হঠাৎ কী একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগল বুকে আর পাঁজরে, আরো দম বন্ধ হয়ে এল; সটান ফুটোটার মধ্যে পড়ে গেলেন তিনি, আর সেখানে, গহ্বরটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে দেখলেন চিকচিকে একটা আলো। রেলকামরায় বসে যেমন অনুভূতি হত সে-রকমটা হল: তিনি ভেবেছিলেন যে সামনের দিকে যাচ্ছেন, অথচ যাচ্ছিলেন পেছনের দিকে, আর

হঠাৎ সত্যিকার দিকটা ধরা পড়ে তাঁর কাছে।

মনে মনে বললেন, 'হ্যাঁ, সব মেকি। কিন্তু ঠিক আছে। এখনো, এখনো 'আসল' যা তা করা যায়। কিন্তু 'আসল'টাই বা কী?' নিজেকে শুধিয়ে হঠাৎ স্থির হয়ে গেলেন।

তৃতীয় দিনে ঘটে এটা, মৃত্যুর ঘণ্টাখানেক আগে। ঠিক সে সময়ে ছেলে চুপিচুপি ঘরে এসে বাপের বিছানার কাছে এল। মুমূর্ষু মানুষটি তখন পাগলের মতো চিৎকার করে হাত ছুঁড়ছেন। একটা হাত পড়ল ছেলের মাথায়। হাতটা আঁকড়ে ধরে ঠোঁটে চেপে ধরে কাঁদতে লাগল সে।

ঠিক এই সময়টায় ইভান ইলিচ পড়ে গিয়েছিলেন গহ্বরে, দেখেছিলেন আলো, উদ্ভাসিত হয়েছিল তাঁর কাছে যে জীবনটা উচিতমতো কাটে নি বটে, কিন্তু ভুল শোধরাবার সময় এখনো আছে। 'আসল'টা কী?' নিজেকে শুধিয়ে শান্ত হয়ে কান পেতে শুনছিলেন। ঠিক এ সময়ে হুঁশ হল কে যেন চুমো খাচ্ছে হাতে। চোখ খুলে চাইলেন ছেলের দিকে। দুঃখ হল তার জন্য। কাছে এলেন স্ত্রী। তাঁর দিকে তাকালেন। তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্ত্রী, মুখটা হাঁ হয়ে গেছে, নাকে আর গালে তখনো চোখের জল, মুখ হতাশায় ভরা। স্ত্রীর প্রতি করুণা হল।

ভাবলেন, 'ওদের বড়ো কষ্ট দিচ্ছি। আমার জন্য ওরা দুঃখ পাচ্ছে, কিন্তু আমি চলে গেলে ওদের ভালো হবে।' কথাটা বলতে চাইলেন তাদের, কিন্তু শক্তিতে কুলোল না। ভাবলেন, 'কিন্তু বলে কী লাভ? কাজটা করা চাই।' স্ত্রীর দিকে ফিরে চোখের ইসারায় দেখালেন ছেলের দিকে।

'ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও...' বললেন। 'কষ্ট হচ্ছে ওর জন্য... তোমার জন্যও...' বলতে চাইলেন 'আমার পাপ ভুলে যাও', কিন্তু বললেন 'আমার পথ ছেড়ে দাও', নিজেকে শোধরাবার আর শক্তি ছিল না; হাতটা শুধু একবার নাড়লেন এই জেনে যে, যার বোঝার কথা সে বুঝবে।

আর হঠাৎ স্পষ্ট হল তাঁর কাছে যে, যা তাঁকে যন্ত্রণা দিয়েছে, যার ভার কাটাতে পারেন নি সব এখন আপনা থেকে খসে পড়ছে, খসে পড়ছে দু'দিক থেকে, দশদিক থেকে, সবদিক থেকে একসঙ্গে। দুঃখ হল ওদের জন্য, ওদের যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য কিছু একটা করা দরকার। এ যন্ত্রণার বোঝা থেকে মুক্ত করতে হবে ওদের, মুক্ত করতে হবে নিজেকে। 'কী ভালো, কী না সহজ!' তিনি ভাবলেন। 'আর ব্যথাটা?' শুধালেন নিজেকে। 'ব্যথাটা কই, কোথায় রে তুই?'

কান পেতে শুনতে লাগলেন।

'আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেউ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল।'

(মথি লিখিত সুসমাচার ৫;২৮)

'শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, যদি আপন স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের এরূপ সম্বন্ধ হয়, তবে বিবাহ করা ভাল নয়।

তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, সকলে এই কথা গ্রহণ করে না, কিন্তু যাহাদিগকে ক্ষমতা দত্ত হইয়াছে, তাহারাই করে।

কারণ এমন নপুংসক আছে, যাহারা মাতার উদর হইতে সেইরূপ হইয়া জন্মিয়াছে; আর এমন নপুংসক আছে, যাহাদিগকে মানুষ নপুংসক করিয়াছে; আর এমন নপুংসক আছে, যাহারা স্বর্গরাজ্যের নিমিত্তে আপনাদিগকে নপুংসক করিয়াছে। যে গ্রহণ করিতে পারে, সে গ্রহণ করুক।'

(মথি লিখিত সুসমাচার ১৯; ১০, ১১,১২)

১

বসন্তের প্রথম দিক। প্রায় দু'দিন হল ট্রেনে চেপেছি। কাছাকাছি জায়গার যাত্রীদের কামরায় আসা যাওয়ার বিরাম নেই, কিন্তু আমার মতো আরো তিনজন ট্রেন ছাড়ার পর থেকে চলেছে। মাঝবয়সী, দেখতে ভালো নয় স্ত্রীলোক একজন, আধা-পুরুষালি কোট ও টুপি পরিহিতা, সিগারেট খেয়ে চলেছে, মুখটা ক্লিষ্ট; আর একজন তার পরিচিত, বছর চল্লিশেকের বকুনতুড়ে মানুষ। তার বাক্স পেঁটরা নতুন, গোছালো; তৃতীয় ভদ্রলোকটি নিজেকে তফাতে রাখছেন; লম্বায় মাঝারি গোছের, নড়নচড়ন ছটফটে, বুড়ো নন বটে কিন্তু কোঁকড়ানো চুলে অকালে পাক ধরেছে; চোখদুটো অস্বাভাবিক চকচকে, খালি এ জিনিসে ও জিনিসে অস্থির তাদের দৃষ্টিপাত। মাথায় আস্ত্রাখান টুপি, পরনে আস্ত্রাখান-কলারওয়ালা পুরনো কোট, দেখে বোঝা যায় সৌখীন দর্জির হাতে তৈরী। কোটের বোতাম খুললে রুশী জ্যাকেট ও গলায় সুচীর কাজ করা রুশী সার্টের আভাস। ভদ্রলোকটির একটি অদ্ভুত ব্যাপার আছে: থেকে থেকে তিনি উদ্ভট আওয়াজ করছিলেন, গলা খাঁকারি দেবার মতো কিম্বা হঠাৎ হেসে উঠে তক্ষুনি হাসি চেপে যাবার মতো।

যাত্রাকালে সর্বক্ষণ ভদ্রলোকটি অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা বা পরিচয় এড়িয়ে চলেছেন। কেউ কথা বললে উত্তর দিচ্ছিলেন সংক্ষিপ্ত, রূঢ়ভাবে; বই পড়ে, জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, সিগারেট খেয়ে কিম্বা পুরনো ঝোলায় খাবার হাতড়ে চা বা টুকিটাকি কিছু খেয়ে তাঁর সময় কাটছিল।

একা থাকতে তাঁর বেজায় খারাপ লাগছে ভেবে কয়েকবার তাঁর সঙ্গে আলাপের চেষ্টা করলাম, কিন্তু যতবার চোখাচোখি হল (সামনা সামনি বসেছিলাম বলে সেটা বারবার না হয়ে উপায় নেই) তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হয় একটা বই তুলে নিলেন, নয় জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলেন।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার মুখে বড়ো একটা স্টেশনে গাড়িটা অনেকক্ষণ থামাতে স্নায়ুবিকল ভদ্রলোকটি গরম জলের খোঁজে বাইরে গেলেন, তারপর চা বানালেন। গোছানো বাক্স পেঁটরাওয়ালা লোকটি (পরে জেনেছিলাম উকিল) ও তার বান্ধবী, সিগারেট খাওয়া, আধা-পুরুষালি কোট-পরা সেই স্ত্রীলোকটি চা খেতে গেল স্টেশনের রেস্তরাঁয়।

এরা দুজন বাইরে থাকার সময়ে কামরায় কয়েকটি নতুন যাত্রী এল; তাদের একজন দীর্ঘাকৃতি, দাড়ি গোঁফ কামানো, লোলচর্ম বৃদ্ধ, দেখে মনে হয় ব্যবসাদার,

পরনে ফার দেওয়া কোট আর মাথায় প্রকাণ্ড কানা-লাগানো কাপড়ের টুপি। উকিল ও স্ত্রীলোকটির সামনের সীটে বসে কালবিলম্ব না করে সে একটি যুবকের সঙ্গে আলাপ শুরু করল, যুবকটিও এই স্টেশনেই কামরায় উঠেছে; তার চেহারাটা দোকানের কর্মচারীর মতো।

কোণাকুণি বসে আমি, ট্রেনটা দাঁড়িয়ে, যাত্রীরা সামনে দিয়ে যাতায়াত না করলে ওদের কথাবার্তার টুকরো কানে আসছে। ব্যবসাদারটি প্রথমেই জানিয়ে দিল, সে যাচ্ছে পরের স্টেশনে তার দেশের বাড়িতে; তারপর যেমন হয়ে থাকে, কথাবার্তা শুরু হল ব্যবসা আর জিনিসপত্রের দাম নিয়ে, তা থেকে যথারীতি এল মস্কোর বাজার নিয়ে মন্তব্য, তারপর উঠল নিঝনি নভগোরোদ মেলার কথা। মেলায় দুজনের চেনা একটি ধনী ব্যবসায়ীর বেলেল্লাপনার বর্ণনা শুরু করল দোকান-কর্মচারী, কিন্তু বৃদ্ধ তাকে বাধা দিয়ে কুনাভিনোতে বেলেল্লাপনার কথা বলতে লাগল, তাতে সে নিজে যোগ দিয়েছিল। বেলেল্লাপনায় ভাগ নেওয়ার দরুণ বোঝা গেল বেশ আত্মপ্রসাদ তার, মুখে আহ্লাদের একটা ভাব এনে নিজে এবং সেই পরিচিত ব্যক্তিটি মত্তাবস্থায় কী করেছিল বলল, ব্যাপারটা এমন যে ফিসফিস করে বলতে হয়; দোকান-কর্মচারীটির হো-

হো হাসিতে সমস্ত কামরা ভরে গেল, দুটো হলদে দাঁত বিকশিত করে বৃদ্ধটিও হাসল।

কৌতূহল উদ্রেক করার মতো কিছু শুনব না ভেবে আমি উঠে দাঁড়ালাম, ইচ্ছেটা ট্রেন ছাড়া না পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে বেড়িয়ে আসি। দরজায় দেখা হল উকিল ও স্ত্রীলোকটির সঙ্গে, হাঁটতে হাঁটতেই দুজনের মধ্যে জোর কথাবার্তা চলেছে কী একটা নিয়ে।

'সময় পাবেন না,' মিশুক উকিলটি আমাকে জানাল, 'এক্ষুনি দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়বে।'

আর সত্যি, কামরার শেষ পর্যন্ত যেতে না যেতে ঘণ্টা পড়ল। ফিরে এসে দেখলাম উকিল ও স্ত্রীলোকটির মধ্যে আগেকার মতো সমান উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা চলেছে। মুখোমুখি চুপ করে বসে বুড়ো সওদাগরটি কড়া চোখে সামনে তাকিয়ে আছে, মাঝে মাঝে অপ্রসন্নভাবে দুটো দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নিচ্ছে।

ওদের পেরিয়ে যাচ্ছি, শুনলাম উকিলটি একটু হেসে বলছে, 'আর তাই মেয়েটি স্বামীকে সোজাসুজি জানিয়ে দিল তার সঙ্গে আর ঘর করতে পারবে না, ঘর করতে চায়ও না, কেননা...'

আরো কীসব বলছিল, তা শুনতে পেলাম না। অন্যান্য যাত্রীরা এল আমার পর, এল কণ্ডাক্টর, তারপর একটি মিস্ত্রী দৌড়িয়ে আমাকে পেরিয়ে গেল, আর

কিছুক্ষণ এত হৈচৈ গোলমাল চলল যে কথাবার্তা কানে এল না।

সবকিছু একটু শান্ত হয়ে আসার পর আবার কানে এল উকিলটির কণ্ঠস্বর, বিশেষ একটি কেস থেকে শুরু হয়েছে সাধারণ অবস্থা নিয়ে আলোচনা।

উকিল বলছিল, ইউরোপের জনমত এখন বিবাহ বিচ্ছেদের প্রশ্ন নিয়ে ভাবিত, আর বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা রাশিয়ায় ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আর কেউ কথা বলছে না লক্ষ্য করে সে বক্তৃতা থামিয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকাল।

প্রসন্নভাবে হেসে বলল, 'আগেকার কালে এমনটি ছিল না, তাই না?'

বৃদ্ধ উত্তর দিতে যাবে এমন সময়ে ট্রেন ছেড়ে দিল, বৃদ্ধ টুপি খুলে ক্রুশচিহ্ন করে বিড়বিড় করে প্রার্থনা শুরু করল। ভদ্রভাবে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে উকিল অপেক্ষা করে রইল। প্রার্থনা এবং তিন বার ক্রুশচিহ্ন শেষ করে টুপিটা বেশ সোজা করে চেপে মাথায় দিয়ে নিজের সীটে গুছিয়ে বসল বৃদ্ধ, তারপর মুখ খুলল।

'এ ধরনের ব্যাপার আগেও হত বাপু, কিন্তু কম। এখন আর না হয়ে উপায় নেই। লোকেরা আজকাল হাতিঘোড়া অনেক শিখেছে।'

গতিবেগ ক্রমশ বাড়ায় লাইনের জয়েণ্টগুলোয় ট্রেনের খটখট শব্দ আমার শোনার ব্যাঘাত ঘটাল, বিষয়টিতে আমার আগ্রহ বলে বক্তাদের কাছের একটি জায়গায় সরে বসলাম। মনে হল আমার পাশের সেই চকচকে চোখ, অস্থির ভদ্রলোকটিরও আগ্রহের উদ্রেক হয়েছে, সীট না ছেড়ে শোনার জন্য তিনি কান পেতে রইলেন।

'কিন্তু লেখাপড়া শেখাটা খারাপ কিসে?' ক্ষীণ হাসি হেসে স্ত্রীলোকটি বলল। 'আগেকার দিনে বর কনে কেউ কাউকে এমনকি চোখে না দেখে বিয়ে করে ফেলত, সেটা কি ভালো মনে করেন?' স্ত্রীলোকটি বলে চলল, অনেক মহিলার যেমন অভ্যাস, অন্য লোকে যা বলেছে তার জবাব না দিয়ে, তারা কী বলবে ভেবে নিয়ে তার জবাবে।

'ওরা যাকে পেত বিয়ে করে বসত, দুজনে দুজনকে ভালোবাসে কিনা, কখনো ভালোবাসা হবে কিনা, কিছু না জেনে, আর বাকি জীবনটা কাটত যন্ত্রণায়। সেটা কি আরো ভালো মনে করেন?' স্ত্রীলোকটির আবেদন বোঝা গেল বুড়োর কাছে যতটা নয়, ততটা আমার ও উকিলটির কাছে, যদিও কথাবার্তা চলেছে বুড়োর সঙ্গে।

'লোকেরা আজকাল হাতিঘোড়া অনেক কিছু

শিখছে,' অবজ্ঞাভরে স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিয়ে, তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আবার বলল বৃদ্ধ।

ক্ষীণ হেসে উকিল জিজ্ঞেস করল, 'শিক্ষা আর দাম্পত্যজীবনে সামিল — এর মধ্যে কী সম্পর্ক আপনি দেখতে পান, জানতে পারি কি?'

ব্যবসাদার কথা বলতে যাচ্ছে, বাধা দিয়ে স্ত্রীলোকটি বলল: 'না, না, সে সব দিন আর কখনো ফিরে আসবে না।'

'দাঁড়ান, উনি কী ভাবেন বলতে দিন,' উকিলটি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল।

'শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের বোকামি আসে,' বৃদ্ধ জানাল চূড়ান্তভাবে।

'যাদের মধ্যে ভালোবাসা নেই তাদের ওরা বিয়ে দিয়ে দেয়, তারপর যখন দেখে যে মনের মিল নেই তখন অবাক হয়ে যায়,' তাড়াতাড়ি বলল স্ত্রীলোকটি, বলার সময়ে তাকাল আমার ও উকিলটির দিকে, এমনকি দোকান-কর্মচারীটির দিকে, সে তখন উঠে দাঁড়িয়ে নিজের সীটের পিঠে কনুইয়ে ভর দিয়ে হাসি মুখে শুনছে। 'জন্তু জানোয়ারদের শুধু মালিকের ইচ্ছে মতো জুড়ে দেওয়া যায়; মানুষের নিজের নিজের রুচি আর পছন্দ তো আছে,' সে বলল, বোঝা গেল তার ইচ্ছেটা বৃদ্ধকে ঠোকা দেওয়া।

'তুমি যা বলছ সেটা ঠিক নয় গো ঠাকরুণ,' বৃদ্ধ বলল। 'জন্তু জানোয়াররা বুনো; আর মানুষের যে আইনকানুন আছে।'

'যাকে ভালোবাসি না তার সঙ্গে কী করে থাকা যায়?' স্ত্রীলোকটি বলল। অত্যন্ত অভিনব মতামত এগুলো তার কাছে, আওড়াবার জন্য তাই অত্যন্ত ব্যস্ত।

'আগে ওসব বাছবিচার ছিল না,' ভারিক্কিচালে বলল বৃদ্ধ, 'এসব হচ্ছে হালফ্যাশনের কথা। মেয়েরা এখন বলে, "তবে তোমাকে ছেড়ে চললাম।" এমনকি চাষী ঘরেও নতুন কায়দাটা ঢুকেছে। বলে, "এই নাও তোমার সার্ট আর প্যাণ্ট; আমি চললাম ভানিয়ার সঙ্গে — ওর চুল আরো কোঁকড়া।" ব্যস, বোঝাও এখন! মেয়েমানুষের মনে ভয় থাকা সবচেয়ে দরকার।'

উকিলটির দিকে, তারপর স্ত্রীলোকটি ও আমার দিকে তাকাল দোকান-কর্মচারীটি; মনে হল হাসি চেপে রেখেছে, সওদাগরের বক্তব্যটি লোকে কী করে নেয় তা জেনে, হয় তার অনুমোদনে নয় তা নিয়ে হাসাহাসি করার জন্য সে তৈয়ার।

'কীসের ভয়?' জিজ্ঞেস করল স্ত্রীলোকটি।

'কীসের আবার? স্বামীকে ডরানো — আবার কী।'

গলায় অল্প বিদ্বেষ এনে স্ত্রীলোকটি বলল, 'সে সব দিন বাপু আর নেই।'

'না, ঠাকরুণ, সে দিন কখনো যেতে পারে না। বেটাছেলের পাঁজরের হাড় দিয়ে ইভের, মেয়েমানুষের সৃষ্টি, আর চিরকালই তারা তাই থাকবে,' এমন কঠিন স্বরে, এমন বিজয়ীর মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বৃদ্ধ বলল যে দোকান-কর্মচারীটি তক্ষুনি ধরে নিল যে বৃদ্ধেরই জিৎ হয়েছে, বেশ জোরে হেসে উঠল সে।

'শুধু বেটাছেলেরা এ রকমটা ভাবে,' হার না মেনে স্ত্রীলোকটি বলল আমাদের দিকে চেয়ে। 'আপনারা নিজেদের স্বাধীন করে, মেয়েদের বন্দী করে রাখতে চান। যথেচ্ছা করার আপনারা অধিকার নিজেদের দেন।'

'অধিকার কেউ দেয় না, শুধু বেটাছেলে থেকে সংসার গুষ্ঠি বাড়ে না, মেয়েরা কিন্তু ঠুনকো পাত্তর,' সমান ভারিক্কি গলায় বৃদ্ধ বলে চলল।

বলার ধরনটা এমন ভারিক্কি যে মনে হল কথাটা শ্রোতারা মেনে নিয়েছে; স্ত্রীলোকটিরও বোধ হল তার পরাজয় ঘটেছে, তবু হার সে মানল না।

'কিন্তু এটা তো আপনি স্বীকার না করে পারেন না যে মেয়েরাও মানুষ, বেটাছেলের মতো তাদেরো মন

বলে একটা জিনিস আছে। স্বামীকে না ভালোবাসলে তারা কী করতে পারে?'

'স্বামীকে ভালোবাসে না?' ভয়ংকর স্বরে পুনরুক্তি করল বৃদ্ধ; তার ভুরু আর ঠোঁট কুঞ্চিত হল। 'স্বামীকে ভালোবাসতেই হবে!'

অপ্রত্যাশিত এই যুক্তিতে বিশেষ খুশি হয়ে দোকান-কর্মচারী বাহবাসূচক ধ্বনি করল।

'না, ভালোবাসবে না,' বলল স্ত্রীলোকটি। 'আর ভালো না বাসলে জোর করে ভালোবাসানো উচিত নয়।'

'আর স্ত্রী যদি স্বামীকে ঠকায়, তাহলে?' জিজ্ঞেস করল উকিলটি।

'সেটা চলবে না,' বৃদ্ধ বলল। 'ও দিকে হুঁশ রাখা দরকার।'

'কিন্তু যদি তেমনটা ঘটে, তাহলে? ওরকম তো ঘটে।'

'কারো ক্ষেত্রে ঘটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে নয়,' বৃদ্ধ বলল।

কোনো কথা বলল না কেউ। দোকান-কর্মচারী নড়েচড়ে এগিয়ে এল, আলোচনা থেকে বাদ যাতে না পড়ে, হেসে বলতে শুরু করল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের একটি ছেলেকে নিয়ে কেলেঙ্কারি হয়। কার দোষে বলা খুব শক্ত। এই ছেলের বৌটা দেখা গেল ছেনাল, নষ্টামী শুরু করে দিল। বিচার বিবেচনা ছিল ছেলেটির। প্রথমে খাজাঞ্চির সঙ্গে মেয়েটার লটঘট হয়। ছেলেটি ভালো কথায় বোঝাবার চেষ্টা করল। কোনো ফয়দা হল না। মেয়েটা ভয়ানক বজ্জাত, স্বামীর টাকা হাতাতে শুরু করল। তখন তাকে পিট্টি দিল ছেলেটি। ফলটা আরো খারাপ দাঁড়াল। মেয়েটা কারবার চালাল একটা বিধর্মীর সঙ্গে, বলছি বলে কিছু মনে করবেন না, মানে একটা ইহুদীর সঙ্গে। স্বামী আর কী করতে পারে? ছেড়ে দিল মেয়েটাকে। এখনো সে আইবুড়োর মত থাকে, আর মেয়েটা এখন রাস্তার মাল।'

'ছোঁড়াটা গাধা,' বৃদ্ধ বলল। 'প্রথম থেকে যদি লাই না দিত, উচিতমতন পিট্টি দিত তাহলে আজো ছুঁড়িটা টিকে থাকত কোন সন্দেহ নেই। প্রথম থেকে ওদের যা খুশি করতে দেওয়া অন্যায়। মাঠে ঘোড়া আর ঘরে জরুকে বিশ্বাস নেই।'

ঠিক সে সময়ে পরের স্টেশনের টিকিট নিতে কণ্ডাক্টর এল। বৃদ্ধ নিজের টিকিট দিল তাকে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, একেবারে গোড়া থেকে মেয়েদের সামলে রাখা দরকার, নইলে সবকিছু ফতে।'

'আর বিবাহিত লোকেরা কুনাভিনোর মেলায় যে ফুর্তি করেছিল, যার গল্প এই আপনি নিজে করলেন, সেটা কী?' না বলে আমি পারলাম না।

'ওটা একেবারে আলাদা ব্যাপার,' বলল ব্যবসাদার, তারপর যেন মৌনীবাবা হয়ে গেল।

ট্রেনের হুইশ্‌ল্‌ পড়াতে বৃদ্ধ উঠে সীটের নিচ থেকে নিজের ঝোলা টেনে বের করে গায়ে ওভারকোটটা জড়িয়ে টুপিটা তুলে বেরিয়ে গেল।

২

বৃদ্ধ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন একসঙ্গে কথা বলে উঠল।

'সেকেলে লোক,' বলল দোকান-কর্মচারী।

'একেবারে সাক্ষাৎ মনু! মেয়েছেলে আর বিয়ের সম্বন্ধে বর্বর যত সব ধারণা!' বলল স্ত্রীলোকটি।

'হুঁ, বিয়ের ব্যাপারে আমরা ইউরোপীয় দৃষ্টি-ভঙ্গির অনেক পেছনে,' বলল উকিলটি।

'আসল কথাটা এরা বুঝতে পারে না — ভালোবাসা না থাকলে বিয়ে বিয়ে নয়, বিয়ে পূত হয় একমাত্র ভালোবাসার জোরে, ভালোবাসায় পূত বিয়ে হল সত্যিকারের বিয়ে,' স্ত্রীলোকটি বলল।

শুনতে শুনতে হাসল কর্মচারীটি, ভবিষ্যতে কাজে লাগাবার জন্য বুদ্ধিমন্ত আলোচনার যতটা পারে মনে রাখার চেষ্টা তার।

স্ত্রীলোকটির বক্তব্যের মাঝখানে আমার পেছনে ভাঙা হাসি বা কান্নার মতো কী একটা শুনলাম; ফিরে তাকাতে চোখে পড়ল পাশের লোকটিকে, জ্বলজ্বলে চোখ, পাকাচুল, নিঃসঙ্গ সেই ভদ্রলোকটিকে। আমাদের আলোচনায় আগ্রহান্বিত হয়ে কথাবার্তার সময়ে কখন যে তিনি কাছে সরে এসেছেন লক্ষ্য করি নি। সীটের পিঠে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, মনে হল অত্যন্ত উত্তেজিত। মুখটা লাল, গালের মাংসপেশী কাঁপছে।

'সে ভালোবাসাটা — যেটা বিয়েকে পূত করে — সেই ভালোবাসা জিনিসটা কী?' তুতলিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

তাঁকে উত্তেজিত দেখে স্ত্রীলোকটি কোমলভাবে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করল।

'সত্যিকার ভালোবাসা... পুরুষ ও নারীর মধ্যে সে ভালোবাসা থাকলে বিয়ে সম্ভব,' স্ত্রীলোকটি বলল।

'বেশ, কিন্তু সত্যিকার ভালোবাসাটা কী, বুঝব কী করে?' সঙ্কোচভরে জ্বলজ্বলে চোখ ভদ্রলোকটি বললেন, মুখে তাঁর বিব্রত হাসি।

'সবাই জানে ভালোবাসাটা কী,' বলল স্ত্রীলোকটি, বোঝা গেল তাঁর সঙ্গে আলোচনায় দাঁড়ি টানতে চায় সে।

'আমি কিন্তু জানি না,' ভদ্রলোক বললেন। 'আপনার ধারণাটা স্পষ্ট করে বলা দরকার...'

'সেটা তো খুব সহজ,' স্ত্রীলোকটি জবাব দিল, কিন্তু থেমে একবার ভেবে নিল। 'ভালোবাসা? সবাইকে ছেড়ে কেবল একজনের ওপর টান হওয়াটা হল ভালোবাসা,' বলল সে।

'টানটা কতদিনের জন্যে? এক মাস? দু'দিন? আধ ঘণ্টা?' হেসে পাকাচুল ভদ্রলোকটি জিজ্ঞেস করলেন।

'না, দাঁড়ান, আপনি হয়ত সম্পূর্ণ অন্য কিছু ভাবছেন।'

'আজ্ঞে না, আমি একই কথা ভাবছি।'

'ওঁরা বলছেন,' স্ত্রীলোকটির দিকে দেখিয়ে উকিলটি মাঝখান থেকে বলল, 'বিয়ে হওয়া উচিত প্রথমত, অনুরাগ থেকে — প্রেম বলতে পারেন, ইচ্ছে হলে — আর সেটা থাকলে তখনি শুধু বিয়েকে বলা যায়... ইয়ে... পবিত্র আর কি। দ্বিতীয়ত — পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগের (আমরা যাকে প্রেম বলি) ভিত্তিতে বিয়ে না হলে, বিয়ের কোনো নৈতিক-

বাধ্যবাধকতা থাকে না। আপনার কথাটা ঠিক বুঝেছি তো?' স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরে উকিল জিজ্ঞেস করল।

মাথা নেড়ে সায় দিল সে। হ্যাঁ, তার মনের কথা ঠিক বলেছে।

'আর তাছাড়া...' উকিলটি বলল, কিন্তু কথা শেষ করতে দিলেন না ভদ্রলোক, তাঁর চোখ এখন অঙ্গারের মতো দীপ্ত, উত্তেজনা এত চরমে উঠেছে যে নিজেকে সামলাতে তিনি পারলেন না।

'আমি ঠিক সে কথাটাই বলছি — সবাইকে ছেড়ে কোন বিশেষ নারী বা পুরুষের প্রতি আকর্ষণের কথা। কিন্তু আমি শুধু জিজ্ঞেস করি — কতদিনের জন্য?'

'কত দিন? অনেক দিন, মাঝে মাঝে সারা জীবন,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল স্ত্রীলোকটি।

'নাটকনভেলে ওটা ঘটে, জীবনে কখনো নয়। অন্যদের ছেড়ে এক জনের ওপর টান জীবনে কয়েক বছর টেকে কদাচিৎ, বরং তার আয়ু মাস কয়েক, মাঝে মাঝে মাত্র কয়েক সপ্তাহ, কয়েকদিন বা কয়েক ঘণ্টা মাত্র,' ভদ্রলোক বললেন; স্পষ্টত তিনি জানেন যে তাঁর মতামতে সবাই বিস্মিত, আর বিস্মিত হবার জন্য তিনি খুশি।

'কী বলছেন আপনি! মোটেই সে রকম নয়। শুনুন —' এক কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালাম আমরা তিনজন। দোকান-কর্মচারীটি পর্যন্ত আপত্তিসূচক কী ধ্বনি করল।

আমাদের সবায়ের গলা ছাপিয়ে উচ্চকণ্ঠে পক্ককেশ ভদ্রলোক বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার জানা আছে। যেটার অস্তিত্ব আছে বলে আপনারা কল্পনা করেন তাই নিয়ে কথা বলছেন; আর আমি বলছি বাস্তবের কথা। সুন্দরী দেখলেই, আপনারা যেটাকে ভালোবাসা বলেন সব পুরুষেরই সেরকম অনুভূতি হয়।'

'কিন্তু আপনি যে বড়ো ভয়ংকর কথা বলছেন! লোকেদের মধ্যে ভালোবাসা বলে একটা জিনিস তো আছে, সেটার আয়ু মাসখানেক বা বছরখানেক নয়, সারা জীবন,' বলল স্ত্রীলোকটি।

'না, না, সে রকম কিছু নেই! কোনো মেয়েকে একটি ছেলে বরাবর পছন্দ করে গেল, কথাটা সম্ভব বলে যদি বা মেনে নেওয়া যায়, তার চেয়ে বেশী সম্ভব যে অন্য কারুর ওপর মেয়েটির টান হল। আসল ব্যাপারটা এই, আর বরাবর এই হয়ে এসেছে,' সিগারেট বের করে ধরিয়ে ভদ্রলোক বললেন।

'কিন্তু দুজনের দুজনকে পছন্দ করে যাওয়াও সম্ভব,' উকিল বলল।

'না, সম্ভব নয়,' প্রত্যুত্তরে ভদ্রলোক বললেন। 'একটা গোটা গাড়ি মটর বোঝাই করা হচ্ছে, তার মধ্যে আগে থেকে বাছাই-করা দুটো মটর দানার ঠিক পাশাপাশি পড়াটা যেমন সম্ভব নয়। তাছাড়া শুধু সম্ভাব্যের কথাই নয়, অতি তৃপ্তিতে অরুচি ধরার ব্যাপারটাও আছে। একজন কাউকে — ছেলে হোক, মেয়ে হোক — জীবনভর ভালোবাসা — তার চেয়ে বলুন না কেন একটা মোমবাতি আপনার জীবনভর আলো জুগিয়ে যাবে।' সিগারেটে জোরে জোরে টান দিয়ে বললেন ভদ্রলোক।

'কিন্তু আপনি শুধু শরীব-সর্বস্ব প্রেমের কথা বলছেন। ভাবের সাযুজ্য, আত্মার আত্মীয়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত ভালোবাসার কথা আপনি মানেন না?' স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞেস করল।

'আত্মার আত্মীয়তা! ভাবের সাযুজ্য!' কথাগুলোর রেশ টানলেন ভদ্রলোক, তাঁর সেই আওয়াজটা আবার করলেন। 'তাহলে একসঙ্গে শোবার কোনো মানে হয় না (স্থূলতার জন্য মাপ করবেন)। ভাবের সাযুজ্যের পরিণাম একত্রে শয়ন,' অস্থির হেসে ভদ্রলোক বললেন।

'দাঁড়ান,' উকিলটি বলল। 'আপনার প্রতিপাদ্য তথ্যের সঙ্গে মেলে না। চোখে তো দেখি দাম্পত্য জীবন বলে একটা জিনিস আছে। মানুষেরা সবাই, অন্তত

বেশীর ভাগ মানুষ বিবাহিত জীবন কাটায়, অনেকেই আমরণ দাম্পত্য জীবন একনিষ্ঠভাবে চালিয়ে যায়।'

পক্ককেশ ভদ্রলোকটি আবার হাসলেন।

'প্রথমে আপনারা বললেন বিয়ের মূলে প্রেম, আর আমি যখন বলছি দৈহিক প্রেম ছাড়া আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ, তখন বিয়ের অস্তিত্ব থেকে আপনারা প্রেমের অস্তিত্ব প্রমাণ করছেন। আজকাল বিয়ে মানে প্রবঞ্চনা, আর কিছু নয়।'

'না, না শুনুন,' উকিল বলল, 'আমি শুধু বলেছি বিয়ে বলে একটা জিনিস আছে, বরাবর থেকেছে।'

'সত্যি। কিন্তু কীসের ভিত্তিতে? যাঁরা বিয়ের মধ্যে রহস্যময় কিছু একটা দেখেন, সে রহস্যের দরুন নানা কর্তব্য পালনের জন্য ঈশ্বরের কাছে নিজেদের দায়ী মনে করেন, তাঁদের মধ্যে বিয়ে বলে জিনিসটা আছে, বরাবর থেকেছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে নয়। আমরা বিয়ের মধ্যে মৈথুন ছাড়া আর কিছু না দেখে বিয়ে করি আর তাই দেখা দেয় প্রবঞ্চনা বা অত্যাচার। প্রবঞ্চনা সওয়া আরো সহজ। সতীপনার ভান করে স্বামী স্ত্রী লোক ঠকায়, আসলে কিন্তু তারা থাকে বহু-বিবাহের অবস্থায়। ব্যাপারটা ঘৃণ্য, কিন্তু তবু চলে। কিন্তু যখন, সাধারণত যেমনটা হয়, আজীবন একসঙ্গে থাকার দায়িত্বটা স্বামী স্ত্রী গায়ে পড়ে নেয়

আর মাস যেতে না যেতে পরস্পরকে ঘেন্না করে, চায় ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে কিন্তু তবু একসাথে থাকে, তখন দেখা দেয় সেই ভয়াবহ নরক যার ফলে লোকে মদ ধরে, আত্মহত্যা করে, পরস্পরকে হত্যা করে বা বিষিয়ে দেয়,' বলতে বলতে ভদ্রলোকের উত্তেজনা বেড়ে গেল, ক্রমশ দ্রুত গতিতে তিনি বলছিলেন, কথার মাঝে অন্য কেউ কিছু বলার সুযোগ পেল না। তিনি থামলে একটি অস্বস্তিকর স্তব্ধতার সূচনা হল।

'হ্যাঁ, বিবাহিত জীবনে সংকটের মুহূর্ত আসে সন্দেহ নেই,' উত্তেজিত, অশোভন আলোচনাটি থামিয়ে দেবার আশায় উকিলটি বলল।

'আমাকে চিনেছেন দেখছি,' মৃদুকণ্ঠে, যেন শান্ত হয়ে বললেন পক্বকেশ ভদ্রলোক।

'না, সে সৌভাগ্য আমার হয় নি।'

'সৌভাগ্য বিশেষ নয়। আমার নাম পজ্দ্নীশেভ, আমি সেই ব্যক্তি যাকে আপনার উল্লিখিত সংকট মুহূর্তের মুখোমুখি হতে হয়, যাতে নিজের স্ত্রীকে হত্যা করে,' আমাদের প্রত্যেকের দিকে দ্রুত দৃষ্টিক্ষেপ করে ভদ্রলোক বললেন।

বলার মতো কিছু পেলাম না, সবাই চুপ করে বসে রইলাম।

'কিছু এসে যায় না,' সেই বিচিত্র আওয়াজটি

আবার করে ভদ্রলোক বললেন। 'কিন্তু আপনাদের কাছে মাপ চাইছি। যাক গে... আপনাদের আর বিব্রত করব না।'

'আরে না, না, কী বলছেন...' বলল উকিলটি, "কী বলছেন" বলতে কী বলতে চাইল, তার নিজেরি জানা ছিল না।

তার কথায় কান না দিয়ে পজ্‌দ্‌নীশেভ তাড়াতাড়ি ঘুরে নিজের জায়গায় চলে গেলেন। উকিল ও স্ত্রীলোকটির মধ্যে ফিসফিসানি শুরু হল। পজ্‌দ্‌নীশেভের পাশে আমি চুপ করে বসে রইলাম, বলার কিছু খুঁজে পেলাম না। বড়ো বেশী অন্ধকার, পড়া চলবে না, তাই চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করলাম। এভাবে স্তব্ধতায় পরের স্টেশন পর্যন্ত সময়টা কাটল।

সেখানে অন্য কামরায় চলে গেল উকিল ও স্ত্রীলোকটি, কণ্ডাক্টরের সঙ্গে আগে থেকে এ নিয়ে তাদের কথাবার্তা হয়েছিল। দোকান-কর্মচারীটি বেঞ্চে লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চললেন পজ্‌দ্‌নীশেভ, আর খেলেন আগের স্টেশনে তৈরী-করা চা।

চোখ খুলে তাঁর দিকে তাকাতে, তিনি হঠাৎ বিরক্ত ও দৃঢ় স্বরে আমাকে সম্বোধন করলেন:

'আমি লোকটা কে জানার পর, আমার সঙ্গ খারাপ লাগছে বুঝি? যদি লাগে বলুন, আমি চলে যাই।'

'না, না, কী বলছেন।'

'তাহলে একটু চলবে নাকি? কিন্তু বড্ডো কড়া,' চা ঢেলে দিলেন আমাকে।

'কথা, শুধু কথা... আর সব মিথ্যে,' বললেন তিনি।

'কার কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'সেই একই কথা: ওদের ওই প্রেম, আর আসলে জিনিসটা কী! আপনার ঘুম পাচ্ছে?'

'একেবারেই নয়।'

'তাহলে, আপনি যদি চান, এই প্রেমের তাড়নায় আমার কী ঘটেছিল আপনাকে বলি।'

'যদি আপনার কষ্ট না হয়।'

'কিছু না বললেই কষ্ট হয়। চা-টা খান। খুব কড়া নাকি?'

চা-টা সত্যি বিয়ারের মতো, কিন্তু খেলাম এক গেলাস। ঠিক সে সময়ে আমাদের পেরিয়ে কণ্ডাক্টরটি গেল, তার যাবার পথে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে অপেক্ষা করলেন ভদ্রলোক, চলে গেলে নিজের কাহিনী শুরু করলেন।

৩

'বেশ, তাহলে আপনাকে বলি... আপনি সত্যি শুনতে চান তো?'

আবার বললাম শোনার খুব ইচ্ছে। কিছুক্ষণ থেমে হাত দিয়ে মুখ রগড়ে নিয়ে তিনি শুরু করলেন।

'যদি বলতেই হয়, তাহলে একেবারে গোড়ার থেকে বলতে হবে: বলতে হবে কেন বিয়ে করেছিলাম আর বিয়ের আগে আমি কেমন ধরনের লোক ছিলাম।

'বিয়ের আগে থাকতাম অন্য সবায়ের মতো, মানে আমাদের মহলের সবায়ের মতো। আমি জমিদার, বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ডিগ্রী আছে, অভিজাত-প্রধান হয়েছিলাম। বিয়ের আগে থাকতাম অন্য সবায়ের মতো, তার মানে উচ্ছৃঙ্খলতায় সময় কাটত, এ ধরনের জীবনযাপন যে যথোচিত সে বিষয়ে আমাদের শ্রেণীর সকলের মতো আমারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। নিজেকে বেশ লোক, পুরোপুরি নৈতিক লোক ভাবতাম। মেয়ে-পটানো লোক আমি ছিলাম না; কোনো বিকৃত রুচি আমার ছিল না, লাম্পট্যকেই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করে নিই নি, আমার বয়সের অনেকে যেটা করে। শুধু স্বাস্থ্যের খাতিরে, মর্যাদা বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে

কামচর্চা করতাম। বাচ্চা পয়দা করে বা আমার প্রতি বেশী আসক্ত হয়ে বোঝার মতো হতে পারে এমন মেয়েদের এড়িয়ে চলতাম। বাস্তবিক হয়ত বাচ্চা ও আসক্তি হয়েছিল কয়েক জনের, কিন্তু আমি এমন ভাব দেখাতাম যে ওসব কিছু হয় নি। এটাকে নীতিসম্মত শুধু মনে করতাম না, গর্ব বোধ করতাম এমন কি।'

থেমে তিনি তাঁর সেই বরাবরকার আওয়াজ করলেন, মনে হল নতুন কোন কথা মাথায় এলে আওয়াজ করাটা তাঁর অভ্যাস।

'অথচ এটাই হল সবচেয়ে নোংরা জিনিস,' উচ্চকণ্ঠে বললেন তিনি। 'ব্যভিচারটা শরীরঘটিত ব্যাপার নয়, শারীরিক কোনো কলুষিতায় ব্যভিচার বলে কিছু নেই; যে মেয়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে, তার বিষয়ে সমস্ত নৈতিক দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলাটাই হল ব্যভিচার, সত্যিকারের ব্যভিচার। আর এই নৈতিক দায়িত্বটা ঝেড়ে ফেলতে পেরেছি বলে বাহবা দিতাম নিজেকে। মনে আছে, নিশ্চয় আমাকে ভালোবেসেই একটি মেয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল আমার কাছে, তাকে টাকা দেওয়া হয়ে ওঠে নি বলে কী বিবেক যন্ত্রণা না ভোগ করি এক-বার। টাকাটা পাঠিয়ে দিয়ে তবে শান্তি পেলাম, টাকা

দেবার মানে তার বিষয়ে আমার আর কোন নৈতিক দায়িত্ব নেই। আমাকে সায় দেবার ভাব করে মাথা নাড়বেন না বলছি,' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'ওটা আমি অনেক ভালো বুঝি। আপনারা সবাই, আপনিও, সবাই আপনারা এক গোয়ালের গরু, অবশ্য আপনি একেবারে দলছাড়া মানুষ না হলে, সবচেয়ে সেরা হলেও, আমার আগে যা মতামত ছিল আপনারও তাই। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? মাপ করুন,' ভদ্রলোক বললেন। 'কিন্তু ব্যাপারটা ভয়াবহ, এত ভয়াবহ!'

'কী এত ভয়াবহ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'মেয়েদের নিয়ে, ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে আমাদের ভুলের অন্ত নেই, সেটা ভয়াবহ। না, মশায়, এ বিষয়ে শান্তভাবে কথাবার্তা চালাতে আমি পারি না, ভদ্রলোকটি যাকে "সংকটের মুহূর্ত" বলেছিলেন সেটা আমার জীবনে ঘটেছিল বলে নয়, সে মুহূর্তটি ঘটার পর থেকে আমার চোখ খুলে গিয়েছে, সম্পূর্ণ আলাদা আলোয় সবকিছু দেখেছি বলে। মুখোস খুলে গেছে সবকিছুর, মুখোস খুলে গেছে সবকিছুর!..'

সিগারেট ধরিয়ে, হাঁটুতে কনুই রেখে সামনে ঝুঁকে তিনি আবার শুরু করলেন।

অন্ধকারে ওঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না, রেল-কামরার খটখট ছাপিয়ে কানে আসছে ওঁর ব্যগ্র, প্রীতিকর কণ্ঠস্বর।

৪

‘হ্যাঁ, মশায়, কষ্ট পেয়েছি ভীষণ, আর তেমন কষ্ট পাবার পর শুধু, তারই কল্যাণে পাপের মূল কোথায় বুঝতে পারলাম, বুঝতে পারলাম কী রকমটা হওয়া উচিত, তাই উপলব্ধি করলাম বিদ্যমান যা কিছু তার বিভীষিকা।

‘কখন এবং কী করে সবকিছু শুরু হয়ে অবশেষে আমাকে নিয়ে গেল সেই সংকটের মুহূর্তে, এবার বলতে দিন। সূত্রপাত হয় আমার বয়স যখন ষোলোর মুখে। তখনো জিমনাসিয়ামে পড়ি, আর আমার দাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছরে। তখনো স্ত্রীলোকদের চিনি না, কিন্তু তা বলে নিষ্পাপ শিশু ছিলাম না, আমাদের শ্রেণীর দুর্ভাগ্য ছেলেমেয়ের যেমন, আমারো তাই অবস্থা। এর এক বছর আগেই ছেলেরা আমায় খারাপ করে দিয়েছিল। তখনি মেয়ে দেখে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে, বিশেষ কোন মেয়ে নয়, সাধারণত মেয়ে দেখে মনে হত ওরা মধুর লোভনীয় — মেয়েরা, মেয়েদের নগ্নতা

আমায় আর্ত করত। আমার নিঃসঙ্গতায় নিষ্পাপ ছিলাম না আমি। আমাদের ছেলেদের শতকরা নিরেনব্বই জনের যা যন্ত্রণা আমারো তাই। ভীষণ আতঙ্ক হত, সে কী দুর্ভোগ, প্রার্থনা করতাম, শেষ পর্যন্ত আমার পতন হল। কল্পনায় ও বাস্তবে আমি তখনি কলুষিত, কিন্তু তখনো শেষ ধাপে পা দিই নি। নিজেকে নষ্ট করছিলাম বটে, কিন্তু তখনো অন্য কোনো প্রাণীকে জড়াই নি। তারপর একদিন সন্ধ্যেবেলায় দাদার এক ছাত্র বন্ধু — ফুর্তিবাজ ছোকরা সে, ''বেড়ে ছেলে'' যাদের বলা হয়, যারা অন্যদের মদ ধরায়, তাস খেলতে শেখায়, আসলে একেবারে হারামজাদা যারা, তাদের একজন হল দাদার সেই বন্ধুটি — মদের পার্টির পর বলল "ওখানে" গেলে হয়। গেলাম আমরা। আমার দাদাও তখন পর্যন্ত নিষ্পাপ, তার পতন হল সে রাত্রে। পোনেরো বছরের ছেলে আমি, কলুষিত করলাম নিজেকে, কী করছি উপলব্ধি না করে একটি স্ত্রীলোককে কলুষিত করাতে সাহায্য করলাম। যা করছি তা অন্যায়, বড়োদের মুখে কখনো শুনি নি। সে কথা এখনো তাঁরা বলেন না। অবশ্য বাইবেলের দশটি আদেশবাণীতে জিনিসটাকে অন্যায় বলা হয়েছে, কিন্তু সে আদেশবাণীগুলি জানার আমাদের একমাত্র কারণ হল বাইবেল-পাঠের পরীক্ষায়

পাদ্রীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, তাও ব্যাকরণের কোনো একটা সূত্র জানার মতোও ওটা জানা তেমন জরুরী নয়।

'আর তাই বড়োদের, যাঁদের মতামত সমীহ করতাম, তাঁদের কারো কাছ থেকে শুনি নি যে জিনিসটা অন্যায়। বরং যাঁদের সমীহ করতাম, তাঁদের মুখে শুনেছি জিনিসটা ভালো। শুনেছিলাম ওটি করার পর আমার জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হবে। এ কথা শুনেছি, পড়েছি, বড়োদের মুখে শুনেছি যে জিনিসটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো; সঙ্গীরা বলেছে ওটা করার মধ্যে উপকার কিছু আছে, আছে বাহাদুরি। আর তাই মোটামুটি জিনিসটার মধ্যে ভালো ছাড়া আর কিছু দেখি নি। রোগের ভয়? প্রতিরোধ তো আগে থেকে করা হয়। সদাশয় সরকার সেদিকে নজর রেখেছেন। বেশ্যালয় তদারকের আয়োজন সরকার করেছেন, যাতে স্কুলের ছাত্ররা নির্বিঘ্নে নিজেদের লালসা চরিতার্থ করতে পারে। এর জন্য মাইনে দিয়ে ডাক্তার রাখা হয়েছে। আর এটাই তো সমীচীন। তাঁরা বলেন স্বাস্থ্যের পক্ষে লাম্পট্য ভালো, পরিষ্কার পরিপাটি-গোছের লাম্পট্যের ব্যবস্থা করেন তাঁরাই। ছেলেদের স্বাস্থ্যের জন্য মায়েদের এ নিয়ে মাথা ঘামাতেও আমি দেখেছি। বেশ্যালয়ে ছেলেদের পাঠায় স্বয়ং বিজ্ঞান।'

‘বিজ্ঞান আসছে কোত্থেকে?’ আমি বললাম।

‘ডাক্তাররা বিজ্ঞানী নয়? ওরা হল বিজ্ঞান আচার্য। কাজটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো ঘোষণা করে ছেলেদের পাপের পথে নিয়ে যায় কারা? ডাক্তাররা। আর তারপর সাঙ্ঘাতিক ভারিক্কি মুখে সিফিলিসের চিকিৎসা চালায়।’

‘কিন্তু সিফিলিসের চিকিৎসা করা চলবে না কেন?’

‘কেন না, সিফিলিস সারাবার জন্য যে উদ্যমটা করা হয়, তার শতাংশ লাম্পট্য দূর করার কাজে লাগালে সিফিলিসের অবসান ঘটত অনেক দিন। কিন্তু লাম্পট্য দূর করার জন্য নয়, প্রশ্রয় দেবার জন্য, নিরাপদ করার জন্য আমরা আমাদের উদ্যম ব্যয় করি। যাকগে, কথাটা তা নয়। কথাটা হল এই, শুধু আমাদের শ্রেণীর নয়, সব শ্রেণীর, এমনকি চাষী শ্রেণীর ছোকরাদের দশ জনের মধ্যে ন জনের মতো (আরো বেশী হতে পারে) আমার ক্ষেত্রেও এই সাঙ্ঘাতিক ব্যাপারটা ঘটল, যে আমি পাপ করলাম কোনো বিশেষ স্ত্রীলোকের রূপের স্বাভাবিক মোহে নয়। না, কোনো স্ত্রীলোক আমাকে পটায় নি। পাপ করলাম এই জন্য যে, আশেপাশের কয়েক জনের মতে সেটা আমার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সঙ্গত ও হিতকর নিয়ম আর অন্যদের চোখে সেটা যৌবনের স্বাভাবিক আমোদ-প্রমোদ, শুধু মার্জনীয়

নয়, একান্ত নির্দোষ। নিজে আমি সেটাকে পাপ বলেই বুঝি নি; জিনিসটা কিছুটা আনন্দের, কিছুটা বিশেষ একটি বয়সের তাগিদ মেটানো (তাই শুনেছিলাম), এই ভাবে শুরু করলাম সেটাকে চরিতার্থ করতে; লালসা চরিতার্থ করতে আরম্ভ করলাম সেই ভাবে, যে ভাবে ধূম ও মদ্যপান শুরু করেছিলাম। তবু আমার প্রথম পদস্খলনে করুণ, অসাধারণগোছের কী একটা ছিল। মনে আছে, সে সময়ে, ঘরের বাইরে তখনো আসি নি, এমন একটা বিষণ্নতা আচ্ছন্ন করেছিল, আমাকে মনে হয়েছিল কাঁদি, যে নিষ্পাপ অবস্থা খুইয়েছি, মেয়েদের সঙ্গে যে সম্পর্ক জীবনে আর কখনো হবে না, কাঁদি তাদের শোকে। হ্যাঁ, মেয়েদের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক বিদায় নিল চিরতরে। সে দিন থেকে মেয়েদের প্রতি মনোভাবে বিশুদ্ধি আর রইল না, থাকতে পারে না। যাকে বলে লম্পট তাই হয়ে দাঁড়ালাম। আর লম্পট হবার মানে মদ্যপ, ধূমপায়ী বা আফিমখোরের শারীরিক অবস্থায় উপনীত হওয়া। মদ্যপ, ধূমপায়ী বা আফিমখোর যেমন স্বাভাবিক লোক নয়, ঠিক তেমন হল সে যে শুধু সম্ভোগের জন্য কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে শুয়েছে; চিরতরে সে লোকের বারোটা বেজে গেছে, সে তখন লম্পট। আর মদ্যপ বা আফিমখোরকে তৎক্ষণাৎ চেহারা ও ভাবভঙ্গী

থেকে যেমন চেনা যায়, তেমন চেনা যায় লম্পটকে। লম্পট হয়ত আত্মসংযমের চেষ্টা করবে, লড়বে, কিন্তু স্ত্রীলোকের সঙ্গে শুদ্ধ স্বচ্ছ সহজ সম্পর্ক — ভাইয়ের মতো সম্পর্ক — তার আয়ত্তে আর কখনো আসবে না। কমবয়সী মেয়ের দিকে তাকানোর ভঙ্গী থেকে লম্পটকে তৎক্ষণাৎ চেনা যায়। আর আমি লম্পট হয়ে দাঁড়ালাম, এখনো তাই আছি, আর সে জন্য সর্বনাশ ঘটল আমার।'

৫

'হ্যাঁ, তাই। পরে ব্যাপারটা আরো গড়াতে থাকল, তার নানা দিকও চেয়ে দেখলাম। হে ঈশ্বর! আমার নোংরামির কথা ভাবতেই মন গভীর আতঙ্কে ভরে ওঠে! যার তথাকথিত নিষ্পাপভাব নিয়ে বন্ধুরা হাসাহাসি করত, সেই আমাকে মনে পড়ে। আর গিল্টি-করা সেই সব ধনীর দুলালরা! অফিসাররা, প্যারিসপন্থীরা! আর সেই সব ভদ্রলোক আর আমি, বছর তিরিশের লম্পট সব, স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে শত শত বিভিন্ন ও জঘন্য অপরাধে দোষী যারা, বছর তিরিশের লম্পট চূড়ামণি, আমরা সবাই ঢুকছি ড্রয়িংরুম ও বলরুমে — দাড়িগোঁফ-কামানো, চকচকে

গাল, ঘষামাজা শরীর, ধবধবে লিনেন, সেণ্টের গন্ধ, পরনে ফ্রককোট ও ইউনিফর্ম — পবিত্রতার প্রতিমূর্তি যেন — সুন্দর!

'ব্যাপারটা কেমন হওয়া উচিত, কিন্তু আসলে কী রকম, একবার ভেবে দেখুন। ধরুন, এ রকম একটি ভদ্রলোক আমার বোন বা মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন; আমার তো জানা, তিনি কী ভাবে জীবনযাপন করেন, উচিত তাঁর কাছে গিয়ে একপাশে ডেকে চুপিচুপি বলা, "শোনো হে, তুমি কী ভাবে থাকো জানি, জানি কোথায়, কার সঙ্গে রাত কাটাও। এখানে তোমার জায়গা নেই। এখানে নিষ্পাপ পবিত্র মেয়েরা আছে। চলে যাও এখান থেকে।" ব্যাপারটা হওয়া উচিত এ রকম। কিন্তু বাস্তবত যখন এ ধরনের কোনো ভদ্রলোক হাজির হয়ে আমার মেয়ে বা বোনের কোমর জড়িয়ে নাচতে শুরু করেন, তখন তিনি সঙ্গতিপন্ন বা প্রতিপত্তিবান ব্যক্তি হলে আমরা অত্যন্ত খুশি হই। রিগলবুচে রাত্রি যাপনের পরও হয়ত তিনি আমার কন্যাকে নেকনজরে দেখবেন। দূষিত হোন তিনি, রোগ থাকতে পারে, তাতে কিছু এসে যায় না। চিকিৎসা ব্যবস্থা চমৎকার আজকাল। উচ্চ সমাজের কয়েকটি মা-বাপ মেয়েদের সিফিলিস রুগীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছিলেন, আমি

জানি। উঃ, কী নোংরা! এ নোংরামি ও মিথ্যার মুখোস একদিন খুলে যাবে কিনা!'

মুখ দিয়ে সেই বিচিত্র আওয়াজ কয়েকবার করে ভদ্রলোক চা খেতে লাগলেন। বেজায় কড়া চা, মিশিয়ে পাতলা করার মতো জল ছিল না। দু গেলাস চা খাবার ফলাফলটা আমার ওপর বেশ হয়েছে বুঝতে পারলাম। তাঁর ওপরেও প্রতিক্রিয়া হয়েছে নিশ্চয়, কেননা তাঁর উত্তেজনা ক্রমশ বেড়ে গেল। কণ্ঠস্বর হল আরো ভাবমুখর, সুরেলা। খালি নড়াচড়া করছিলেন ভদ্রলোক, টুপিটা একবার খুলছেন, আবার পরছেন, আধা-অন্ধকারে মুখে আসছিল বিচিত্র ভাবান্তর।

'আর এই ভাবে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত কাটালাম; বিয়ে করে অত্যন্ত পবিত্র ও সাধু পারিবারিক জীবনে গুছিয়ে বসার সংকল্প কিন্তু এক মুহূর্ত পরিত্যাগ করি নি, আর সে উদ্দেশ্যে যোগ্য কোনো মেয়ের সন্ধানে থাকলাম,' ভদ্রলোক বলে চললেন। 'ব্যভিচারের পাঁকে গড়াগড়ি খাচ্ছিলাম বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি অকলুষিত মেয়ের খোঁজে ছিলাম, যে আমার স্ত্রী হবার যোগ্য। অনেককে প্রত্যাখ্যান করেছি, আমার পক্ষে যথেষ্ট অকলুষিত নয় বলে। অবশেষে দেখলাম একজনকে, মনে হল আমার যোগ্য মেয়ে। পেনজার একটি জমিদারের দুটি

মেয়ের একজন সে, জমিদারটি এককালে অত্যন্ত ধনী ছিলেন, কিন্তু তখন হীনাবস্থায় পড়েছিলেন।

'সারাদিন নৌকোয় কাটিয়ে রাত্তিরে চাঁদের আলোয় বাড়ি ফিরছি একদিন, মেয়েটির পাশে বসে উলের জার্সি-পরা তার সুঠাম গঠন ও কুঞ্চিত কেশগুচ্ছের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তারিফ করছি, হঠাৎ ঠিক করলাম এই হল আমার মনের মানুষ। সে সন্ধ্যায় মনে হয়েছিল মেয়েটি আমার সমস্ত ভাব ও অনুভূতি বুঝতে পারছে, আর আমার সেসব ভাব ও অনুভূতি অত্যন্ত উঁচু স্তরের। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা শুধু এই যে জার্সিটা আর কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ ওকে দারুণ মানিয়েছিল, আর সারা দিন ওর এত কাছে থাকার পর আরো কাছে পাবার ইচ্ছে হয়েছিল।

'সৌন্দর্য মানে শুভ, এ ভ্রান্তিটা কত পাকা হতে পারে সেটা বিস্ময়কর। সুন্দরী মেয়ে এক্কেবারে বাজে কথা বলতে পারে, কিন্তু শুনে মনে হবে বাজে কথা নয়, বুদ্ধিমতীর মতো কথা। মেয়েটি অত্যন্ত কুৎসিত কথা বলে, কুৎসিত কাজ করে, কিন্তু সেগুলো মনে হবে মধুর। আর যদি দৈবক্রমে বাজে কুৎসিত কথা না বলে বসে, অথচ সুন্দর দেখতে তাহলে তৎক্ষণাৎ দৃঢ় বিশ্বাস হয় মেয়েটি নৈতিক গুণের ও জ্ঞানের আকর।

'বাড়ি ফিরলাম দারুণ উচ্ছ্বাসে, কোনো সন্দেহ ছিল না যে, মেয়েটি নৈতিক গুণের পরাকাষ্ঠা, আর তাই আমার স্ত্রী হবার যোগ্য। পরের দিন তার পাণি প্রার্থনা করলাম।

'কিন্তু ব্যাপারটা কত গোলমেলে একবার ভেবে দেখুন! হাজারটি লোক বিয়ে করে তার মধ্যে (দুর্ভাগ্যক্রমে শুধু আমাদের শ্রেণীর নয়, সাধারণ লোকেদের ক্ষেত্রেও), অন্তত দশবার এরি মধ্যে বিয়ে করে নি, এমন একজনকে খুঁজে পাওয়া ভার, আর ডন-জুয়ানের মতো শতাধিক বা সহস্রাধিকবার বিয়ে করেছে, সে তো আছেই। (সত্যি বটে, শুনেছি এবং দেখেছি, নবীনদের মধ্যে এমন শুদ্ধ লোক আছেন, যারা জানেন ও অনুভব করেন যে বিয়েটা হল মহান, পবিত্র একটা ব্যাপার, তামাসার জিনিস নয়। ঈশ্বর তাঁদের আশীর্বাদ করুন! কিন্তু আমার কালে দশ হাজারের মধ্যে এমন লোক একটিও ছিল না।) আর এটা সবায়ের জানা, তবু না জানার ভান করে সবাই। নাটকনভেলে বিশদ করে লেখা হয় নায়ক-নায়িকার মনোভাবের কথা, ফুল আর পুকুরের পাশে তাঁরা আস্তে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু কোনো নবীনার প্রতি মনোগ্রাহী নায়কের মহান প্রেমের বর্ণনার সময় বলা হয় না কী ভাবে তিনি আগে সময় কাটিয়েছেন — বলা হয় না

বেশ্যালয়ের কথা, চাকরানী, রাঁধুনী আর পরস্ত্রী গমনের কথা। আর এ ধরনের অশোভন নভেল লেখা হলেও দেওয়া হয় না তাদের হাতে, এসব বিষয়ে যাদের সবচেয়ে বেশী জানা দরকার — অর্থাৎ কুমারীদের হাতে। প্রথম প্রথম নবীনাদের কাছে ভান করা হয় যে, ব্যভিচার বলে কিছু নেই, অথচ আমাদের সহরগুলোয়, এমনকি আমাদের গ্রামের অর্ধেক জীবনটাই কাটে ব্যভিচারে; পরে ভান করে করে এমন অভ্যেস হয়ে যায় যে, শেষে ইংরেজদের মতো লোকে নিজেরাই সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে বসে যে, অত্যন্ত উঁচু নৈতিক জগতের অত্যন্ত উচ্চু দরের নীতিবাগীশ তাঁরা। আর বেচারী মেয়েরা! সত্যি সত্যি তারা বিশ্বাস করে কথাটা। আমার দুর্ভাগা স্ত্রীও বিশ্বাস করত এটা। মনে আছে, যখন সে আমার বাগদত্তা, আমার ডায়েরীটা তাকে দেখিয়েছিলাম; ডায়েরী থেকে আমার অতীত জীবনের কিছুটা আভাস সে পেল, আমার সবচেয়ে শেষের ব্যাপারটার বিষয়ে জানল — আমি চেয়েছিলাম অন্তত এটির বিষয়ে সে জানুক। অন্য লোকের মুখে হয়ত শুনবে, নিজেই বলে দেওয়াটা দরকার ভেবেছিলাম। মনে আছে, ব্যাপারটা কী যখন জানল, বুঝল যখন, কী ভীষণ আতঙ্ক তার হয়েছিল, কী হতাশা আর উদ্‌ভ্রান্তি! সে মুহূর্তে আমার সঙ্গে

সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতে ও চায় বুঝলাম। হায়রে, কেন যে সেটা করল না!'

আবার সেই আওয়াজটি করলেন ভদ্রলোক, কথা থামিয়ে এক ঢোঁক চা খেলেন।

৬

'না, না, যা হয়েছিল সেটাই বরং ভালো, সেটাই ভালো,' উচ্চকণ্ঠে বললেন তিনি। 'উচিত শিক্ষা পেয়েছিলাম। যা হোক, এটা অপ্রাসঙ্গিক। আমার বক্তব্য হল, ঠকে কেবল হতভাগ্য কুমারীরাই। মায়েরা সবকিছু জানে, বিশেষ করে স্বামীদের কাছে থেকে যারা শিখেছে, তারা ভালোভাবে জানে। পুরুষের শুচিতায় বিশ্বাসের ভান তারা করে বটে, কিন্তু আচরণ তাদের একেবারে অন্য ধরনের। নিজেদের জন্য, নিজেদের মেয়েদের জন্য পুরুষ ধরার কী টোপ ফেলা উচিত, তাদের জানা।

'আমরা পুরুষেরা শুধু জানি না, জানতে চাই না বলে জানি না, মেয়েরা কিন্তু খুব ভালো করে জানে যে, তথাকথিত মহান কাব্যিক প্রেমের উৎস নৈতিক গুণ নয়, শারীরিক সান্নিধ্য, কেশবিন্যাস, ফ্রকের রঙ ও কাটছাট। বিশেষ একটি পুরুষকে বাগে আনতে চায় এমন কোনো পাকা ছেনালকে জিজ্ঞেস করে দেখুন কোন ঝুঁকিটা সে নেবে, পুরুষটির সামনে নিষ্ঠুর,

ছলনাময়ী, এমনকি অধঃপতিতা রূপে উদ্ঘাটিত হবে, না তার সামনে কুৎসিত, বেমানান পোষাকে আসবে? প্রথম ঝুঁকিটা নেবে, কোনো সন্দেহ নেই। তার জানা আছে, বাছাধন যে উচ্চ অনুভূতির কথা বলছে, সেটা স্রেফ মিছে কথা; তার চাই শুধু শরীর, সে জন্য তার সমস্ত পাপ সে ক্ষমা করবে, কিন্তু বিসদৃশ, বেখাপ্পা কুৎসিত পোষাকের মার্জনা কখনো মিলবে না। ছেনাল হাড়ে হাড়ে জানে এটা, কিন্তু নিষ্পাপ কুমারীরা সেটা বোঝে সহজাত বোধে, পশুরা যেমন করে বোঝে।

'আর সে জন্যই এ সব ন্যক্কারজনক জার্সির বাহার, পেছন-ফাঁপানো ফ্রক, খোলা কাঁধ আর হাত আর প্রায় নগ্ন বুক। মেয়েদের বিশেষ করে যারা পুরুষদের কাছে থেকে শিখেছে, তাদের ভালো করে জানা আছে যে, বড়ো বড়ো বিষয়ে আলাপ শুধু কথার কচকচি, আসলে পুরুষ যা চায়, সেটা হল শরীর, শরীরের প্রলোভন যা কিছু বাড়ায় সে সবকিছু। আর সেইটেই করা হয়। এই কদর্যতার যে অভ্যাস প্রায় স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে, তা ঝেড়ে ফেলে খোলা চোখে সমাজের উচ্চশ্রেণীর সত্যিকার জীবনটা দেখলে, তার নির্লজ্জতা ধরা পড়ে, বুঝি এটা একটা অন্তহীন বেশ্যালয়। কথাটা মানছেন না আপনি? আচ্ছা, আপনার কাছে প্রমাণ করে দেব,' আমাকে বাধা দিয়ে তিনি বললেন।

'আপনি বলছেন বেশ্যালয়ের মেয়েদের থেকে আলাদা উদ্দেশ্য আমাদের সমাজের মেয়েদের আছে, কিন্তু আমি বলছি তা নয়, আমি প্রমাণ করে দেব। জীবনে আলাদা উদ্দেশ্য থাকলে, জীবনের মর্মবস্তু স্বতন্ত্র হলে, তাদের জীবনের বাহ্যিক রূপও আলাদা হতে বাধ্য। কিন্তু যে সব দুর্ভাগা মেয়েদের আমরা ঘৃণার চোখে দেখি, তাদের দিকে চেয়ে দেখুন, তারপর দেখুন সমাজের সর্বোচ্চ স্তরের মহিলাদের: সেই এক প্রসাধন, সেই এক কায়দা, সেই সেণ্ট, সেই নগ্ন হাত, কাঁধ আর বুক, সেই পিছন-ফাঁপানো ফ্রক, হীরে জহরত আর দামী চকচকে গয়নাগাটির ওপর সেই লোভ, সেই এক আমোদপ্রমোদ, নাচ আর গানবাজনা। পুরুষ পটাবার পদ্ধতি দু শ্রেণীর মধ্যে সমান, কোনো হেরফের নেই। চুলচেরা পার্থক্য করতে হলে শুধু বলা যায়, অল্পদিনের বেশ্যাদের আমরা ঘৃণা করি, দীর্ঘদিনের বেশ্যাদের সম্মান দেখাই।'

৭

'আর তাই জার্সি, কোঁকড়ানো চুল আর পেছন-ফাঁপানো ফ্রকের ফাঁদে ধরা দিলাম। আমাকে ধরাটা সহজ ছিল, কেননা আমি যে বিশেষ পারিপার্শ্বিকে মানুষ হয়েছিলাম সেটা শশা ফলাবার কাঁচের ঘরের

মতো, ছেলে-ছোকরার প্রেম-প্রবণতা বাড়ায় সেটা। আমরা খাই গুচ্ছির শরীর গরম-করা খাদ্য আর পানীয়, তার সঙ্গে সঙ্গে চলে চরম শারীরিক আলস্য, তাতে দেয় কেবল লালসার নিয়মিত প্ররোচনা। কথাটা সত্যি, শুনে অবাক হোন বা না হোন। আমি নিজে একেবারে শেষের দিকের আগে পর্যন্ত এটা বুঝি নি। কিন্তু এখন বুঝি, তাই অন্য লোক না বুঝে ওই স্ত্রীলোকটির মত ছেঁদো কথা বললে এত বিচলিত লাগে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এবারের বসন্তে কয়েকটি চাষী রেলপথের এমব্যাঙকমেণ্টে কাজ করছিল, আমার ওখান থেকে বেশী দূরে নয়। ছোকরা চাষীর সাধারণ খাবার হল রুটি, ক্‌ভাস আর পেঁয়াজ। তাতে সে বেঁচে থাকে, ফূর্তিতে ও স্বাস্থ্যে থাকে, মাঠের সহজ কাজে খাটে। রেলপথে কাজ করতে গেলে খাবার জন্য রোজ পায় পরিজ আর আধসের গরুর মাংস। কিন্তু এই আমিষ শক্তি সে ব্যয় করে দিনে ষোলো ঘণ্টা খেটে, তাকে টানতে হয় তিরিশ পুদ ওজনের মাল বোঝাই ঠেলাগাড়ি। ঠিক এইটেই ওর দরকার। আর আমরা? দিনে একসের মাংস, হাঁস-মুরগী, শরীর গরম-করা অন্যান্য সৌখীন খাবার আর পানীয়। কোথায় তা যায়? অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সম্ভোগে। তাহলেও উত্তেজনা মোচনের একটা পথ খোলা থাকলে ভালোয় ভালোয়

মেটে। কিন্তু সে পথ বন্ধ থাকলে, আমার বেলায় যেমন থেকে থেকে হত, পরিণামে আসে উত্তেজনা, আমাদের কৃত্রিম জীবনের রঙীন কাঁচের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সেটা প্রকাশ পায় অতি-সূক্ষ্মগোছের প্রেমে, এমনকি অদেহী প্রেমে। আর অন্য সবায়ের মতো আমিও প্রেমে পড়লাম। আর সবই ছিল সে প্রেমে: উচ্ছ্বাস, হৃদয়াবেগ, কাব্য... বাস্তবিক পক্ষে আমার ভালোবাসার জন্য একদিকে দায়ী ছিল মেয়েটির মা ও তার দর্জি, আর অন্যদিকে আমার অতিরিক্ত খাওয়া-দাওয়া, আমার অলস জীবন। যদি নৌকোয় না বেড়াতাম, যদি ওর কটি রেখা ও দেহের অন্যান্য জিনিস ফুটিয়ে তোলার মতো কোনো দর্জি না থাকত, যদি আমার ভাবী স্ত্রী বেঢপ একটা ড্রেসিংগাউন পরে বাড়িতে বসে থাকত, আর ওদিকে যদি নিজের কাজের জন্য ঠিক যতটা দরকার, ততটা খাবার খেয়ে স্বাভাবিক লোকের মতো আমি থাকতাম, উত্তেজনা মোচনের পথ যদি খোলা থাকত (সে সময়ে খোলা ছিল না ঘটনাক্রমে), তাহলে প্রেমে পড়তাম না আমি, আর পরিণামটা এরকম হত না।'

৮

'কিন্তু এই ক্ষেত্রে সব মিলে গেল: আমার অবস্থা, ওর অঙ্গরাগ, নৌকাবিহার। এর আগে বিশ বার

যোগাযোগ হয়ে কিছু ঘটে নি, কিন্তু এবার ঘটল। ফাঁদে পড়ার মতো। ঠাট্টা করছি না। আমাদের কালে বিয়ের তোড়জোড় ফাঁদ পাতার মতো। কিন্তু একি স্বাভাবিক? মেয়ের বয়স হল, বিয়ে দিতে হবে। ব্যাপারটা মনে হয় অত্যন্ত সহজ, যদি মেয়েটির চেহারা তাড়কার মতো না হয়, আর যদি পরিণয়াভিলাষী পুরুষ থাকে। আগেকার দিনে ব্যাপারটা এভাবে ঘটত। মেয়ের বয়স হলে বাপ-মায়ে পাত্র জোগাড় করে দিত তাকে। এ প্রথা ছিল, আর এখনো আছে সারা দেশে: চীনে, ভারতীয় ও মুসলমানদের মধ্যে, আছে আমাদের চাষীদের মধ্যেও। পৃথিবীর শতকরা নিরেনব্বই জন লোকের মধ্যে এ প্রথা। কিন্তু শতকরা একজন, বা তারও কম, আমাদের মতো উচ্ছৃঙখল লোকেরা ঠিক করল এটা ভুল, নতুন একটা প্রথা বের করল তারা। আর নতুন জিনিসটা কী? প্রথাটা হল, মেয়েরা বসে থাকবে আর পুরুষেরা তাদের সামনে, যেন বাজারে, পায়চারি করে বাছাই করবে। মেয়েরা বসে থাকে, ভাবে, নিজ মুখ ফুটে বলার সাহস নেই "ও গো, আমায় নিন! আমায়! ওকে নয়, আমায়! দেখুন আমার কাঁধদুটো কী খাসা, আর... ইয়ে... দেখুন অন্যান্য জিনিস!" আর আমরা পুরুষরা পায়চারি করি, তাকিয়ে দেখি, বেড়ে লাগে। "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি

ফাঁদে পা দিচ্ছি না!” ঘুরি, দেখি, ভারি খুশি যে, আমাদের জন্যই এই প্রদর্শনীটির ব্যবস্থা। দেখতে দেখতে ধপ্, আমরাও ফাঁদে পড়ি!’

‘কিন্তু গত্যন্তর কী?’ জিজ্ঞেস করলাম। ‘মেয়েরা নিজেরা বিয়ের প্রস্তাব করবে?’

‘অন্য কী উপায় জানি না, কিন্তু মেয়ে ও ছেলেদের তো বলা হয় সমান, সত্যিকার সাম্য তাহলে হোক। আর বাপ-মা বিয়ে দিচ্ছে সেটা যদি ঘৃণ্য মনে করা হয়, এটা তার চেয়ে হাজারগুণ ঘৃণ্য। প্রথম ক্ষেত্রে অধিকার আর সুযোগ অন্তত সমান, কিন্তু দ্বিতীয়টির বেলায় মেয়েটির অবস্থা হয় বাজারে বেচা দাসী, নয় ফাঁদের টোপের মতো। কিন্তু কোনো মেয়েকে বা তার মাকে সত্যি কথাটা বলুন যে, তার একমাত্র পেশা হল স্বামীধরা, বাপরে! কী দারুণ চটে যাবে! অথচ ওরা ও ছাড়া আর কিছু করে না, আর কিছু করার নেই। একেবারে কমবয়সী সরল মেয়েরাও মাঝেমাঝে তাই করে, বেচারাদের দেখলে ভয়ঙ্কর খারাপ লাগে। তবু যদি খোলাখুলি-ভাবে এসব চলত, কিন্তু তা নয়, চলে ডুবে ডুবে। “ওঃ, জীবের বিবর্তন! কী মনোজ্ঞ! আমার লিজা ছবি আঁকা বলতে পাগল! আপনি কি প্রদর্শনীতে যাবেন? জানবার আছে অনেক! আর শ্লেজে ঘোরা, নাটক দেখা, সিমফনি শুনতে যাওয়া?

বাঃ, কী চমৎকার! আমার লিজা গানবাজনা বলতে পাগল! আচ্ছা, ওর মতামতের সঙ্গে আপনার মিল নেই, কেন? কিন্তু নৌকোয় গেলে কেমন হয়!" আর সর্বক্ষণ একমাত্র চিন্তা হল: "নিন আমাকে, আমাকে, আমার লিজাকে নিন! না, আমাকে নিন! একবার চেখে দেখুন!" উঃ! কী নোংরামি! কী মিথ্যা!' বলে ভদ্রলোক শেষ চা-টুকু খেয়ে ফেলে কাপ প্লেট সরিয়ে দিতে লাগলেন।

৯

চা আর চিনি ঝোলায় পুরে তিনি আবার শুরু করলেন, 'কী জানেন, এ সবকিছুর মূলে হল স্ত্রীলোকের আধিপত্য — পৃথিবীতে অসংখ্য দুঃখের গোড়ায় হল এটা।'

'স্ত্রীলোকের আধিপত্য মানে? কী বলছেন?' জিজ্ঞেস করলাম। 'আইনে তো পুরুষেরই বিশেষ অধিকার বেশী।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই,' বাধা দিয়ে তিনি বললেন। 'আপনাকে ঠিক এই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম; একদিকে মেয়েদের চরম অবমাননার স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেটা একেবারে ঠিক, আবার অন্যদিকে তাদের আধিপত্য,

এই বিচিত্র ব্যাপারটার কারণ এরি মধ্যে নিহিত। টাকার জোরে যেমন উৎপীড়নের ক্ষতিপূরণ খুঁজে পায় ইহুদীরা, মেয়েরা ঠিক তাই। ওরা বলে, "তাহলে তোমরা চাও আমরা শুধু বেনে? দোকানদার হই, আর কিছু না? বেশ তাহলে বেনে হিসেবে তোমাদের ওপর শক্তি বিস্তার করব।" মেয়েরা বলে, "তাহলে তোমরা শুধু ইন্দ্রিয়ের সেবিকা হিসেবে আমাদের চাও, আর কিছু না! বেশ, ইন্দ্রিয়ের সেবিকা হিসেবেই তোমাদের গোলাম বানাব।" মেয়েরা যে অধিকারহীন সেটা এই জন্য নয় যে, তাদের ভোট দেবার ক্ষমতা নেই বা হাকিম হতে পারে না, এ ধরনের কাজ অধিকারের সামিল নয় একেবারে। যৌন জীবনে পুরুষের সমকক্ষ নয় বলে তারা অধিকারহীন, মনের মতো কোনো পুরুষের কাছে আত্মদান করা বা না করার অধিকার তাদের নেই, পুরুষ পছন্দ করে তাদের, তারা কিন্তু পছন্দ মতো পুরুষ বাছাই করতে পারে না, এ জন্য তারা অধিকারহীন।

'আপনি বলছেন এটা উৎকট। বেশ। তাহলে পুরুষেরো এ অধিকার থাকা উচিত নয়। মেয়েরা যে অধিকারে বঞ্চিত, সে অধিকার পুরুষেরা ভোগ করে। আর অধিকার নেই বলে ক্ষতিপূরণের জন্য মেয়েরা পুরুষের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা কাজে লাগায়।

ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মাধ্যমে তাকে এমন ভাবে বশে আনে যে, তার পছন্দ করাটা নামমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। মেয়েরাই আসলে পছন্দ করে। সিদ্ধির পথ একবার খুঁজে পেয়ে মেয়েরা তার সুযোগ নিয়ে সমস্ত লোককে ভয়ঙ্কর দাপটে রাখে।'

'এই বিশেষ দাপটটা কোথায় দেখলেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কোথায়? সবকিছুতে, সর্বত্র। বড়ো সহরের যে কোনো দোকানে গিয়ে দেখুন। লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস, কত লোকের মেহনত সেখানে সাজানো, তার ইয়ত্তা নেই। অথচ দেখুন একবার! দশটা দোকানের একটাতেও পুরুষের ব্যবহার্য জিনিস কিছু কি পাওয়া যায়? জীবনের সবকিছু বিলাস-সামগ্রী মেয়েদের চাই, তারাই সেগুলি ব্যবহার করে। কারখানাগুলোর কথা ভেবে দেখুন। তুচ্ছ গয়নাগাটি, গাড়ি, আসবাবপত্র আর মেয়েদের জন্য টুকিটাকি বানাতে প্রায় সবকটা ব্যস্ত। মেয়েদের খেয়াল মেটাতে লক্ষ লক্ষ লোক, পুরুষানুক্রমে কত না গোলাম কারখানার কঠোর শ্রমে হাড়মাস কালি করে ফেলে। মেয়েরা রানীর মতো, মানুষের প্রতি দশজনের ন জনকে গোলামের মতো খাটতে বাধ্য করেছে নিজেদের জন্য। আর এ সবকিছু হয়েছে তাদের অবমানিত করা হয়েছে বলে, পুরুষের

সমানাধিকার তাদের দেওয়া হয় নি বলে। আর তাই আমাদের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা কাজে লাগিয়ে, আমাদের ফাঁদে ফেলে শোধ তোলে তারা। সত্যি, সবকিছুর মূলে এটা। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা কাজে লাগাবার এমন অস্ত্র মেয়েরা নিজেদের মধ্যে বার করেছে যে, তাদের সঙ্গে সম্পর্কে পুরুষেরা স্থৈর্য বজায় রেখে চলতে পারে না। মেয়েদের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের নেশা ধরে, মাথা খারাপ হয়ে যায় আফিমের মতো। আগে বল-গাউনে সজ্জিতা কাউকে দেখলে আমি জড়সড় হয়ে যেতাম, অস্বস্তি লাগত। এখন দারুণ আতঙ্ক হয়, কেননা মেয়েটির মধ্যে আমি দেখি বিপজ্জনক একটা কিছু, বেআইনী কিছু, আর অত্যন্ত ঝোঁক হয়, হেঁকে পুলিশ ডাকি, সাহায্য চাই, বলি বিপজ্জনক বস্তুটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক।

'হাসছেন?' ধমক দিয়ে ভদ্রলোক বললেন। 'ইয়ার্কি নয় এটা। আমি নিশ্চিত যে, একটা সময় আসবে, শীগগির আসবে হয়ত, যখন লোকে এটা বুঝতে পারবে আর অবাক হয়ে ভাববে, ইন্দ্রিয় তাতানোর পরিষ্কার ফন্দীতে গয়না দিয়ে নারীদেহ সাজানোর মতো শান্তির বিঘ্নকারী ব্যাপার মেনে চলে, এমন একটা সমাজ কী করে ছিল? আমাদের চলার পথে ক্রমাগত ফাঁদ পেতে রাখা, ব্যাপারটা ঠিক সে

রকম! না, আরো খারাপ! জুয়া খেলা নিষিদ্ধ, কিন্তু পুরুষ তাতানো বেশ্যাসুলভ পোষাকে মেয়েদের সাজানো নিষিদ্ধ নয় কেন? সেটা তো সহস্রগুণ বিপজ্জনক!'

১০

'আর তাই, যা বলছিলাম, ফাঁদে ধরা দিলাম। লোকে যা বলে, "প্রেমে পড়লাম"। শুধু যে মেয়েটিকে গুণের আকর বলে দেখলাম, তা নয়, বাগদানের পর নিজেকেও মনে হল গুণের আকর। কোনো কোনো বিষয়ে নিজের চেয়েও খারাপ এমন কাউকে খুঁজে পায় নি এরকম বদ লোকের অস্তিত্ব তো নেই, ফলে সে নিজের বিষয়ে গর্ব ও প্রীতি বোধ করার ছুতো পায়। আমারো ঠিক তাই হল: টাকার জন্য তো বিয়ে করছি না, লাভের প্ররোচনায় নয়, যেমনটি আমার চেনা-পরিচিতদের বেশীর ভাগ করেছে, তারা বিয়ে করে টাকা বা সুযোগসুবিধার জন্য। আমি ধনী, মেয়েটি দরিদ্র। সেটা হল একটা কথা। আর একটা কথা, অপরেরা আগেকার মতো অনেক মেয়ের সঙ্গে কারবার চালিয়ে যাবার সংকল্প নিয়ে বিয়ে করেছে, কিন্তু আমি দৃঢ় সংকল্প করেছিলাম বিয়ের পর

একেবারে একনিষ্ঠ থাকব, আর সে জন্য নিজের কাছে আমার গর্বের সীমা ছিল না। হ্যাঁ, ছিলাম আস্ত একটা শুয়োর, কিন্তু নিজেকে ভাবতাম দেবশিশু।

'বাগদানের পর বেশী দিন কাটল না। সে সময়টার কথা মনে পড়লে এখনো লজ্জায় আমার কান লাল হয়ে ওঠে। কী ইতরামি! আমরা ধরে নিই প্রেম হল আত্মিক ব্যাপার, ইন্দ্রিয়ের নয়। কিন্তু প্রেম যদি আত্মিক হয়, আত্মার সাযুজ্য হয়, তাহলে সে সাযুজ্যের ছাপ পড়া উচিত আমাদের বাক্যে, আমাদের আলাপে আলোচনায়। কিন্তু কিছুই সে রকমটা হল না। দুজনে একা থাকলে কথা বলা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ত, অবস্থাটা হত সিজিফাসের মতো। কিছু বলার আগে ভেবে নেওয়া, তারপর কথা বলেই চুপ করে যাওয়া, আবার ভাবা। বলার মতো কিছু ছিল না। আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের বিষয়ে, আমাদের সব পরিকল্পনা ও আয়োজনের বিষয়ে যা বলার, তা ইতিমধ্যে বলা হয়ে গিয়েছে। অতঃপর? জানোয়ার হলে জানা থাকত যে, কথাবার্তা চলার দরকার নেই; কিন্তু মানুষ তো, আমাদের কথা বলা উচিত, অথচ বলার মতো কিছু নেই, কেননা আমাদের মন জুড়ে যা রয়েছে সেটা কথোপকথনে মেটে না। আর তাছাড়া, সেই জঘন্য

প্রথাটি — চকোলেট, পেট-পুরে মিষ্টি খাওয়া, বিয়ের সেই সব ন্যক্কারজনক ঘটা — বাড়ি, শোবার ঘর, বিছানাপত্র, ড্রেসিং-গাউন, অন্তর্বাস, প্রসাধন নিয়ে হৈচৈ। ওই বুড়োটা যা বলছিল, সনাতন প্রথায় বিয়ে হলে বরপণ, বিছানাপত্র, পালকের গদি — এ সব হল কেবল বিয়ের রহস্যের আনুসঙ্গিক খুঁটিনাটি। কিন্তু এখন বরেদের দশজনের বলতে গেলে একজনও বিয়ের রহস্য বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে না সে, যেটা করতে যাচ্ছে তার সঙ্গে জড়িত আছে নানা দায়িত্ব, বিয়ের আগে স্ত্রীসঙ্গম করে নি, এমন লোক একশ জনের মধ্যে একটিও খুঁজে পাওয়া ভার, বিয়ের পর প্রথম সুযোগেই স্ত্রীকে ঠকাতে চায় না, এমন লোক পঞ্চাশ জনের মধ্যে একটিও নেই, বরেদের বেশীর ভাগ ভাবে গির্জায় বিয়ের অনুষ্ঠানটি হল একটি নারীর মালিকানা পাবার নির্ধারিত সর্ত মাত্র: এ সব ভেবে দেখলে বিয়ের সব ঘটার ভয়াবহ তাৎপর্য জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। বোঝা যায় আসল ব্যাপারটা শুধু ওই। ব্যাপারটা দাঁড়ায় শুধু বিক্রি। একটি নির্দোষ মেয়েকে বেচা হচ্ছে লুচ্চার কাছে, সেই প্রসঙ্গে চলছে কতকগুলো লৌকিক অনুষ্ঠান।’

১১

'সবাই বিয়ে করে এ ভাবে, আমারো বিয়ে হল এ ভাবে, গেলাম সেই বহু-নন্দিত মধুচন্দ্রিমায়। মধুচন্দ্রিমা কথাটা পর্যন্ত কী জঘন্য!' গভীর বিদ্বেষে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন ভদ্রলোক। 'প্যারিসে একবার নানা দ্রষ্টব্য দেখে বেড়াচ্ছিলাম, সাইনবোর্ড দেখে গেলাম একটা দাড়িওয়ালা মেয়ে আর জলচর কুকুর দেখতে। পরে দেখা গেল দাড়িওয়ালা মেয়েটা আর কিছু নয়, একটা পুরুষ মেয়ের সাজে নেমেছে, আর কুকুরটাকে সিন্ধুঘোটকের চামড়ায় ঢেকে চৌবাচ্চায় সাঁতার কাটতে নামানো হয়েছে। দেখবার মতো কিছু ছিল না সেখানে, চলে আসছি, দালালটা সসম্ভ্রমে আমাকে দেখিয়ে অন্য লোকদের বলল: ''এই এঁকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, জিনিসটা দেখার মতো কিনা! চলে আসুন! চলে আসুন! মাথাপিছু এক ফ্রাঁ মাত্র!" বলতে লজ্জা হল দেখার মতো কিছু নেই, আর ঠিক সেটার ওপরই নিঃসন্দেহে নির্ভর করছিল দালালটা। মধুচন্দ্রিমার ন্যক্কারজনক অভিজ্ঞতা যাদের হয়েছে, তাদেরো এরকমটা ঘটে বোধ হয়; অন্য লোকের ভ্রান্তি ভাঙাতে লজ্জা পায় তারা। অন্যদের ভ্রান্তি আমিও ভাঙাই নি, কিন্তু এখন সত্য গোপন রাখার কোনো কারণ দেখি

না। সত্য কথাটি বলা এমনকি আমার কর্তব্য মনে করি। মধুচন্দ্রিমা জিনিসটা অস্বস্তিতে ভরা, লজ্জাকর, ঘৃণ্য, করুণ, আর সবচেয়ে বড়ো কথা যেটা — বিরক্তিকর একঘেয়ে। অসহ্য রকমের একঘেয়ে। সিগারেট খেতে শেখার সময়টার মতন, মুখ দিয়ে লালা বেরিয়ে আসছে, গা ঘোলাচ্ছে, কিন্তু তবু লালা গিলে ফেলে বেশ লাগার ভান করেছিলাম। ধূমপানের আনন্দটা পরে আসে, যদি বা আসে কখনো, আর এটাও তাই; উপভোগের আনন্দ পেতে চাইলে দম্পতিকে পাপটা রপ্ত করে নিতে হয়।'

'পাপ মানে?' মাঝখান থেকে বলে উঠলাম। 'কিন্তু যেটার কথা বলছেন, সেটা তো মানুষের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক শারীরিক ক্রিয়া।'

'স্বাভাবিক?' তিনি বললেন। 'স্বাভাবিক বুঝি? না, আমি ঠিক উল্টো সিদ্ধান্তে এসেছি, আপনাকে বলি — ওটা স্বাভাবিক... নয়! একেবারে... নয়। বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, জিজ্ঞেস করুন নিষ্পাপ কুমারীদের। অতি অল্প বয়সে আমার বোন তার দুগুণ বয়সের একটা লম্পটকে বিয়ে করেছিল। বিয়ের রাত্রে, মনে আছে, অত্যন্ত অবাক হয়ে দেখলাম ও দৌড়িয়ে বেরিয়ে আসছে, মুখখানা ফ্যাকাসে, চোখে জল, থরথরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলছে, ও পারবে না —

কিছুতেই পারবে না, মরে গেলেও না! লোকটা কী চায় ওর কাছে, তা বলতে পর্যন্ত পারল না!

'আর আপনি বলছেন এটা স্বাভাবিক! স্বাভাবিক জিনিসও আছে। আছে সহজ প্রীতিকর আনন্দের জিনিস, প্রথম থেকে তাদের মধ্যে লজ্জাকর কিছু নেই। কিন্তু এটা ঘৃণ্য, লজ্জাকর, কষ্টকর। না, স্বাভাবিক নয় এটা। আর নিষ্পাপ মেয়েরা ঘৃণা করে জিনিসটাকে, আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু তাহলে,' আমি বললাম, 'মানুষ কী করে বংশরক্ষা করে চলবে?'

'ঠিকই তো, মানুষের বংশ যেন ধ্বংস না হয়!' বিদ্রূপভরা গলায় বললেন ভদ্রলোক যেন তিনি জানতেন আমি যথারীতি এই অন্যায় প্রশ্নটি করব। 'অভিজাত ইংরেজরা প্রাণভরে ভূরিভোজ যাতে চালাতে পারে, তার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের মহিমা কীর্তন চলতে পারে; লোকে যাতে আরো মজা লুঠতে পারে, তার খাতিরে জন্মনিয়ন্ত্রণের মহিমা কীর্তন করা চলে; কিন্তু নৈতিক বোধের নামে জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলুন, — বাপরে, কী হুলস্থুল না পড়ে যায়! ডজন দুয়েক লোক যদি শুয়োরের মতো জীবনযাপন করতে আর না চায়, তাহলে মানুষের বংশরক্ষা কী করে চলবে? কিন্তু শুনুন, মাপ করবেন, আলোটা খারাপ লাগছে, ঢাকা

দিলে আপনার আপত্তি আছে?' বাতিটা দেখিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম আমার কিছু এসে যায় না, অস্থিরভাবে তিনি বেঞ্চে উঠে আলোর ওপরে পর্দা টেনে দিলেন। তাঁর সব কাজে অস্থিরতা।

'তবু,' আমি বললাম, 'প্রত্যেকে এ নিয়মটা মেনে নিলে মানুষের আর অস্তিত্ব থাকবে না।'

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, তবে তখুনি নয়।

'মানুষের বংশরক্ষা কী করে হবে বলছেন?' আমার সামনের সীটে আবার বসে, পাদুটো বেশ ফাঁক করে ছড়িয়ে ঝুঁকে হাঁটুতে কনুই রেখে তিনি বললেন। 'মানুষ জাতটা চিরকাল টিকে থাকবে কেন শুনি?' জিজ্ঞেস করলেন।

'কেন নয়? তাহলে আপনার আমার অস্তিত্ব থাকবে না।'

'আমাদের অস্তিত্ব থাকতেই হবে কেন?'

'কেন আবার? বেঁচে থাকার জন্য।'

'বেঁচে থাকব কেন? জীবনের কোনো উদ্দেশ্য না থাকলে, জীবনের জন্য যদি শুধু জীবন হয়, তাহলে বেঁচে থাকার কোনো কারণ নেই। আর এটা সত্যি হলে শোপেনহাওয়ার, হার্টম্যান এবং সব বৌদ্ধরা যা বলেছেন, একেবারে ঠিক। কিন্তু জীবনের কোনো

উদ্দেশ্য থাকলে এটা স্পষ্ট যে, সে উদ্দেশ্য সাধনের পর জীবনেরও শেষ হওয়া উচিত। ঠিক এই দাঁড়ায়,' উত্তেজনায় বললেন তিনি, স্পষ্টত কথাটার যথেষ্ট মূল্য তাঁর কাছে। 'এই দাঁড়ায়! ভেবে দেখুন: মঙ্গল, মমতা ও প্রেম যদি মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হয়; শাস্ত্রীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে যা বলা হয়েছে, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য যদি তা হয়, অর্থাৎ প্রেমে মানুষ এক হবে, হাতিয়ার থেকে বানাতে হবে লাঙল, ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহলে সে উদ্দেশ্য লাভের পথে আমাদের অন্তরায় কী? আমাদের নানা রিপু। আর রিপুর মধ্যে সবচেয়ে প্রখর, অশুভ ও নাছোরবান্দা হল যৌন প্রেম, দৈহিক প্রেম, আর যদি রিপু দমন করতে পারি, বিশেষ করে সবচেয়ে প্রখর যেটা সেটাকে, অর্থাৎ যৌন প্রেমকে, তাহলে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সফল হবে, মানুষ এক হবে, সাধিত হবে তার জীবনের উদ্দেশ্য, তখন প্রাণধারণের আর কোনো কারণ থাকবে না। যতদিন মানুষের অস্তিত্ব ততদিন তাকে অনুপ্রাণিত করবে এই আদর্শ। শুয়োর আর খরগোসের আদর্শ নয়, সেটা হল অবাধ প্রজনন, বাঁদর ও প্যারিসপন্থীদের আদর্শ নয়, সেটা হল কামকেলির অতি সূক্ষ্ম সম্ভোগ। মঙ্গলের আদর্শ মানুষের; সে আদর্শলাভের উপায় হল জিতেন্দ্রিয়তা, শুদ্ধতা। মানুষ বরাবর এ আদর্শে

পেঁছিবার প্রয়াস করেছে, বরাবর করবে। কিন্তু ব্যাপারটা কী দাঁড়াল ভেবে দেখুন।

'ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই: দৈহিক প্রেম হল উত্তেজনা মোচনের একটি পথ। আমাদের সময়ের লোকেরা মানুষের আদর্শে পেঁছিতে পারে নি, পারে নি তার একমাত্র কারণ তাদের নানা রিপু, আর রিপুর মধ্যে সবচেয়ে জোরালো হল যৌন রিপু। আর যৌন কামনা যখন আছে, জন্মাচ্ছে নতুন লোকজন, তখন মানুষের আদর্শে পেঁছিবার সম্ভাবনাও থাকছে পরের বংশের। তারা না পারলে, আবার তাদের বংশধরদের পালা, এ ভাবে চলে যতদিন না উদ্দেশ্যে পেঁছিয়, ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সফল হয়, এক হয় সমস্ত মানুষ। এ ছাড়া আর কী হতে পারে? ধরা যাক, বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যসাধনের জন্য মানুষের সৃষ্টি করলেন ঈশ্বর, কিন্তু সৃষ্টি করলেন হয় নশ্বর প্রাণী হিসেবে, যৌনপ্রবৃত্তি বাদ দিয়ে, নয় অবিনশ্বর হিসেবে। যৌনপ্রবৃত্তি বাদ দিয়ে নশ্বর প্রাণী হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াত? তারা শুধু বেঁচে থাকবে, তারপর মৃত্যু হবে, সিদ্ধিলাভ হবে না; আর সিদ্ধিলাভের জন্য ঈশ্বরকে আবার নতুন মানুষ সৃষ্টি করতে হবে। অবিনশ্বর হলে হয়ত হাজার হাজার বছর পরে লোকের সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব, মনে রাখবেন

(অবশ্য, নিজেদের দোষত্রুটি নিজেরা শোধরানো কঠিন, পরে যারা আসবে, তাদের পক্ষে পূর্বপুরুষদের ভুলভ্রান্তি শুধরে পূর্ণতার কাছাকাছি যাওয়া আরো সহজ), তাই ধরা যাক, কিন্তু তাহলে অমরলোকগুলোর দরকারটা কী? কোন কাজে লাগবে? না, এখন যা অবস্থা তা আরো ভালো... বক্তব্যটা এভাবে বলাতে হয়ত আপনার আপত্তি? আপনি হয়ত বিবর্তনবাদের পক্ষপাতী? ফলটা কিন্তু সমান। প্রাণী জীবনের সর্বোচ্চ রূপ হল মানুষ, অন্য প্রাণীদের সঙ্গে সংগ্রামে পার পাবার জন্য তাদেরো মৌমাছির মতো ঝাঁক বাঁধতে হবে; অবাধ প্রজননে নিজেদের সঁপে দিলে চলবে না। মৌমাছিদের মতো তাদেরো যৌনহীন ব্যক্তিদের বিকাশ ঘটাতে হবে, অর্থাৎ ফের সংযমের প্রয়াস করতে হবে, আমাদের সমাজে যৌনপ্রবৃত্তিকে যেমন লাই দেওয়া হয় তেমন করা চলবে না।' মুহূর্তের জন্য ভদ্রলোক থামলেন। 'মানুষ জাতিটার সমাপ্তি! কিন্তু এর অনিবার্যতায় বিশ্বাস না করে কেউ কী পারে, মতামত তার যাই হোক? এটা তো মৃত্যুর মতো অমোঘ। প্রত্যেকটি ধর্মশাস্ত্রে বলেছে পৃথিবীর বিলুপ্তি ঘটবে, বিজ্ঞানও তাই বলে। নৈতিক শিক্ষাবলীও বিলুপ্তির কথা বললে সেটা কেন বিচিত্র?'

এরপর অনেকক্ষণ ভদ্রলোক চুপ রইলেন। আরো

চা খেলেন তিনি, সিগারেটটা শেষ করে ঝোলা থেকে আরো সিগারেট বের করে পুরনো দাগলাগা সিগারেটকেসে ভরলেন।

'আপনার বক্তব্যটা বুঝেছি,' আমি বললাম। 'শেকারদের* মতামতও এরকম।'

'ওরা ঠিকই বলে,' ভদ্রলোক বললেন। 'যে ভাবেই প্রকাশ পাক না কেন, যৌন আবেগ হল পাপ, ঘোর পাপ, দাবানো দরকার সেটা, আমাদের মতো প্রশ্রয় দিলে চলবে না। বাইবেলের সেই উক্তি — লালসার সঙ্গে স্ত্রীলোকের দিকে তাকানো মানেই তার সঙ্গে ব্যভিচার করা — শুধু যে পরস্ত্রীর বেলায় খাটে তা নয়, প্রধানত সেটা প্রযোজ্য আমাদের নিজেদের স্ত্রীর বেলায়।'

১২

'আমাদের জগতে সবকিছু ঠিক উল্টো। আইবুড়ো অবস্থায় কেউ হয়ত সংযম অভ্যাস করেছে, কিন্তু বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে সে মনে করে সংযমের আর কোনো দরকার নেই। ঠিক বলতে কি, বিয়ের পর বাপ-মায়ের অনুমতি নিয়ে আমরা যে দেশ বেড়াতে যাই, নিরালায়

---

* শেকার — ১৮শ শতকের মাঝামাঝি ইংলণ্ডে উদিত ধর্মসম্প্রদায়, চিরকৌমার্যের প্রচার করত এরা।

থাকি — সেটা লাম্পট্যের অনুমোদন ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু নৈতিক নিয়মকানুন ভাঙলে আপনা থেকে শাস্তি মেলে। অনেক চেষ্টা করেছিলাম মধুচন্দ্রিমা যাতে সার্থক হয়, কিন্তু সব বৃথা। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা লজ্জাকর, জঘন্য আর একঘেয়ে। শীগগিরই ব্যাপারটা আরো কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল, শুরু হল খুব শীগগিরই। তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে দেখলাম আমার স্ত্রী মুষড়ে পড়েছে; কেন মন খারাপ জিজ্ঞেস করে আদর করতে লাগলাম, ভেবেছিলাম এর বেশী আর কি চাইতে পারে ও; কিন্তু ও আমার হাতটা সরিয়ে দিয়ে কাঁদতে শুরু করল। কেন কাঁদছে বলতে পারল না। কিন্তু ও অসুখী, বেজায় খারাপ লাগছিল ওর। হয়ত স্নায়ুর ধকলে টের পেয়েছিল আমাদের দুজনের সম্পর্কটা আসলে কী ঘৃণ্য, কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে পারল না। পীড়াপীড়ি করাতে মার জন্য মন কেমন করছে গোছের কী একটা বলল। বোধ হল সেটা আসল কথা নয়। মায়ের কথা না তুলে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। ও যে শুধু অসুখী, মার কথাটা ছুতো মাত্র, মাথায় ঢুকল না। কিন্তু মার কথাটায় কান না দেওয়াতে ও চটে গেল, যেন ওর কথা আমি বিশ্বাস করি নি। বলল, আমি যে ওকে ভালোবাসি না তাতো জলের মতো স্পষ্ট। ওর মেজাজের ঠিক নেই বলে বকাতে হঠাৎ

ওর মুখে এল সম্পূর্ণ ভাবান্তর; দুঃখের ভাব চলে গিয়ে এল গভীর বিরক্তি, অত্যন্ত তীক্ষ্ন ভাষায় আমাকে স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর বলে গালাগালি দিতে শুরু করল। ওর দিকে তাকালাম। মুখ জুড়ে আমার প্রতি নিঃস্পৃহতা, শত্রুতা, বিরূপতা এমনকি বিদ্বেষের ছাপ। মনে পড়ে এটা দেখে আমার কেমন ভয়ংকর লেগেছিল। "সে কী? কী ব্যাপার?" ভাবলাম। "কোথায় প্রেম, আত্মার আত্মীয়তা — না এই! এ যে অসম্ভব! না, এ তো ও নয়।" ওকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু এত অনড় কঠোর ওর শত্রুতা, যে তার মুখোমুখি হয়ে কিছু বোঝবার আগেই আমারো মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল, দুজনে দুজনকে অনেক খারাপ কথা শোনালাম। প্রথম এই ঝগড়া আমার মনে ভয়াবহ একটা ছাপ রেখে গেল। ঝগড়া বলছি, কিন্তু ঝগড়া আসলে নয়; আমাদের দুজনের মধ্যে অপার ব্যবধান যা সত্যি সত্যি ছিল তার প্রকাশ। কামনার তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রেম নিঃশেষ, আমাদের মধ্যে সত্যিকারের যা সম্পর্ক তার মুখোমুখি আমরা, অর্থাৎ, দুটি একেবারে অনাত্মীয়, সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক লোকের সম্পর্ক, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল পরস্পরের কাছ থেকে যতখানি সম্ভব তৃপ্তি আদায় করে নেওয়া। যেটা ঘটল সেটাকে ঝগড়া বলেছি; কিন্তু ঝগড়া নয়

সেটা; কামের উপসংহারে আমাদের দুজনের সত্যিকার সম্পর্কের উন্মোচন সেটা। তখন বুঝি নি এই কঠোর শত্রুতার ভাব হল আমাদের দুজনের স্বাভাবিক সম্পর্ক, সেটা বুঝি নি তার কারণ, কামনার, মানে প্রেমের উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে শত্রুতার এই প্রথম ভাবটা চাপা পড়ল তাড়াতাড়ি।

'ভাবলাম ঝগড়া করেছি, ঝগড়া মিটে গেছে, আর কখনো এমনটা হবে না। কিন্তু মধুচন্দ্রিমার প্রথম মাসে আবার অতিতৃপ্তির একটা পর্যায় আসতে দেরী হল না, তখন দুজনকে দুজনের আর দরকার নেই। ফলে আবার একটা ঝগড়া বাঁধল। প্রথমটার তুলনায় দ্বিতীয়টি বেশী কষ্টের মনে হল। ভাবলাম প্রথমকার ঝগড়াটা তাহলে দৈবাৎ ঘটে নি; প্রত্যাশিত সেটা, পুনরাবৃত্তি হবে তার নিশ্চয়। দ্বিতীয় ঝগড়াটা হল অত্যন্ত তুচ্ছ একটা কারণে, সেজন্য বিশেষ বিচলিত লেগেছিল আমার — টাকা নিয়ে কী একটা ব্যাপার, টাকা খরচ করতে কখনো কুণ্ঠা করি নি আমি, স্ত্রীকে টাকা দিতে ইতস্তত করব, সেটা সম্ভব নয়। শুধু মনে আছে আমার কী একটা কথা ঘুরিয়ে সে মানে করল এই যে টাকার জোরে তার ওপর অধিকার খাটাচ্ছি, টাকা খরচ করার ক্ষমতা নাকি একমাত্র আমার, কিম্বা ওই ধরনেরই কী একটা অসম্ভব কুৎসিৎ নির্বোধ কথা

যা আমাদের কাউকেই শোভা পায় না। চটে গিয়ে বললাম ওর বিবেচনা বলে কিছু নেই, মুখের ওপর জবাব দিল ও, ব্যস, ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। ওর ভাষায়, ওর মুখে আর চোখে আবার দেখলাম সেই কঠোর কঠিন শত্রুতার ভাব যেটা প্রথমবার আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল। ভাই, বন্ধু এমনকি বাবার সঙ্গে ঝগড়ার কথা মনে আছে, কিন্তু এ ধরনের বিশেষ রকমের একটা বিষাক্ত ভাব তাতে কখনো হয় নি। সময় কাটল, দুজনার বিদ্বেষ আবার ঢাকা পড়ল প্রেমের আড়ালে, অর্থাৎ কামের আড়ালে, আবার নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম ঝগড়াদুটো ভুলে হয়েছে, সে ভুল শোধরানো যায়। কিন্তু তৃতীয়বার ঝগড়া হল, তারপর আবার, আর তখন বুঝলাম যে ওগুলো দৈবাৎ নয়, এই হওয়ার কথা, এই হবে, আর আমার কপালে কী আছে ভেবে আতঙ্ক হল। আর একটা চিন্তা আমাকে আরো যন্ত্রণা দিত — বৌয়ের সঙ্গে কেবল আমারই দিন কাটছে খারাপ, যেমনটা প্রত্যাশা করেছিলাম মোটেই তার মতো নয়, কিন্তু আর সবায়ের ব্যাপার আলাদা। তখনো বুঝি নি প্রত্যেক লোকেরই কপাল হল এই, আমি যেমন ভেবেছিলাম তেমন সবাই ভাবে তাদের দুর্ভাগ্যটা একান্ত তাদেরি, শুধু যে অপরের কাছ থেকে তা নয়, নিজের কাছ থেকেও এই অসাধারণ

ও লজ্জাকর দুর্ভাগ্য লুকোয়, স্বীকার করে নেয় না সেটাকে।

'প্রথম থেকেই এটার সূত্রপাত বেড়ে চলল তা ক্রমশ হল আরো গভীর ও নির্মম। প্রথম সপ্তাহ থেকে অন্তরে অন্তরে বুঝলাম আমার "হয়ে গিয়েছে" যা আশা করেছি তা হয় নি, বিয়েটা বিরাট সুখের কিছু নয় বরং বিরাট দুর্ভাগ্য। কিন্তু অন্য সবায়ের মতো আমিও নিজের কাছে সেটা স্বীকার করতে চাই নি (পরিণামে যা হয়েছিল তা না হলে আজও স্বীকার করতাম না), শুধু অন্যদের কাছ থেকে নয়, নিজের কাছেও সত্য গোপন করলাম। এখন ভেবে দেখলে অবাক লাগে কেন আমার আসল অবস্থা বুঝতে পারি নি। যা নিয়ে আমাদের ঝগড়া বেঁধে যায় সেগুলো এত তুচ্ছ যে পরে মনেও থাকে না, শুধু এই থেকেই সবকিছু আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। নিরন্তর এই শত্রুতার যোগ্যমতো উপলক্ষ মাথা খাটিয়ে বানিয়ে তোলাও আমাদের হয়ে উঠত না। কিন্তু আমাদের মিটমাটের, মিলনের ছলগুলি আরো অদ্ভুত। মাঝে মাঝে কথা, ব্যাখ্যান, এমনকি অশ্রুর অভাব হত না, কিন্তু অন্যান্য সময়ে... মনে পড়লে গা রিরি করে ওঠে — অত্যন্ত নিষ্ঠুর বাদানুবাদের পর হঠাৎ নীরবে তাকাতাম পরস্পরের

দিকে, তারপর মধুর হেসে জড়িয়ে ধরা, চুমো খাওয়া... কী জঘন্য ব্যাপার! জঘন্যতাটা আমার কাছে কেন যে তখন ধরা পড়ে নি...'

১৩

দুজন যাত্রী ঢুকে কামরার একেবারে অন্য দিকটায় বসল। তারা গুছিয়ে বসা না পর্যন্ত ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন, ওদের কথাবার্তা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু করলেন, মুহূর্তের জন্যও তাঁর চিন্তার খেই হারিয়ে যায় নি মনে হল।

'সবচেয়ে ন্যক্কারজনক জিনিস হল এই,' তিনি বলতে লাগলেন, 'প্রেমকে মনে করা হয় আদর্শ গোছের, মহান গোছের কিছু একটা, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটা এমন কুৎসিত ও পশুজনোচিত জিনিস যে, এটার কথা বলা বা ভাবাটা পর্যন্ত কুৎসিত, লজ্জাকর। প্রকৃতি তো আর অকারণে জিনিসটিকে কুৎসিত ও লজ্জাকর করে নি। আর প্রেম যদি কুৎসিত ও লজ্জাকর, তাহলে তাকে সেভাবে গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু লোকে ভান করে কুৎসিত ও লজ্জাকর জিনিসটা সুন্দর ও মহান। আমার প্রেমের প্রথম লক্ষণগুলো কী? পাশবিক অমিতাচারের উপভোগ, তাতে এক ফোঁটা লজ্জা নেই,

বরং অমিতাচার করতে পারছি বলে গর্বের একটা ভাব, আর উপভোগের সময়ে স্ত্রীর মানসিক, এমনকি তার দৈহিক জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য। পরস্পরের প্রতি আমরা এত বিরূপ কেন অবাক হয়ে ভাবতাম, অথচ, ব্যাপারটা ছিল জলের মতো স্পষ্ট: পশু স্বভাবের কাছে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে মানবিক স্বভাবের প্রতিবাদই হল এই বিরূপতা।

'আমাদের পারস্পরিক ঘৃণায় অবাক লাগত আমার। কিন্তু এ ছাড়া আর কিছু হতে পারত না। একটা অপরাধে দুই সহাপরাধীর প্ররোচনা দান ও অংশ গ্রহণের জন্য পরস্পরের প্রতি ঘৃণা এটা। বিয়ের প্রথম মাসে বেচারী পোয়াতী হল, তবু আমাদের জান্তব সম্পর্কের বিরাম নেই, অপরাধ নয় এটা? আপনি ভাবছেন আমি অবান্তর কথা বলছি? একটুও নয়। আমার স্ত্রীকে কী করে হত্যা করলাম তার সমস্তটাই আপনাকে বলছি। বিচারের সময়ে আমাকে ওরা জিজ্ঞেস করেছিল কী ভাবে, কী দিয়ে ওকে হত্যা করি। নির্বোধ সব! ওরা ভেবেছিল ওকে মেরেছি ছুরি দিয়ে, তখন, অক্টোবরের ৫ই তারিখে। তখন ওকে হত্যা করি নি, করেছি অনেক আগে। ওরা সবাই যেমন করে, এখনো সেটা করছে ঠিক তেমনভাবে করেছিলাম...'

'তার মানে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'অবাক কাণ্ড এটা — যা খুবই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, তা কেউ স্বীকার করতে চায় না, ডাক্তারদের উচিত এর বিষয়ে জানা এবং প্রচার করা, কিন্তু তারা মুখ বুজে থাকে। অথচ ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর সহজ। পুরুষ ও স্ত্রীর গঠন ঠিক পশুদের মতো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সর্বস্ব প্রেম উপভোগের পর আসে গর্ভাবস্থা, খাওয়াতে হয় বাচ্চাকে। শরীরের এই অবস্থায় সহবাস জননী ও শিশু দুজনের পক্ষে হানিকর। নারী ও পুরুষ সংখ্যায় সমান। কীসের ইঙ্গিত এটা? মনে হয়, সেটা স্পষ্ট। সংযমের ইঙ্গিত — পশুরা যেটা করে সে সিদ্ধান্তে পেঁছতে মহাজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু না, আমরা তা করি না। রক্তে লিউকোসাইটের সঞ্চরণ ইত্যাদি অনেক তুচ্ছ ব্যাপার বুদ্ধি খাটিয়ে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু ওপরের কথাটা বোঝার মতো বুদ্ধি তাঁদের হয় নি। অন্তত এটার উল্লেখ করতে তাঁদের শোনা যায় না।

'আর তাই মেয়েদের দুটো পথ খোলা। একটা হল নারী হবার অর্থাৎ মা হবার ক্ষমতা একেবারে বা প্রয়োজন অনুসারে ধ্বংস করা, নিজেকে বিকলাঙ্গ করা, যাতে স্বামী যখন খুশি আনন্দ আদায় করতে পারে; অন্য পথটা পথ নয়, সেটা শুধু প্রকৃতির নিয়মের

প্রত্যক্ষ, স্থূল লঙ্ঘন, সেটা করে থাকে আমাদের সব তথাকথিত সৎ পরিবার। তার অর্থ হল এই — প্রকৃতির বিরোধিতা করে নারীকে একসঙ্গে হতে হবে প্রসূতি, জননী ও স্বামীর রক্ষিতা, এমন একটা ব্যবস্থা এটা যে, কোনো পশুও মেনে নেয় না। অথচ সবটা চালাবার ক্ষমতা মেয়েদের নেই। তাই আমাদের শ্রেণীর মেয়েরা স্নায়ুবিকার ও হিস্টিরিয়ায় ভোগে, চাষী শ্রেণীর মেয়েরা হয়ে দাঁড়ায় "ক্লিকুশি"। দেখুন না, অল্পবয়সী মেয়েরা, নিষ্পাপ মেয়েরা কখনো "ক্লিকুশি" হয় না, সেটা হয় শুধু নারীরা, বিশেষ করে পুরুষের সহবাসীরা। এই হয় আমাদের দেশে। ইউরোপেও ঠিক তাই। প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করার ফলে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীলোকের ভিড়ে হাসপাতাল-গুলো ভরে গিয়েছে। অবশ্য "ক্লিকুশি" ও শারকো'র রোগিণীরা হল একেবারেই পঙ্গু; আর যারা অর্ধপঙ্গু এমন স্ত্রীলোকের ছড়াছড়ি দুনিয়ায়। ভেবে দেখুন, গর্ভধারণ ও নবজাতককে স্তন্যদায়ী মেয়েদের পক্ষে কত না বিরাট জিনিস! বেড়ে ওঠে আমাদের ধারাবাহীরা, আমাদের বদলীরা। অথচ এই পবিত্র ক্রিয়াটা লঙ্ঘিত হচ্ছে, কেন? ভাবলে ভয়ংকর লাগে। আর লোকে এদিকে নারীর স্বাধীনতা আর নারীর অধিকার নিয়ে বকবক করে! যেন রাক্ষস হত্যা করার আগে তার

বন্দীকে দুধ, ঘি খাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট করছে আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে যে, তার অধিকার ও স্বাধীনতা নিয়ে সে চিন্তিত।'

ওঁর কথাগুলো নতুন ও স্তম্ভিত করার মতো।

'কিন্তু কী করার আছে বলুন?' বললাম। 'তাই যদি হয়, লোকে স্ত্রীর সঙ্গে দু'বছরে একবার মাত্র প্রেম করতে পারে; কিন্তু পুরুষ তো...'

'হ্যাঁ, পুরুষের দরকার ওটা,' বাধা দিয়ে তিনি বললেন। 'বিজ্ঞানের মাননীয় আচার্যরা সবাইকে আবার এটা ভালো করে বুঝিয়েছেন। এঁরা তো বলে থাকেন পুরুষের পক্ষে নারী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, মেয়েদের দৈহিক কাজ ওঁদের দিয়ে জোর করে করালে আচার্যরা কী বলেন শুনতে ইচ্ছে করতাম। মানুষকে বুঝিয়ে দিন যে, ভোদকা, তামাক ও আফিম তার প্রয়োজনীয়, অমনি সেগুলো অপরিহার্যই হয়ে দাঁড়াবে। যেন কোনটা অপরিহার্য জানতেন না বলে, সে বিষয়ে আচার্যদের মতামত নেন নি বলে ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন বেঠিকভাবে। দেখছেন তো, মিলছে না! পুরুষে ঠিক করে নিয়েছে যে, লালসার পরিতৃপ্তি করা চাই, করা দরকার, কিন্তু মাঝখান থেকে জন্মদান, শিশুর লালনপালন এসে পড়ে বাধা দেয় লালসার পরিতৃপ্তিকে। কী করা দরকার? আচার্যদের

কাছে আবেদন জানানো হোক। ওঁরা বন্দোবস্ত করে দেবেন। তাঁরাও বন্দোবস্ত করে দেন। উঃ, ডাক্তারদের মিথ্যার মুখোস কবে যে খুলে যাবে! তার সময় হয়ে গেছে অনেকদিন! এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, লোকে পাগল হয়ে যায়, নিজেদের গুলি করে মারে। আর এটা না হয়ে উপায় কী? মনে হয় জন্তুজানোয়াররা জানে যে, বংশরক্ষার জন্য বাচ্চার দরকার, আর এ বিষয়ে প্রকৃতির সুপরিচিত নিয়ম মেনে তারা চলে। কথাটা জানে না শুধু মানুষ, জানার ইচ্ছে তার নেই। সে শুধু চায় প্রাণভরে নিজেকে ভোগ করে নিতে। আর সে কে? সে মানুষ, নিখিল চরাচরের অধিপতি। ভেবে দেখুন, একবার নতুন প্রাণীর সৃষ্টি যখন সম্ভব শুধু তখনি পশুরা সহবাস করে, আর নিখিল চরাচরের এই ইতর অধিপতি যখন তখন সহবাস করে, শুধু আনন্দ পাবার জন্য। তার চেয়ে বড়ো কথা, এই বাঁদরামিটাকে সে বলে সৃষ্টির মুকুটমণি, প্রেম। আর প্রেমের নামে, অর্থাৎ এই কুৎসিত জিনিসটার নামে সে কিনা মানুষ-জাতির অর্ধেকটাকে জলাঞ্জলি দেয়। সত্য ও মঙ্গলের পথে যার পুরুষের সহচরী হওয়া উচিত সেই নারীকে উপভোগের তাগিদে শত্রুতে পরিণত করে সে। মানুষের অগ্রগতিকে সর্বত্র কে বাধা দেয় বলুন তো? নারী। আর সে এ রকমটা কেন? শুধু এই জন্য।

হ্যাঁ, হ্যাঁ,' সিগারেট হাতরাতে হাতরাতে ভদ্রলোক বারকয়েক বললেন কথাটা, স্পষ্টত আত্মস্থ হবার চেষ্টায় সিগারেট খেতে লাগলেন।

১৪

স্বর না বদলে তিনি বলে চললেন, 'আমার জীবন-যাত্রাটা ছিল এ রকম শুয়োরের মতো। সবচেয়ে খারাপ যেটা সেটা হল এই: এ রকম ইতরভাবে থেকেও আমি কল্পনা করতাম, অন্য মেয়েদের পটাচ্ছি না, স্ত্রীর কাছে একনিষ্ঠ আছি, তাই আমি নৈতিক আদর্শ-সম্পন্ন মানুষ, আমার কোনো দোষ নেই, দুজনের যদি ঝগড়া হয় তাহলে সেটার জন্য দায়ী আমার স্ত্রী, বা তার স্বভাব।

'কিন্তু দোষটা ওর ছিল না। অন্য মেয়েদের, অন্তত বেশীর ভাগ মেয়েদের মতোই ছিল সে। সে মানুষ হয়েছিল আমাদের সমাজে নারীর স্থান অনুযায়ী যা দরকার, সুতরাং, ওপরের শ্রেণীর মেয়েরা সবাই সেভাবে মানুষ হয়, না হয়ে পারে না। মেয়েদের আধুনিক শিক্ষা নিয়ে আজকাল অনেক কিছু বুকনি শোনা যায়। সব ফাঁপা বুলি। মেয়েদের প্রতি আমাদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি, ভান করা নয়, আসল যা দৃষ্টিভঙ্গি তাতে যা হওয়ার কথা নারী শিক্ষা ঠিক তাই হবে।

'মেয়েদের প্রতি পুরুষের মনোভাবের সঙ্গে তাল রেখে মেয়েদের শিক্ষা চলবে বরাবর। পুরুষেরা কী চোখে মেয়েদের দেখে, আমরা সবাই জানি। "Wein, Weiber und Gesang"* — এই তো হল কবিদের কাকলি। প্রেমের কবিতা আর নগ্ন ভেনাসের থেকে শুরু করে সমস্ত কাব্য, সমস্ত চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের কথা ভেবে দেখুন — সবখানে মেয়েরা হল ভোগের মাল — রাজসভার নাচের আসরে হোক বা ত্রুব্‌নায়া স্কোয়ার অথবা গ্রাচেভ্‌কা স্ট্রীট হোক। আর শয়তানের ধূর্ততার কথাটা ভুলবেন না: যদি রস আর ভোগই হয়, তো বেশ, তাই জানা থাক যে রস, উপভোগ। মেয়েরা একটা রসালো খাদ্য, ব্যস। কিন্তু না, নাইটরা প্রথমে জানালেন মেয়েদের তাঁরা দেবী জ্ঞানে পুজো করেন (পুজো বটে, তবু ভোগের মাল বলে তাদের দেখা হত)। আজকাল পুরুষে বলে বেড়ায় যে মেয়েদের তারা শ্রদ্ধা করে। কেউ-কেউ মেয়েদের জন্য চেয়ার ছেড়ে দেয়, রুমাল পড়ে গেলে তুলে দেয়, অন্যরা স্বীকার করে, যে-কোন পদে, প্রশাসন ইত্যাদিতে, মেয়েদের অধিকার আছে। এ সবই করা হয়, কিন্তু মেয়েদের প্রতি তাদের মনোভাব বদলায় নি।

---

* সুরা, সুন্দরী ও সঙ্গীত।

মেয়েরা হল ভোগের মাল। তাদের শরীর হল আনন্দলাভের উপকরণ মাত্র। আর মেয়েরাও জানে সেটা। একেবারে দাসত্বের সামিল। যে অবস্থায় বহু লোককে জোর করে খাটিয়ে তার ফলভোগ করা একদলের পক্ষে সম্ভব হয়, সেটা দাসত্ব ছাড়া কিছু নয়। অন্যদের জোর করে খাটিয়ে তার ফলভোগ করাটা পাপ বা লজ্জা বুঝে সেটা যখন লোকে আর করতে চাইবে না, তখনি শুধু দাসত্বের অবসান ঘটবে। কিন্তু আসলে যেটা করা হয় সেটা হল এই — দাসত্বের বাহ্যিক রূপ বদলে, গোলাম বেচাকেনা নিষিদ্ধ করে দিয়ে লোকে ভাবে (নিজেদের বিশ্বাসও করায়) দাসত্ব ঘোচানো হয়েছে; তারা দেখে না, দেখতে চায় না যে, দাসত্ব এখনো টিকে আছে, টিকে আছে এজন্য যে অন্য লোকের শ্রমের ফলভোগ করতে তখনো লোকে সমান ইচ্ছুক, সেটাকে ভালো ও ন্যায্য মনে করে তারা। এটাকে ভালো মনে করা মাত্রই সর্বদাই অন্যদের চেয়ে শক্তিশালী ও ধূর্ত কয়েকজন অপরের শ্রম ভোগ করে যাবে। নারীস্বাধীনতা ব্যাপারটাও ঠিক তাই। নিজের সুখের জন্য মেয়েদের ব্যবহার করা উচিত ও বাঞ্ছনীয় ভাবে পুরুষ, সেটাই হল মেয়েদের দাসত্ব। এখন পুরুষ ওদের স্বাধীনতা দিচ্ছে, যতকিছু সমাধিকার দেয়, কিন্তু তখনো মেয়েদের ভোগের মাল

হিসেবে দেখে, শৈশব থেকেই এভাবে তাদের গড়ে তোলা হয় জনমতের মাধ্যমে। মেয়েদের দশা তাই থেকে গেছে ঠিক আগেকার মতো, দীনহীন ব্যভিচারিণী দাসী আর পুরুষেরা আগেকার মতো দাসীর ব্যভিচারী মালিক।

'কলেজে ও আদালতে ওরা মেয়েদের স্বাধীনতা দেয়, কিন্তু ওরা ভোগের মাল, এ মনোভাব বদলায় না। যতদিন মেয়েদের এভাবে নিজেদের দেখতে শেখানো হবে (সে শিক্ষা আমরা দিই), ততদিন ওরা নিচু স্তরের জীব হয়ে থাকবে। হয় তারা কুৎসিত ডাক্তারদের সাহায্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করবে, তার মানে পুরোপুরি বেশ্যায় পরিণত হবে, জন্তুদের স্তরে নয়, বস্তুর স্তরে পেঁছিবে; নয় যেমনটি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সত্যি সত্যি হয় তেমনটি হবে — অসুখী, হিস্টিরিয়াগ্রস্ত, মানসিক বিকারের রোগী, আধ্যাত্মিক বিকাশের সুযোগ তাদের থাকবে না।

'স্কুল, কলেজ এ ব্যবস্থা বদলাতে পারে না। একমাত্র যেটা পারে সেটা হল মেয়েদের বিষয়ে পুরুষের, এবং নিজেদের বিষয়ে মেয়েদের মনোভাবের পরিবর্তন। মেয়েরা যখন কুমারী অবস্থাকে সবচেয়ে উঁচু স্তরের জিনিস বলে মনে করবে, এখনকার মতো লজ্জা ও নিন্দের জিনিস নয়, তখনি শুধু অবস্থার

পরিবর্তন ঘটবে। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন যতই শিক্ষিতা হোক না কেন, প্রত্যেকটি মেয়ের লক্ষ্য হবে যত পারে বেশী পুরুষকে আকর্ষণ করা, যত পারা যায় মর্দা জোটানো, তাদের মধ্য থেকে যাতে কাউকে বাছাই করার সুযোগ পাওয়া যায়।

'গণিতের জ্ঞান হয়ত একজনের ভালো আছে, বীণায় অন্যের হাত ভালো, কিন্তু অবস্থার এতটুকু হেরফের হয় না তাতে। কোনো পুরুষকে বাগাতে পারলে শুধু তখনি মেয়েরা সুখী, সেটাই তাদের মোক্ষলাভ। আর তাই, জীবনে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল পুরুষ ধরার ক্ষমতা অর্জন করা। এমনটি আছে এবং থাকবে। আমাদের সমাজে কথাটা খাটে অবিবাহিতা ও বিবাহিতা, দুজনের বেলায়। পছন্দমতো বাছাই করার জন্য এটা করতে হয় অবিবাহিতাদের; বিবাহিতারা করে স্বামীর ওপর ক্ষমতা বিস্তারের জন্য।

'এটা থামিয়ে দেয় — অন্তত খানিকটা দাবিয়ে রাখে — শুধু একটি জিনিস — শিশু, তাও যদি তারা রাক্ষসী না হয়, মানে যদি বাচ্চাদের নিজেদের দুধ খাওয়ায়। কিন্তু আবার ডাক্তাররা নাক গলান।

'আমার স্ত্রী বাচ্চাদের নিজের দুধ খাইয়ে মানুষ করতে চেয়েছিল, পরের পাঁচটির বেলায় সেটা করে;

কিন্তু প্রথম সন্তানের জন্মের পর তার শরীরটা ভালো ছিল না। ডাক্তাররা এসে নির্লজ্জভাবে ওর জামাকাপড় খুললেন, সর্বাঙ্গ টিপেটুপে দেখলেন (এর জন্য তাঁদের আমার ধন্যবাদ ও ফি দেবার কথা), এই সব মাননীয় ডাক্তাররা বললেন যে, বাচ্চাটিকে নিজের দুধ খাওয়ানো আমার স্ত্রীর উচিত নয়; অতএব ছেনালির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র উপায় থেকে সে প্রথমটা বঞ্চিত হল। স্তন্যদায়ী নার্স রাখা হল, অর্থাৎ একটি অপরিচিতার দারিদ্র্য, অভাব ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে লোভ দেখিয়ে নিজের বাচ্চা থেকে সরিয়ে তাকে দেওয়া হল আমাদের সন্তানকে, এবং সেজন্য তার মাথায় চাপানো হল ফিতে দেওয়া টুপি। যাকগে, এটা অপ্রাসঙ্গিক। কথাটা হল, আঁতুরঘর থেকে আমার স্ত্রী যখন বেরিয়ে এল, বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর দায় থেকে মুক্তি পেল, ঠিক তখনই ভেতরকার সুপ্ত ছেনালি দ্বিগুণ শক্তিতে ফেটে পড়ল। আর তার ছেনালির সমানুপাতে আমাকে পাগল করে দিল ঈর্ষা, আমার বিবাহিত জীবনের সর্বক্ষণ সে ঈর্ষা আমাকে মুহূর্তের জন্য শান্তিতে থাকতে দেয় নি; যারা স্ত্রীদের সঙ্গে আমার মতো থাকে, অর্থাৎ নৈতিকতার বালাই রাখে না, ঈর্ষার যন্ত্রণা না পেয়ে তাদের উপায় নেই।'

১৫

'সারা বিবাহিত জীবনে এক মিনিটের জন্যও ঈর্ষার জ্বালা থেকে মুক্তি পাই নি। কিন্তু সময়ে সময়ে আমার যন্ত্রণাটা বিশেষ তীক্ষ্ন হত। তেমন একটি সময় হল প্রথম সন্তানের জন্মের পর, যখন ডাক্তাররা নিজের দুধ খাওয়াতে বারণ করে দিলেন আমার স্ত্রীকে। সে সময়ে আমার ঈর্ষা বিশেষ বেড়েছিল। তার কারণ, প্রথমত, আমার স্ত্রী সেই উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে গেল, যে উৎকণ্ঠা প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিকে বিনা কারণে বাধা দিলে প্রত্যেক মায়ের হয়; দ্বিতীয়ত, এত স্বচ্ছন্দে সে মায়ের নৈতিক দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দিল যে, সেটা দেখে আমি ন্যায্যত (হয়ত অজ্ঞাতসারে) ধরে নিলাম যে, ও ঠিক এমনি স্বচ্ছন্দে দাম্পত্যের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে পারে; সেটা আরো এজন্য যে, ওর তবিয়ৎ ছিল একেবারে বহাল, আর মাননীয় ডাক্তারদের নিষেধ সত্ত্বেও পরে অন্য বাচ্চাদের নিজের দুধ খাইয়ে ভালোই মানুষ করেছিল।'

'ডাক্তারদের ওপর আপনি বেজায় চটা দেখছি,' আমি মন্তব্য করলাম। দেখছিলাম যতবার ডাক্তারদের উল্লেখ উনি করছেন, ততবার গলায় আসছে বিদ্বেষের একটা বিশেষ আভাস।

'ওদের ওপর চটা না চটার প্রশ্ন নয়। ওরা আমার জীবনটা ছারখার করে দিয়েছিল, যেমন হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোকের বেলায় করে, আর কার্যকারণ আলাদা করে দেখতে আমি পারি না। জানি ওরা, উকিল এবং অন্যদের মতো, যতটা পারে টাকা আদায় করে নিতে উদগ্রীব; আয়ের অর্ধেকটা দিয়ে আমার পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপ করাটা, তার ত্রিসীমায় ওদের আসাটা বন্ধ করা যদি যেত তাহলে সানন্দে তাই করতাম (যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁদের প্রত্যেকে এটা করতেন)। আমি হিসেব জোগাড় করি নি, কিন্তু অনেক অনেক ক্ষেত্রে (সংখ্যায় অগণন এগুলি) জানি ডাক্তাররা মায়ের প্রসব ক্ষমতা নেই ঘোষণা করে (যদিও পরে সে অক্লেশে অন্যান্য শিশুর জন্ম দিয়েছে) হয় গর্ভস্থ শিশুকে হত্যা করেছে নয় কোনো কিছু একটা অস্ত্রোপচার করে মেরেছে মাকে। এভাবে মেরে ফেলাকে খুন বলা হয় না, ঠিক যেমন মধ্যযুগে ইনকুইজিশনের হত্যাকাণ্ডকে খুন বলা হত না, সেগুলো মানব কল্যাণের জন্য করা হয় ধরে নেওয়া হত। ডাক্তারদের কৃত পাপ অসংখ্য, হিসেবের বাইরে। কিন্তু বিশেষ করে স্ত্রীলোকের মাধ্যমে, জড়বাদের যে দুর্নীতি তারা পৃথিবীতে আনে তার তুলনায় এ সব পাপ নগণ্য। তাছাড়া, ওদের পরামর্শ মেনে চললে,

মানুষের সঙ্গে এক হবার চেষ্টা না করে মানুষের কাছ থেকে সরে থাকার তালে আমরা থাকব, কেননা সবায়ের, সবকিছুর মধ্যে তো ছোঁয়াচের সম্ভাবনা; ওদের উপদেশ অনুযায়ী আমাদের প্রত্যেককে কারবোলিক এ্যাসিডের আরক মুখে নিয়ে একলা বসে থাকা উচিত (অবশ্য, হালে দেখা গেছে এটা কোনো কাজ দেয় না)। কিন্তু সেটাও কিছু নয়। আসল কথাটা হল ওরা লোকজনকে, বিশেষত মেয়েদের, খারাপ করে দেয়।

'আজকাল বলা যায় না, "ওহে, তোমার ধরন-ধারন মন্দ দেখছি, শোধরাবার চেষ্টা করো।" কথাটা না বলা যায় নিজেকে না অন্যকে। ধরন-ধারন খারাপ? তার মূলে স্নায়বিক ব্যবস্থার কোনো বিপর্যয় বা ওই গোছের কিছু একটা, আর তাই যাও ডাক্তারের কাছে; তারা পঁয়ত্রিশ কোপেকের ওষুধ দেবে, সেটা না খেলে চলবে না। ধরন-ধারন আরো খারাপ হল আবার ডাক্তারের কাছে যাও, খাও আরো ওষুধ। চমৎকার তামাসা!

'যাকগে, এটা অবান্তর। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম আমার স্ত্রী পরে অন্য বাচ্চাদের নিজের দুধ খাওয়ায় বেশ ভালোভাবে; তার গর্ভাবস্থা ও বাচ্চাদের দুধ খাইয়ে বড়ো করার সময়টাতে শুধু ঈর্ষার তাড়না থেকে আমি মুক্তি পেতাম। তা না হলে,

সবকিছু ঘটত অনেক আগে। তাকে আর আমাকে রক্ষা করেছিল সন্তানেরা। আট বছরে ওর পাঁচটি ছেলে হয়। আর প্রত্যেকটিকে নিজের দুধ খাইয়ে বড়ো করে।'

'ওরা এখন কোথায়, আপনার ছেলেমেয়েরা?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ছেলেমেয়েরা?' ভয়ার্ত মুখে কথাটার পুনরুক্তি তিনি করলেন।

'মাপ করবেন; ওদের কথা মনে হলে হয়ত আপনার কষ্ট হয়।'

'না, কিছু নয়। আমার শালা আর শালী ওদের নিয়ে গিয়েছে। আমার কাছে রাখতে দিল না ওদের। আমি ওদের সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দিলাম, কিন্তু ওরা ছেলেমেয়েদের রাখতে দিল না আমাকে। আমাকে পাগল মনে করা হয় কিনা। আমি তো এই ওদের দেখে আসছি। ওদের দেখলাম, কিন্তু আমাকে আর ফিরিয়ে দেবে না। বাপ-মায়ের মতো যাতে না হয় সেভাবে আমি ওদের মানুষ করতাম, কিন্তু ওই রকমই ওদের হতেই হবে। কী করা যায়, বলুন? আমাকে ওদের দেবে না, আমাকে ওরা বিশ্বাস করে না, সেটা তো স্বাভাবিক। আর ওদের মানুষ করার ক্ষমতা আমার হবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। মনে হয়

পারব না। আমার সব ছারখার হয়ে গেছে, ভেঙেচুরে গিয়েছি। কিন্তু একটা জিনিস আমার আছে — জ্ঞান। হ্যাঁ, আমি এমন সব জিনিস জানি যেগুলো শিখতে অন্যদের বহু বছর কেটে যাবে।

'হ্যাঁ, ছেলেমেয়েরা বেঁচে আছে, অন্য সবায়ের মতোই বর্বর হয়ে বেড়ে উঠছে। ওদের দেখেছি — তিন বার দেখেছি। ওদের জন্য কিছু করার উপায় নেই আমার। কিছু নেই। এখন দক্ষিণে যাচ্ছি। সেখানে আমার একটা ছোট্ট বাড়ি ও বাগান আছে।

'হ্যাঁ, আমি যা জানি সেটা শিখতে অন্যদের অনেক সময় লাগবে। সূর্যে আর নক্ষত্রে কতটা লোহা, অন্যান্য ধাতু কতটা আছে বের করতে বিশেষ সময় লাগে না। কিন্তু আমাদের পাশবিকতা যা খুলে ধরে, তা বোঝা কঠিন, বড়ো কঠিন সেটা...

'আপনি অন্তত আমার বক্তব্যটা শুনছেন। সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।'

১৬

'ছেলেমেয়েদের কথাটা আপনি তুলেছেন। আর সত্যি, ছেলেমেয়েদের নিয়ে কী ভয়ংকর মিথ্যার বেসাতি! ওরা হল আনন্দের উৎস! ওরা হল ঈশ্বরের আশীর্বাদ! মিছে কথা সব! এরকমটা ছিল এককালে,

কিন্তু এখন ব্যাপারটা আলাদা। ওরা হল যন্ত্রণার উৎস, আর কিছু নয়। বেশীর ভাগ মায়েরা এটা স্পষ্ট বোধ করে, মাঝে মাঝে অসতর্ক মুহূর্তে স্পষ্ট বলে ফেলে। আমাদের মহলের অভিজাত মায়েদের জিজ্ঞেস করুন, বেশীর ভাগ বলবে, তারা বাচ্চা চায় না, পাছে বাচ্চাদের অসুখ করে, তারা মরে যায়, এই ভয়। আর বাচ্চা হলে বুকের দুধ খাওয়াতে তাদের অনিচ্ছা, পাছে বাচ্চার ওপর টান জন্মে যায়, যন্ত্রণা পেতে হয়। শিশুর লাবণ্যে তাদের যা আনন্দ — তার ক্ষুদে হাত পা আর শরীর, তার যাকিছু আমাদের আনন্দ যোগায় তা তার ব্যাধিশোক, মৃত্যুশোক তো দূরের কথা, এমনকি অসুখ হতে পারে, মারা যেতে পারে, এই আশঙ্কার তুলনায়ও কম। বাচ্চা হবার সুবিধে অসুবিধে ওজন করে দেখলে অসুবিধের ভার বেশী মনে হয়, সেজন্য বাচ্চা না হওয়াটা ভালো। এটা মেয়েরা বলে সোজাসুজি, বিনা সঙ্কোচে, তারা মনে করে বাচ্চাদের প্রতি অনুরাগ থেকে আসে তাদের এ মনোভাব, আর মনোভাবটা ভালো, প্রশংসনীয়, সেজন্য তাদের গর্ব। ওরা বোঝে না, এভাবে চিন্তা করাটা প্রেমের অস্বীকৃতি, স্বার্থপরতার প্রকাশ শুধু। বাচ্চার মাধুর্য আনন্দ যোগায়, কিন্তু তাদের নিয়ে আশঙ্কার তুলনায় সেটা কম, আর তাই

মেয়েরা বাচ্চা চায় না, হলে তো টান জন্মে যাবে। আদরের জিনিসের জন্য স্বার্থত্যাগ তারা করে না, আদরের জিনিস যেটি হতে পারে তাকে ত্যাগ করে নিজেদের স্বার্থের খাতিরে।

'এটা যে অনুরাগ নয় সেটা স্পষ্ট, এটা স্বার্থপরতা। কিন্তু স্বার্থপরতার জন্য বড়লোক মায়েদের দোষ দেওয়া কঠিন — অভিজাত সমাজে ফের ওই সব ডাক্তারদের কল্যাণে সন্তানদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মেয়েদের কতটা যন্ত্রণা সইতে হয় (ডাক্তারদের কৃপায়) ভাবলে কোনো প্রতিবাদ মুখে আসে না। প্রথম দিককার সে সব দিনে তিন চারটি ছেলেপুলের জন্য আমার স্ত্রীর এক মুহূর্ত অবকাশ মিলত না, সমস্ত শক্তি যেত তাদের পালনে, সে সময়ে তার জীবন ও মানসিক অবস্থার কথা মনে পড়লে এখনো গা শির শির করে ওঠে। আমাদের জীবন বলে কিছু ছিল না। বিপদের আশঙ্কা বিরামহীন, বিপদ থেকে মুক্তির মতো হল, আবার ফিরে এল বিপদ, সেটাকে ঠেকাবার মরিয়া চেষ্টা, আবার মুক্তির সম্ভাবনা — ডুবন্ত জাহাজে থাকার মতো ব্যাপার। মাঝে মাঝে মনে হত সবটা ইচ্ছে করে বানানো, আমার ওপর তার জয়লাভটা সুনিশ্চিত করার জন্য ছেলেমেয়ের মঙ্গল সম্বন্ধে উৎকণ্ঠার ভান করে স্ত্রী। সমস্ত কিছু নিজের সুবিধে মতো সমাধান

করার সহজ, লোভনীয় অস্ত্র এটি। মাঝে মাঝে কল্পনা করতাম এ ব্যাপারে ও যা বলে, যা করে সমস্ত কিছুর পেছনে ভণ্ডামী। কিন্তু সেটা ভুল। সত্যি সত্যি ও ভীষণ উদ্‌ব্যস্ত থাকত, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য আর রোগ নিয়ে উৎকণ্ঠার বিরাম হত না। ব্যাপারটা যন্ত্রণাকর ছিল ওর পক্ষে, আমারো কাছে। আর যন্ত্রণা না পেয়ে ওর উপায় ছিল না। ছেলেমেয়েদের বিষয়ে ওর ভাবনাচিন্তা, তারা খাবে, সোহাগ করতে হবে তাদের, আগলে রাখতে হবে, এই জান্তব উৎকণ্ঠা বেশীর ভাগ মেয়েদের মতো তারো মধ্যে প্রবল ছিল, কিন্তু জন্তুজানোয়ারদের যে জিনিসটার বালাই নেই, সেটি তার ছিল — চিন্তা ও কল্পনা শক্তি। ছানার কী হতে পারে তা নিয়ে মুরগী ভয় পায় না, তার জানা নেই ছানার কত না রোগ হতে পারে, জানা নেই রোগ ও মৃত্যু নিবারণ করার — অন্তত লোকেরা তাই ভাবে — কত না চিকিৎসা আছে। আর তাই ছানাকে নিয়ে যন্ত্রণায় ভোগে না মুরগী। মুরগীর যা স্বভাব, ছানার জন্য তা সে করে, সানন্দে করে। তার কাছে বাচ্চা হল আনন্দের উৎস। বাচ্চার অসুখ হলে ঠিক কী করা উচিত তার জানা: বাচ্চাকে খাওয়ায়, গরম রাখে। আর সেটা করে ও জানে, যা দরকার সব করা হচ্ছে। বাচ্চা যদি মরে, তাহলে কেন মরল, কোথায় গেল

জিজ্ঞেস করে না; কিছুক্ষণ ডাকে, তারপর সামলে উঠে আগেকার মতো করে বেঁচে থাকে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগা মেয়েদের পক্ষে ব্যাপারটা তা নয়, নয় আমার স্ত্রীর কাছে। শিশু শিক্ষা ও লালনপালনের অসংখ্য বিচিত্র ও অবিরাম পরিবর্তিত নিয়ম-কানুন তার শোনা ও পড়া, শিশু রোগ ও চিকিৎসা-পদ্ধতির কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। ওদের এটা খাওয়াতে হবে, এভাবে খাওয়াতে হবে; না, এভাবে নয়, ওটা নয়, সেটা। ওদের খাওয়ানো, পরানো, স্নান করানো, শোওয়ানো, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, হাওয়া খাওয়ানোর বিষয়ে নতুন নতুন নিয়ম প্রতি সপ্তাহে আমরা বের করতাম, বিশেষ করে আমার স্ত্রী। যেন শিশুরা জন্মাতে শুরু করেছে মাত্র কাল থেকে। একটার অসুখ হল, নিশ্চয় ওকে ঠিক খাওয়ানো হয় নি, হয়ত ঠিক স্নান করানো হয় নি, বা ঠিক সময়ে করা হয় নি; এক কথায়, যেটা করা উচিত সেটা করে নি বলে বাচ্চার অসুখের জন্য আমার স্ত্রী দায়ী।

'এ তো হল বাচ্চারা ভালো থাকার সময়ের ব্যাপার। অসুখ হলে তো দফা রফা। একেবারে নরক যন্ত্রণা। ধরে নেওয়া হয় যে, অসুখ সারানো যায়, বিজ্ঞানের তেমন একটি শাখা আছে তার জন্য। আছে তেমন লোক, অর্থাৎ ডাক্তার, তারা সব জানে। সবাই অবশ্য

জানে না, কিন্তু সেরা যারা, তারা জানে। আর তাই, বাচ্চার অসুখ হয়েছে, অতএব সেরা ডাক্তারকে বের করতে হবে, বের করতে হবে তাকে যে রোগ সারাতে জানে, তাহলেই বাচ্চাটি পার পাবে; কিন্তু বিশেষ ডাক্তারটিকে যদি পাওয়া না যায়, কিম্বা তিনি যেখানে থাকেন, সেখানে যদি আমরা না থাকি, তাহলে বাচ্চাটির আর রক্ষে নেই। এটা যে শুধু আমার স্ত্রীর ধারণা তা নয়; আমাদের গণ্ডির সব মেয়েদের ধারণা এক, চারপাশ থেকে আমার স্ত্রী এ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেত না: ইভান জাখারিচকে সময় মতো ডাকে নি বলে ইয়েকাতেরিনা সেমিওনভনার দুটি বাচ্চা মারা গেল; মারিয়া ইভানভনার বড়ো মেয়েকে ইভান জাখারিচ বাঁচিয়েছেন; ডাক্তারের পরামর্শ মতো পেত্রোভরা হোটেলে চলে গেলেন, বাচ্চাগুলো বেঁচে গেল; হোটেলে না চলে গেলে তারা মারা পড়ত। অমুক-অমুকের বাচ্চাটা ভয়ানক রোগা, ডাক্তার বলল দক্ষিণে নিয়ে যেতে, বাচ্চাটা তাই বেঁচে গেল। যে-কোন জানোয়ারের মতো আমার স্ত্রী বাচ্চাদের কল্যাণ নিয়ে ভাবিত, ঠিক সময় মতো কোনো একটা বিষয়ে ইভান জাখারিচের বলার ওপর তাদের জীবন নির্ভর করছে, এই যখন অবস্থা, তখন ক্রমাগত উৎকণ্ঠিত ও উত্যক্ত না হয়ে আমার স্ত্রীর উপায় কী! কিন্তু কেউ জানে না ইভান জাখারিচ

কী বলবেন, সবচেয়ে কম জানেন তিনি নিজে, বিশেষ ভালো করেই জানেন, তিনি কিছু জানেন না, কারো কিছু করতে পারেন না; কিন্তু কিছু একটা তিনি জানেন এই আস্থা লোকে যাতে না হারায়, সেজন্য তিনি শুধু যেমন যে গতিক দেখেন, তেমনি চাল দেন। শুধু মাত্র প্রাণী হলে আমার স্ত্রীকে এরকম যন্ত্রণা ভোগ করতে হত না; আর সম্পূর্ণভাবে মানুষ হলে ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে ধর্মভীরুদের মতো সে বলত, ভাবত, "ভগবান দেন, ভগবান নিয়ে নেন; ভগবানের হাতে সব।" ভাবত সবায়ের মতো, তার সন্তানদেরও জীবন ও মৃত্যু ভগবানের হাতে, মানুষের হাতে নেই, সন্তানদের ব্যাধি ও মৃত্যু আটকানোর সাধ্য তার ছিল, সেটা সে করে নি, এই ভেবে যন্ত্রণা পেত না সে। কিন্তু তার চোখে ব্যাপারটা ছিল এরকম: সবচেয়ে দুর্বল ও ভঙ্গুর প্রাণীর ভার তার হাতে, অসংখ্য রোগ তাদের আক্রমণ করতে পারে; প্রাণীগুলির প্রতি তার প্রবল, জান্তব অনুরাগ; তাদের ভার তার ওপর, অথচ তাদের রক্ষা করার উপায় আমাদের অজানা, জানে শুধু একেবারেই বাইরের কয়েকটি লোক, তাদের সাহায্য ও পরামর্শ পাওয়া যায় কেবল বিস্তর অর্থব্যয়ে, তাও সব সময়ে নয়।

'সন্তানদের নিয়ে আমার স্ত্রীর সমস্ত জীবনে আনন্দ

ছিল না, ছিল যন্ত্রণা, ফলে আমারো কাছে তাই। যন্ত্রণা না পেয়ে উপায়? অবিরাম মনঃপীড়ায় তার কাটত। ঈর্ষার দর্ন ঝগড়া বা সাধারণ কোনো কথা কাটাকাটির পর হয়ত আশা হল এবার একটু শান্তি পাব, ইচ্ছে হল বই পড়ি, ভাবি, কিন্তু কিছ্ করতে না করতে খবর এল ভাসিয়া বমি করেছে, বা মাশার পাইখানায় রক্তের ছিটে, কিম্বা আন্দ্রেই-এর গায়ে গ্রুটি বেরিয়েছে — ব্যস, আমার সব আশা সেখানে খতম। কোথায় ছ্টোছ্টি করতে হবে, কোন ডাক্তারকে ডাকতে হবে? বাচ্চাকে কোথায় আলাদা রাখতে হবে? তারপর ওষ্ধপত্র, থার্মোমিটর, ড্যুশ, ডাক্তার... একটা শেষ হতে না হতে আর একটা শ্র্ হয়ে যেত। স্বাভাবিক, পাকাপোক্ত পারিবারিক জীবন বলে কিছ্ ছিল না। আগে তো বলেছি, ছিল শ্ধ্ বাস্তব ও কাল্পনিক বিপদ থেকে নিজেদের অবিরাম রক্ষা করা। বেশীর ভাগ পরিবারে এখন অবস্থাটা এ রকম; আমাদের বেলায় সেটা ছিল আরো বেশি। আমার স্ত্রী বাচ্চাদের বড়ো বেশী স্নেহ করত, লোকের কথায় কান দিত বড়ো বেশী।

'তাই বাচ্চা হওয়াতে আমাদের জীবনে কোনো উন্নতি এল না, বরং বিষিয়ে গেল। তাছাড়া তারা ঝগড়াঝাঁটির নতুন ইন্ধন হয়ে দাঁড়াল। জন্মাবার সঙ্গে

সঙ্গে দেখা গেল এটা, ওদের বয়স যত বাড়ল তত বেশী করে ওরাই ঝগড়াঝাঁটির উপলক্ষ্য ও উপায় হতে লাগল। ঝগড়াঝাঁটির উপলক্ষ্য শুধু নয়, লড়াই-এর হাতিয়ারও। বাচ্চাদের নিজের দলে ভিড়িয়ে দুজনে দুজনের সঙ্গে লড়াই চালাতাম যেন। দুজনের এক একটি পেয়ারের বাচ্চা ছিল, লড়াই-এর হাতিয়ার। আমি সাধারণত লড়তাম বড়ো ছেলে ভাসিয়াকে নিয়ে আর আমার স্ত্রী লিজাকে নিয়ে। তাছাড়া, ওরা বড়ো হল, চরিত্রের বিকাশ ঘটল, সঙ্গে সঙ্গে মিত্রপক্ষ হবার মতো লোক হয়ে দাঁড়াল ওরা, আমরা চেষ্টা করতাম ওদের নিজের দলে টানার। বেচারীদের দুর্ভোগের অন্ত ছিল না এর জন্য, কিন্তু আমাদের নিরন্তর সংগ্রামে ওদের কথা ভাবার সময় ছিল না আমাদের। মেয়েটি আমার দলে, বড়ো ছেলেটি (তাকে দেখতে আমার স্ত্রীর মতো, তার আদুরে ছিল সে) আমার স্ত্রীর পক্ষে, প্রায়ই তাকে দেখে রাগ হত।'

১৭

'এভাবেই দিন কাটছিল। আমাদের সম্পর্ক উত্তরোত্তর শত্রুর মতো হয়ে দাঁড়াল। শেষের দিকে মতভেদের জন্য যে শত্রুতা হত তা নয়, শত্রুতার জন্য মতভেদ হত। আমার স্ত্রী যাই বলুক, আগে থেকেই

তাতে আপত্তি থাকত আমার; তারো ব্যবহারটা ছিল ঠিক এরকম।

'চতুর্থ বছরে নিজে থেকেই আমরা যেন ঠিক করে নিলাম যে, পরস্পরকে আমরা বুঝতে পারব না, মতের মিল কখনো হবে না। বোঝাপড়ার চেষ্টা ছেড়ে দিলাম। অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপারে, বিশেষ করে বাচ্চাদের নিয়ে হলে, আমরা নিজেদের মতামত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকতাম। এখন মনে হয়, আমি যে মতামত জাহির করতাম সেগুলো খুব জরুরী ছিল না আমার কাছে, বরবাদ করতে পারতাম সেগুলোকে; কিন্তু ওর মতামত তো অন্য, তাই বরবাদ করা মানে ওর কাছে হার মানা। সেটা আমি পারি না। ও-ও পারে না। হয়ত ও ভাবত যে, সর্বদা ও-ই চুলচেরা ঠিক; আর ওর তুলনায় আমিই যে দেবদুর্লভ, তা নিয়ে আমারও কোনো সন্দেহ ছিল না। দুজনে একলা থাকলে চুপচাপ থাকা ছাড়া উপায় ছিল না, আর কথাবার্তা হলে সেটা, আমার বিশ্বাস, এমন স্তরের হত যা জন্তুজানোয়াররা চালাতে পারে: "কটা বেজেছে? ঘুমোবার সময় হয়েছে। আজকে ডিনারে কী খাবার? কোথায় যাবো? কাগজে কী বেরিয়েছে? ডাক্তার ডাকতে হবে, মাশার গলায় ব্যথা।" কথাবার্তার এই অসম্ভব সংকীর্ণ গণ্ডি একচুল ডিঙোলে বিরক্তির অন্যথা হত না। দারুণ চটে

উঠতাম দুজনে, কফি, টেবিলের ঢাকনা, গাড়ি, তাসের কোনো চাল নিয়ে চলত বিষোদ্গার, যদিও ওর বা আমার কাছে এ সবের লেশমাত্র মূল্য থাকা সম্ভব ছিল না। আমার বিষয়ে অন্তত বলতে পারি, ওর প্রতি আমার বিদ্বেষ মাঝে মাঝে ভয়ংকর রূপ নিত। ও হয়ত চা ঢালছে, পা দোলাচ্ছে, চামচ মুখে দিচ্ছে বা সুরুৎ করে চা খাচ্ছে, দেখে দেখে ওর ধরনটায় ঘেন্না ধরে যেত, যেন ধরনটা মহাপাপ। সে সময়ে খেয়াল হয় নি যে, তথাকথিত প্রেমের পালার পরই অনিবার্য ও নিয়মিতভাবে আসত আমার ঘৃণার পালা। প্রেমের পালা, তারপর ঘৃণার; দুর্বলগোছের প্রেমের পালা, অলপক্ষণ ঘৃণার; প্রেমের পালা তীব্র হলে দীর্ঘস্থায়ী ঘৃণার। তখন দুজনে বুঝি নি, এই প্রেম আর এই ঘৃণা হল একই জান্তব অনুভূতির এপিঠ ওপিঠ। সত্যিকার অবস্থাটা আমাদের কাছে ধরা পড়লে এভাবে জীবন কাটানো হত ভয়াবহ, কিন্তু তখন বুঝতে পারি নি, প্রকৃত অবস্থাটা চোখে পড়ে নি। মানুষের পরিত্রাণ ও শাস্তি, দুইই এই ব্যাপারে যে: মানুষের জীবনযাত্রা যত ভুলই হোক না কেন, সে সেটা নিজের কাছ থেকে গোপন রাখতে পারে, নিজের অবস্থার ট্রাজেডি ঢেকে রাখতে পারে। আমরাও তাই করেছিলাম। কেবলি ব্যস্ত থেকে, সংসারের নানা ধকলে — ঘর সাজানোয়,

নিজের ও ছেলেমেয়েদের সাজগোজে, পড়াশোনায়, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের তদারকে ও চেষ্টা করত ভুলে থাকতে। নিজের নেশার নানা উপকরণ ছিল আমার -- চাকরির নেশা, শিকারের নেশা, তাসের নেশা। আমরা দুজনে ব্যস্ত থাকতাম সর্বক্ষণ। দুজনে ভাবতাম, যত বেশী ব্যস্ত, তত বেশী পরস্পরের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার সুযোগ। ওকে মনে মনে বলতাম, "ওরকম মুখ করাটা তোমার তো সাজে, বিছছিরি কাণ্ড বাধিয়ে সারা রাত জ্বালিয়েছ, আর এখন আমাকে যেতে হবে বৈঠকে।" আর ও শুধু মনে মনে নয়, শুনিয়ে বলত, "তোমার আর কী, ছেলেকে নিয়ে সারা রাত চোখের পাতা এক করতে পারি নি।"

'আর এভাবে চলল আমাদের জীবন, কুয়াসার ঘোরে আমাদের প্রকৃত অবস্থাটা আমাদের চোখে পড়ে নি। পরে যা ঘটেছিল সেটা না ঘটলে অনেক, অনেক দিন এইভাবেই বেঁচে থাকতাম, মরার সময় ভাবতাম যে, জীবনটা ভালোভাবেই কেটেছে, খুব ভালো না হলেও তেমন খারাপ নয়, — সবার যেমন কাটে। কখনো ধরা পড়ত না কী অপার দুরবস্থা ও জঘন্য মিথ্যার পাঁকে গড়াগড়ি খাচ্ছিলাম।

'একই শেকলে আবদ্ধ, বেড়ি-পরা দুই কয়েদী, শত্রুর মতো ছিলাম আমরা, দুজনে দুজনের জীবন

বিষিয়ে দিতাম, তবু সেটা স্বীকার করতে চাইতাম না। তখনো খেয়াল হয় নি, স্বামীস্ত্রীর শতকরা নিরেনব্বই জন ঠিক এভাবে নরকবাস করে, তা না হয়ে উপায় নেই। সে সময়ে নিজের এবং অন্যদের বিষয়ে এ কথাটা জানা ছিল না।

'অদ্ভুত, জীবনে কী যোগাযোগ না ঘটে, তা সে লোকে ঠিকভাবে থাক বা ভুলভাবে থাক! জীবন অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন অবস্থায় বাপ-মায়ে পেঁছিলে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য সহরে যাওয়াটা দরকার হয়ে পড়ে। আমরাও এই আবশ্যিকতার মুখোমুখি হলাম, সহরে যেতে হবে।'

চুপ করে গেলেন ভদ্রলোক, সেই অদ্ভুত আওয়াজটি দুবার করলেন, এখন সে আওয়াজ একেবারে চাপা কান্নার মতো। একটা স্টেশনের কাছে এসে পড়েছি।

'কটা বাজে?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

ঘড়ি দেখলাম। দুটো।

'আপনার ক্লান্ত লাগছে না?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'না, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই ক্লান্ত।'

'দম বন্ধ হয়ে আসছে। যাই, একটু, জল খেয়ে আসি।'

টলতে টলতে করিডর হয়ে তিনি চলে গেলেন।

একা বসে ভদ্রলোক যাকিছু বলেছিলেন, ভেবে দেখলাম। চিন্তায় এত মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম যে, অন্য দিকের দরজা হয়ে কখন যে তিনি ফিরে এলেন টের পাই নি।

১৮

'হ্যাঁ, কথার খেই হারিয়ে যায়,' ভদ্রলোক শুরু করলেন। 'নতুন করে অনেক ভেবেছি, অনেক জিনিস আলাদা চোখে দেখি এখন, আর এ সবকিছু ইচ্ছে হয় বলি অন্যদের। হ্যাঁ, আমরা সহরে বাস শুরু করলাম। অসুখী যারা, তাদের পক্ষে সহরে থাকা ভালো। নিজে মরে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে এটা না বুঝে একশ বছর সহরে বেঁচে থাকা যায়। "আত্মানং বিদ্ধি"র কোনো অবকাশ থাকে না। প্রত্যেকে বেজায় ব্যস্ত। কাজকর্ম, সামাজিক যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, চারুশিল্প, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য, তাদের শিক্ষাদীক্ষা। আজ অমুককে আপ্যায়িত করতে হবে; কাল অমুকের বাড়ি না গেলে নয়। এটা দেখতে হবে, ওটা শুনতে হবে। সহরে হামেশা একজন তো বটেই, এমনকি গোটা দুই তিনেক এমন খ্যাতনামা ব্যক্তি থাকেন যাঁদের অবহেলা করা চলে না। নিজের বা এর ওর চিকিৎসার দরকার; মাস্টার মশাই আছেন, আছেন গৃহশিক্ষক ও গভার্নেস; ওদিকে জীবনটা

একেবারে ঢনঢনে। এভাবে চলল আমাদের জীবনযাত্রা, এক-সাথে থাকার যন্ত্রণার কিছু উপশম হল। তাছাড়া, প্রথম কটা মাস নতুন বাড়িতে, নতুন সহরে গুছিয়ে বসা ও সহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে সহরে যাওয়া আসার চমৎকার কাজে দুজনে ব্যাপৃত রইলাম।

'একটা শীত কাটল, দ্বিতীয় শীতে এমন একটা জিনিস ঘটল যেটা মনে হল অত্যন্ত তুচ্ছ ও নগণ্য, সেটা কিন্তু শেষে যা ঘটেছিল তার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।

'আমার স্ত্রীর শরীর ভালো যাচ্ছিল না, হতচ্ছাড়াগুলো বলল, ওর আর সন্তান হলে চলবে না, জন্ম নিরোধের উপায় ওকে বাতলে দিল। ব্যাপারটা আমার মনে হল ন্যক্কারজনক। যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম ঠেকাতে, কিন্তু ও লঘুচিত্তে নিজের জেদ ধরে রইল, আমি মেনে নিলাম। আমাদের জান্তবতার শেষ সাফাইটুকু, অর্থাৎ সন্তানের জন্ম, আর রইল না। জীবন হয়ে দাঁড়াল আগের চেয়ে অনেক জঘন্য।

'চাষী বা মজুরের ছেলেপুলে দরকার; অন্নসংস্থান করা অত্যন্ত কঠিন হতে পারে, কিন্তু তবু ছেলেপুলে ওদের দরকার; তাই ওদের দাম্পত্য জীবনের একটা ওজর আছে। কিন্তু আমাদের মতো লোকের, ছেলে যাদের আছে, তাদের আর বেশি ছেলে চাই না, সে

কেবল বাড়তি ঝামেলা, ভবিষ্যতে সম্পত্তি ভাগাভাগি, ওরা হল বোঝা। আর তাই আমাদের জান্তবতার কোনো ওজর নেই। হয় কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিরোধ আমরা করি, নয় ওদের দেখি দুর্ভোগ হিসেবে, অসাবধানের পরিণাম হিসেবে; এ মনোভাবটা হল আরো ঘৃণ্য। ওজর নেই কোনো। কিন্তু আমরা এত অধঃপাতে গিয়েছি, যে ওজরের দরকারটা পর্যন্ত দেখি না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ আজকাল বিবেকদংশনের বালাই বাদ দিয়ে এই অমিতাচারের হাতে নিজেদের ছেড়ে দেয়।

'কিন্তু বিবেকদংশন হবে কী করে, বিবেক বলে তো কিছু নেই আমাদের জীবনে। অবশ্য, জনমত বা ফৌজদারী দণ্ডবিধিকে যদি বিবেকের সংজ্ঞা না দেন। কিন্তু এর বেলায় জনমত বা দণ্ডবিধি, কোনটাই বিচলিত হয় না: সমাজের সামনে বিবেকদংশনের কিছু নেই, সবাই তো এটা করে, মায় মারিয়া পাভলভনা ও ইভান জাখারিচ পর্যন্ত। কী? ভিখিরীর সংখ্যা বাড়াতে চান, সামাজিকতা ছেড়ে দিতে হবে? ফৌজদারী দণ্ডবিধি নিয়েও ভয় পাওয়া বা বিবেকদংশন হবার মতো কিছু নেই। বাচ্চাদের পুকুরে কুয়োয় ফেলে দেয় শুধু ইতর মেয়ে আর সিপাইদের বৌরা; ওদের জেলে না দিলে নয় অবশ্য, কিন্তু আমরা, আমরা

সবকিছু করি যথাসময়ে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে।

'আরো দু'বছর আমাদের এভাবে কাটল। হতচ্ছাড়াগুলোর পদ্ধতিগুলো কাজ দিল: আমার স্ত্রী একেবারে ভরন্ত হয়ে উঠল, চেহারা আরো খুলল, যেন শেষ হেমন্তের মাধুরী। সেটা জেনে আত্মচর্যাটা আরো বেড়ে গেল তার। উগ্র গোছের, লোককে বিচলিত করা গোছের কী একটা ছিল ওর রূপে। তিরিশ বছর বয়স, ভরাট যৌবন, বাচ্চাকাচ্চা আর হয় না। হৃষ্টপুষ্ট তিরিক্ষি স্ত্রীলোক। দেখলে মন উচাটন হয়। লোকের মাঝে গেলে সবায়ের দৃষ্টি পড়ে ওর ওপর। হঠাৎ রাশ ছেড়ে-দেওয়া হৃষ্টপুষ্ট, সুসজ্জিত ছটফটে ঘোড়ার মতো। কোনো রাশই ছিল না, আমাদের মেয়েদের শতকরা নিরেনব্বই জনের যেমন থাকে না। ব্যাপারটা বুঝে ভয় হল।'

১৯

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক জানলার ধারে বসলেন।

'মাপ করবেন,' বলে মিনিট তিনেক জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চুপচাপ কাটল তাঁর। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফিরে এসে আমার পাশে বসলেন।

মুখের ভাব একেবারে বদলে গিয়েছে, দৃষ্টিটা করুণ, হাসির মতো অদ্ভুত কী একটায় ঠোঁটদুটো কুঞ্চিত।

'একটু ক্লান্ত লাগছে, তবু বলি। এখনো অনেক সময়, ফরসা হতে শুরু করে নি এখনো। হ্যাঁ,' সিগারেট ধরিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'বাচ্চাকাচ্চা বন্ধ হবার পর থেকে আমার স্ত্রী টইটম্বুর হয়ে উঠল, আর ওর সেই রোগটা — ছেলেমেয়েদের নিয়ে অবিরাম দুর্ভোগ — কমে গেল। একেবারে সেরে গেল তা নয়, কিন্তু ওর অবস্থাটা হল অনেকটা নেশার ঘোর কাটিয়ে উঠে হঠাৎ চারপাশে আনন্দেভরা পৃথিবী দেখার মতো, যে পৃথিবীর কথা সে ভুলে গিয়েছিল, যার মধ্যে সে বাঁচতে পারে নি, বোঝে নি যে পৃথিবীকে। "এটা ছেড়ে দিলে চলবে না! সময় বয়ে যাচ্ছে, এ সময় আর কখনো ফিরবে না!" আমার মনে হয় এমনটা সে ভেবেছিল কিংবা হয়ত অনুভব করেছিল, আর এ না ভাবার, অনুভব না করার জো ছিল না ওর; জীবনে শুধু একটা লক্ষ্যবস্তু আছে — প্রেম — এ ধারণা যাতে হয় তার মতো করে ওকে মানুষ করা হয়। বিয়ে হল, সে প্রেম থেকে কিছু পাওয়া গেল বটে, কিন্তু যেটার প্রত্যাশা ও করেছে, যার প্রতিশ্রুতি ছিল, তার মতো নয় মোটে; বরং সেটা এনেছে অনেক হতাশা আর দুর্ভোগ, আর এনেছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটি

যন্ত্রণা — ছেলেমেয়ে। সে যন্ত্রণায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল আমার স্ত্রী। আর এখন, হিতৈষী ডাক্তারদের কৃপায় ও আবিষ্কার করল বাচ্চাকাচ্চা না হয়ে থাকা যায়। আহ্লাদ হল, ভালো লাগল নতুন অনুভূতিটি, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে যেটা জানত — অর্থাৎ প্রেম — তার জন্য চাঙ্গা হয়ে উঠল আবার। কিন্তু হিংসায় আর বিদ্বেষে জীর্ণ স্বামীর সঙ্গে প্রেম নয়। আলাদা গোছের প্রেমের, নতুন ও পূত ধরণের প্রেমের স্বপ্ন দেখতে শুরু করল সে। অন্তত আমার তাই মনে হল। আর চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগল ও, যেন কার প্রত্যাশায় আছে। দেখে উদ্বিগ্ন না বোধ করে পারলাম না। নিজের ধরণ মতো ও যখন অন্যদের মাধ্যমে কথা বলত আমার সঙ্গে — অর্থাৎ অন্যদের সঙ্গে আলাপ চালিয়ে কথাগুলি বলত আমাকে উদ্দেশ্য করে, তখন বার বার জোর গলায়, একটু তামাসার ভাব করে (ঘণ্টা খানেক আগে এর উল্টো কথা বলেছিল সেটা যেন ভুলে গিয়েছে) জানিয়ে দিত যে, মাতৃকর্তব্যটা ছলনা মাত্র, যৌবন যখন আছে, জীবন যখন উপভোগ করা সম্ভব, তখন ছেলেমেয়েদের জন্য আত্মত্যাগ করার কোনো অর্থ নেই। ছেলেমেয়েদের দিকে কম নজর দিতে লাগল ও, আর যেটুকু দিত তাতে আগেকার সেই মরিয়া তীব্রতা আর রইল না। নিজেকে নিয়ে, নিজের

চেহারা নিয়ে ক্রমশ বেশী সময় কাটাতে লাগল, যদিও সেটা ঢেকে রাখতে চাইত, মন গেল আমোদ-আহ্লাদ, এমনকি আত্মোন্নতির চর্চায়। পিয়ানো বাজানো একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল, আবার আগ্রহভরে ধরল। এ থেকে সূত্রপাত হয় সবকিছুর।'

ভদ্রলোক শ্রান্তচোখে আবার তাকালেন জানলার দিকে, কিন্তু তখুনি, মনে হল জোর করে বলে চললেন।

'তারপর সেই লোকটার আবির্ভাব হল।' একটু থতমত খেয়ে নিজের সেই অদ্ভুত আওয়াজটা নাক দিয়ে দু'তিন বার তিনি করলেন।

বুঝতে পারলাম, সে লোকটির নাম করা, তাকে মনে করা, তার কথা বলা ভদ্রলোকের পক্ষে ক্লেশকর। কিন্তু জোর করে, যে জিনিসটি তাকে বাধা দিচ্ছে, তাকে যেন হটিয়ে দিয়ে দৃঢ়ভাবে আবার বলতে লাগলেন:

'আমার চোখে, আমার বিবেচনায় লোকটা অত্যন্ত খারাপ। আমার জীবনে তার ভূমিকার জন্য নয়, সত্যি সত্যি লোকটা অত্যন্ত খারাপ। প্রসঙ্গত, লোকটা যে খারাপ, সেটা আমার স্ত্রীর কাণ্ডজ্ঞানহীনতার একটা প্রমাণ। ও লোকটা না হলে আর কেউ হত — না হয়ে উপায় ছিল না।' আবার চুপ করলেন ভদ্রলোক।

'লোকটা বাজিয়ে, ভায়োলিন বাজাত: পেশাদার বাজিয়ে না — হাফ-বাজিয়ে, হাফ-বাবুলোক।

'বাপ জমিদার, আমার বাবার প্রতিবেশী। ওর বাবা ফতুর হয়ে যেতে তিন ছেলের দুজনে যায় কাজে, আর তৃতীয়টিকে, কনিষ্ঠটিকে পাঠানো হয় প্যারিসে তার ধর্ম-মায়ের কাছে। গান বাজনায় ওর হাত ছিল বলে ভর্তি হল সঙ্গীতের স্কুলে, ভায়োলিন-বাজিয়ে হিসেবে শিক্ষা শেষ করে কনসার্টে বাজাত। লোক হিসেবে ও...' বোঝা গেল ওর সম্বন্ধে খারাপ কিছু বলার উদ্দেশ্য ছিল ভদ্রলোকের, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে চললেন, 'ওখানে ও কীভাবে দিনযাপন করে বলতে পারি না; শুধু জানি সে বছরে রাশিয়ায় ফিরে এসে আমার বাড়িতে আবির্ভূত হল।

'আর্দ্র, বাদামের মতো চোখ, হাসি-হাসি লাল ঠোঁট, মোম দেওয়া গোঁফ, একেবারে হালের কায়দায় কেশসজ্জা, মুখখানা দেখতে অশ্লীল গোছের ভালো, মেয়েরা যাদের বলে "মন্দ নয়", শরীরের গঠন রোগা, বিসদৃশ নয় কিন্তু, পাছাটি বেশ ভারি, মেয়েদের যেমন, হটেনটটদের* যেমন, লোকে যা বলে। শুনেছি হটেনটটরাও গান বাজনা ভালোবাসে। যথাসম্ভব গায়ে পড়া ভাব, তবে বেশ সজাগ, নাম মাত্র বাধায় পিছু

* দক্ষিণ আফ্রিকার একটি জাতি।

হটে যায়। ধরণ-ধারণ বেশ মর্যাদাময়, পায়ে প্যারিসসুলভ বিচিত্র রং'এর বোতাম দেওয়া বুট, গলায় জ্বলজ্বলে টাই, আর পরিচ্ছদের অন্যান্য সব জিনিস তেমন যেমন বিদেশীরা প্যারিসে সংগ্রহ করে, অভিনবত্ব ও মৌলিকতায় যা হামেশাই মেয়েদের অভিভূত করে। লোকটি বরাবর কৃত্রিম, ওপর ওপর ফূর্তির একটা ভঙ্গি নিত, কথা বলার ধরণটা ছিল আভাসে ইঙ্গিতে, যেন ও কী বলতে চায় সবাই জানে, নিজেরাই সম্পূর্ণ করে নিতে পারে বক্তব্যটাকে।

'সবকিছুর মূলে লোকটি ও তার বাজনা। বিচারের সময়ে বোঝানো হয়েছিল যে, সবকিছু ঘটে ঈর্ষার দরুন। আদৌ তা নয়, মানে একেবারে সেরকমটা হয় নি তা নয়, তবু ঠিক ওটা নয়। বিচারে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, আমি প্রবঞ্চিত স্বামী, নিজের হৃত সম্মান (ওদের দেওয়া নাম এটি) রক্ষার্থে আমি নিজের স্ত্রীকে হত্যা করি। আর তাই আমি খালাস পেলাম। বিচারের সময়ে সমস্ত ব্যাপারটা যথার্থভাবে ওদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওরা ভাবল স্ত্রীর সুনাম বজায় রাখার চেষ্টা করছি।

'বাজিয়েটার সঙ্গে আমার স্ত্রীর সম্পর্ক যাই হোক না কেন, সেটা আমার কাছে অর্থহীন, আমার স্ত্রীর কাছেও। ভাববার মতো জিনিস একটিমাত্র ছিল,

সেটার কথা আপনাকে আগেই বলেছি, সেটা হল আমার পশুভাব। আমাদের দুজনের মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর খাদটা ছিল বলে সবকিছু ঘটে যা আপনাকে আগে বলেছি; আমাদের পারস্পরিক ঘৃণার ধকলটা এত তীব্র যে সামান্যতম উস্কানিতেই অবস্থাটা চরম সংকটে পৌঁছতে পারত। শেষের দিকে আমাদের ঝগড়াঝাঁটি ভীষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আরো অদ্ভুত এই জন্য যে, তারা ঘটত তীব্র জান্তব কামপর্বের পর।

'ও লোকটা না এলে আর একটা আসত। ঈর্ষা প্ররোচনা না জোগালে, অন্য কিছু জোগাত। আমার বিশ্বাস, আমার মতো করে যারা থাকে তারা সবাই হয় লম্পট হয়ে যাবে, নয় স্ত্রীদের পরিত্যাগ করবে, কিম্বা হয়ত নিজেদের বা স্ত্রীদের হত্যা করবে, যেমন আমি করেছিলাম। এ সবের হাত থেকে কেউ যদি রেহাই পেয়ে থাকে, তাহলে সেটা বিরল ব্যতিক্রম। যে ভাবে ব্যাপারটায় দাঁড়ি টানি তা করার আগে কয়েক বার আত্মহত্যার মুখোমুখি হয়েছি, আমার স্ত্রীও বিষ খেয়ে মরার চেষ্টা করে।'

২০

'হ্যাঁ, সমাপ্তির কিছু আগে অবস্থাটা ছিল এরকম।

'সন্ধি গোছের একটা অবস্থায় দুজনে ছিলাম, সেটা

লঙ্ঘন করার মতো কিছু নেই। কিন্তু হয়ত আমি মন্তব্য করলাম যে একটা প্রদর্শনীতে কী একটা কুকুর পদক পেয়েছে। "পদক নয়, প্রশংসা", আমার স্ত্রী বলল। তর্ক শুরু হয়ে গেল। এক বিষয় থেকে অন্য বিষয় ঝটিতি এসে পড়ল। শুরু হল অভিযোগ অনুযোগ: "হ্যাঁ, সবাই এটা জানে; এটা তো বরাবর এরকম। তুমি বলেছিলে..."—"ওরকম কিছু আমি কক্ষনো বলি নি," — "ঘুরিয়ে বলতে চাও আমি মিথ্যে কথা বলছি?" টের পাই আবার সেরকম একটা ভয়ংকর ঝগড়া প্রায় এসে পড়েছে যখন ইচ্ছে হয় ওকে বা নিজেকে খুন করি। টের পাই এসে পড়েছে, তাই উৎকট ভয়, ইচ্ছে হয় আত্মসম্বরণ করি, কিন্তু আমার সমস্ত সত্তা বিদ্বেষে আচ্ছন্ন। ওরও অবস্থা তাই, হয়ত আরো খারাপ; আমি যা বলছি তা ইচ্ছে করে বিকৃত করছে, অন্য মানে করছে কথার। ওর প্রতিটি কথা বিষে জর্জরিত; আমার সবচেয়ে ব্যথার জায়গাগুলি বের করে সেখানে আঘাত করার বিরাম নেই। যত দিন যায়, তত বাড়ে। "চুপ করো" বা ওধরনের কিছু একটা বললাম চেঁচিয়ে। ও এক ঝটকায় উঠে বাচ্চাদের ঘরের দিকে দৌড়ে গেল। আমার বক্তব্য শেষ পর্যন্ত শুনিয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করলাম ওকে থামাতে। হাতটা চেপে ধরলাম। ব্যথা পেয়েছে ভান করে ও

ককিয়ে উঠল, "বাচ্চারা, শুনছিস তোরা! তোদের বাবা আমাকে মারছে!" "মিথ্যে কথা বোলো না!" চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। — ''এই তো প্রথম নয়!'' উত্তরে এই ধরণের কিছু একটা চেঁচিয়ে বলল ও। বাচ্চারা দৌড়ে ওর কাছে এল। ওদের ঠান্ডা করতে লাগল আমার স্ত্রী। ''ভান করা ছাড়ো,'' আমি বললাম। ''তোমার কাছে সবকিছু তো ভান; খুন করে তুমি বলতে পারো লোকটা ভান করছিল। এখন হাড়ে হাড়ে তোমাকে চিনেছি — তুমি ঠিক তাই করতে চাও।'' — ''তুমি মরলে বাঁচি!'' চিৎকার করে বললাম। এখনো মনে আছে নিজের কথায় কী দারুণ আতঙ্ক হয়েছিল। এরকম কর্কশ ভয়ংকর কথা যে বলতে পারি কখনো ভাবি নি, আমার মুখ দিয়েই তা বেরিয়েছে দেখে চমকে যাই। চেঁচিয়ে কথাটা বলে দৌড়ে গেলাম পড়ার ঘরে, বসে পড়ে সিগারেট খেতে শুরু করলাম। ও হলে গিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে, আওয়াজ পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছে। জবাব দিল না। ''গোল্লায় যাক,'' মনে মনে বলে পড়ার ঘরে ফিরে আবার শুয়ে পড়ে সিগারেট খেতে লাগলাম। ওর ওপর শোধ তোলার, ওর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার, কিছু যেন ঘটে নি এমনভাবে সব ঠিকঠাক করে নেবার সহস্র ফন্দি মাথায় ঘুরতে লাগল। শুয়ে

শুয়ে ভাবছি, সিগারেট খাচ্ছি তো খাচ্ছি। ভাবলাম ওকে ফেলে পালিয়ে যাই, কোথাও লুকিয়ে থাকি, চলে যাই আমেরিকায়। শেষ পর্যন্ত এমন হল যে, ওর কাছ থেকে অব্যাহতি পাবার কল্পনাটা পেয়ে বসল, তাহলে জীবনটা কী অপরূপ না হবে! অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে, চমৎকার, একেবারে নতুন একটি মেয়ের সঙ্গে আমার জীবন একসূত্রে বাঁধব। ও মরে যাবে নয় তো বিবাহ বিচ্ছেদ করে ওর হাত থেকে ছাড়ান পাব; কী ভাবে এটা করা যায়, তাই নিয়ে ফন্দি আঁটতে লাগলাম। বুঝলাম আমার গণ্ডগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, যা ভাবা দরকার, তা ভাবছি না, আর যা দরকার, তা যে ভাবছি না, এই চেতনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সিগারেট খেতে লাগলাম।

'সংসারে সবকিছু চলেছে যথারীতি। গভার্নেস এসে জিজ্ঞেস করে: "Madame কোথায়? কখন ফিরবেন?" আর্দালি জিজ্ঞেস করে চা দেবে কিনা। খাবার ঘরে যাই। বাচ্চারা আমার দিকে কঠিন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়, বিশেষ করে বড়ো মেয়ে লিজা, বোঝবার মতো বয়স ওর হয়েছে। কোনো কথা না বলে আমরা চা খাই। স্ত্রীর পাত্তা নেই। সন্ধ্যা কেটে গেল তখনো ফিরল না। দুটো অনুভূতির লড়াই

চলেছে আমার মনে: ও তো জানে যে শেষ পর্যন্ত ফিরে আসবে, তবু বাড়ির বাইরে থেকে আমাকে ও বাচ্চাদের যন্ত্রণা দিচ্ছে, সে জন্য বিদ্বেষ; আর ভয় যে ও ফিরে আসবে না, নিজেকে নিয়ে কিছু একটা করে বসবে। ওর খোঁজে বেরোতাম, কিন্তু কোথায় যাব? ওর বোনের বাড়িতে? ওখানে গিয়ে ওর কথা জিজ্ঞেস করাটা বোকামি। চুলোয় যাক ও! অন্যকে যন্ত্রণা দেবার এত জেদ যদি ওর, নিজেকে দিক। সেই তো ও চায়। পরের বার হবে আরো খারাপ। কিন্তু যদি ও বোনের বাড়িতে না গিয়ে কিছু একটা করার মতলবে থাকে, যদি ইতিমধ্যে কিছু একটা করে থাকে, তাহলে?... এগারোটা বাজল, বারোটা... একটা! শোবার ঘরে গেলাম না, ওখানে একলা শুয়ে প্রতীক্ষায় থাকাটা বোকামি। পড়ার ঘরেও শুতে পারলাম না। চাইছিলাম কিছু একটা করে নিজেকে ব্যস্ত রাখি, চিঠি লিখি বা পড়ি, কিন্তু কিছু করতে পারছি না। নানা চিন্তায় জর্জরিত, ক্রুদ্ধ, একলা বসে রইলাম পড়ার ঘরে, কান পেতে রেখে। তিনটে বাজল, চারটে — তবু ও এল না। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল। ও আসে নি।

'সংসার যাত্রা যথারীতি চলেছে, কিন্তু সবাই উদভ্রান্ত, সবাই জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে, ভৎর্সনার ভঙ্গিতে

বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছে, সবাই ধরে নিয়েছে দোষটা সম্পূর্ণ আমার। আর আমার মনে তখনো চলেছে সেই লড়াই — আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে বলে ওর ওপর বিদ্বেষ আর ওর বিষয়ে উৎকণ্ঠা।

'এগারোটা নাগাদ ওর বোন এলেন দূতী হিসেবে। যথারীতি আরম্ভ করলেন: ''ওর অবস্থা সাংঘাতিক। কী হয়েছে?" "কই, কিছু তো ঘটে নি।" বললাম ওর স্বভাবটি অসম্ভব, আমি কিছু করি নি, একেবারে কিছু না।

' "কিন্তু এরকম করে তো চলতে পারে না," ওর বোন বললেন।

' "সেটা ওর ব্যাপার। আমার নয়," আমি বললাম। ''আমি গায়ে পড়ে কিছু করব না কিছুতেই। আলাদা যদি থাকতে হয়, তাহলে আলাদা থাকা যাবে।"

'আমার শালী কোনো ভরসা না পেয়ে চলে গেলেন। জোর গলায় বলেছিলাম গায়ে পড়ে কিছু করব না, কিন্তু শালী চলে যাবার পর বেরিয়ে এসে চোখে পড়ল বাচ্চাগুলোর কী ভীত করুণ ভাব, তখন মনে হল আমারি কিছু করা দরকার গায়ে পড়ে। কিছু করতে পারলে অত্যন্ত খুশি হতাম, কিন্তু কী ভাবে করি জানি না। আবার চলল পায়চারি, ধূমপান। প্রাতরাশের সময়ে ভোদকা ও অন্য মদ খেলাম, আর

অজ্ঞাতসারে যেটা ব্যাকুলভাবে চাইছিলাম ক্রমশ সেটা আয়ত্তে এল: আমার অবস্থার নীচতা ও নির্বুদ্ধিতার কথা ভুলে গেলাম।

'তিনটে নাগাদ আমার স্ত্রী বাড়ি ফিরল। আমাকে দেখে কিছু বলল না। ভাবলাম ও মেটাতে চাইছে, ওর বকাবকির ফলে আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল, বোঝাতে শুরু করলাম। ওর কঠোর ভয়ংকর মুখে ভাবান্তর এল না, বলল বোঝাপড়ার জন্য আসে নি, এসেছে বাচ্চাদের নিয়ে যেতে, একসঙ্গে আমাদের ঘর করা আর চলবে না। বলতে চেষ্টা করলাম দোষটা আমার নয়, ও আমাকে মরিয়া করে তুলেছে। মুহূর্তকাল ও আমার দিকে তাকিয়ে রইল গম্ভীর বিজয়ের দৃষ্টিতে, তারপর বলল:

' "আর কিছু বলার দরকার নেই; বললে অনুতাপ করতে হবে পরে।"

'আমি বললাম, নাটুকেপনা আমার অসহ্য। শুনে অবোধ্য কী একটা চেঁচিয়ে বলে দৌড়ে নিজের ঘরে ও চলে গেল। দরজায় তালা পড়ার শব্দ কানে এল — ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে ও। দরজা ধাক্কালাম, কোনো সাড়া নেই, রাগে চলে এলাম। আধঘণ্টা পরে লিজা সজল চোখে দৌড়িয়ে এল আমার কাছে।

' "কী? কী হয়েছে?"

' "মা'র ঘরে কোনো সাড়াশব্দ নেই।"

'গেলাম ঘরটায়। প্রাণপণে দরজা ধরে টানলাম, হুড়কাটা ভালো আঁটা ছিল না, দু'পাটি দরজা গেল খুলে। বিছানার ধারে গেলাম। পরনে স্কার্ট, উঁচু জুতো, অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে বেহুঁশ হয়ে ও পড়ে আছে। বিছানার পাশের টেবিলে আফিমের খালি শিশি। হুঁশ ফিরিয়ে আনা হল। আবার অশ্রু বিসর্জন, অবশেষে মিটমাট। কিন্তু সত্যিকারের মিটমাট নয়; দুজনের অন্তরে রয়ে গেল পুরনো শত্রুতা, তার সঙ্গে জুটল এই ঝগড়ার দুর্ভোগের দরুন আরো আক্রোশ, যার জন্য দুজনেই আমরা পরস্পরকে দোষ দিচ্ছি। কিন্তু এসব কোনোক্রমে শেষ করা দরকার, অথচ জীবন চলল আবার আগেকার মতো। মাসে একবার, সপ্তাহে একবার, দিনে একবার করে এরকম বা এর চেয়েও খারাপ ঝগড়া লেগে থাকল। বারবার সেই একই ব্যাপার। বিদেশে যাবার ছাড়পত্রও একবার যোগাড় করলাম, সেবার ঝগড়াটা দুদিন চলেছিল, কিন্তু পরে হল আধা-বোঝাপড়া আধা-মিটমাট, আর আমি রয়ে গেলাম।'

২১

'লোকটির আবির্ভাব ঘটার সময়ে আমাদের দুজনের সম্পর্ক ছিল এ রকম। মস্কোয় এসেই ও (লোকটার

নাম ত্রুখাচেভস্কি) আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তখন সকাল। দেখা করলাম। এককালে আমাদের মধ্যে ''তুমি'' সম্বোধন চলত। আলাপের সময় ও চেষ্টা করল "তুমি" ও "আপনি"র মাঝামাঝি থেকে "তুমি"তে চলে আসতে, কিন্তু আমি প্রথম থেকে স্পষ্ট ''আপনি'' ভাব রেখে চলাতে ও আমার সুরে সুর মিলিয়ে নিল। প্রথম থেকেই ওকে আমার অত্যন্ত অপছন্দ হল। কিন্তু বিদঘুটে কাণ্ড এটা, কী একটা বিচিত্র, সর্বনেশে গ্রহের ফেরে ওকে ভাগিয়ে দিতে পারলাম না, পারলাম না দূরে সরিয়ে দিতে, বরং প্রশ্রয় দিলাম। নিস্পৃহভাবে ওর সঙ্গে কথা বলে, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ না করিয়ে দিয়ে ওকে বিদায় দেওয়াটা কী সহজ না ছিল। কিন্তু না, ওর বাজনার কথাটা যেন ইচ্ছে করেই তুললাম, বললাম কার কাছে যেন শুনেছি ও ভায়োলিন বাজানো ছেড়ে দিয়েছে। ও জানাল সেটা সত্যি নয়, বরং আগের চেয়ে বেশী বাজায়। এককালে আমিও বাজাতাম, মনে করিয়ে দিল। আমি বললাম আমি আর বাজাই না, কিন্তু আমার স্ত্রীর হাত খুব ভালো।

'অদ্ভুত ব্যাপার! যা শেষ পর্যন্ত ঘটেছিল মাত্র তার পরেই যে রকমটা হতে পারত, প্রথম দিন থেকে, প্রথম ঘণ্টা থেকেই ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ঠিক তেমনি

হল। ওর প্রতি মনোভাবে কেমন একটা তীব্রতা ছিল আমার। আমাদের দুজনের প্রতিটি কথা, প্রতিটি অভিব্যক্তি খুঁটিয়ে দেখলাম, গুরুত্ব আরোপ করলাম তাতে।

'স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গান বাজনার কথা উঠল, ও জানালো যে, আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাজাতে পারলে খুশি হবে। স্ত্রী ছিল অত্যন্ত সুসজ্জিতা, মোহিনী, (হালে বরাবর যেমন), রূপ দেখে চিত্তচাঞ্চল্য হয়। মনে হল প্রথম দর্শন থেকে লোকটিকে পছন্দ তার। তাছাড়া পিয়ানো ও ভায়োলিন ডুয়েটের সম্ভাবনায় সে উল্লসিত, এটা বিশেষ ভালো লাগত তার, মাঝে মাঝে নিজের সঙ্গে বাজাবার জন্য থিয়েটার থেকে ভায়োলিন-বাজিয়ে ভাড়া করে আনত। মুখের ভাবে আনন্দটা স্পষ্ট বোঝা গেল। এ ব্যাপারে আমার মনের গতিক কী, মুখের আভাসে ও বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুখের ভাব বদলে নিল, আবার শুরু হল পরস্পরকে ঠকানোর লুকোচুরি খেলা। আমি মধুর হাসি হাসলাম, ভান করলাম বেশ খুশি হয়েছি। কামুকরা সর্বদা যেভাবে সুন্দরী মেয়েদের দিকে তাকায়, সেভাবে লোকটা আমার স্ত্রীর দিকে তাকাতে লাগল, কিন্তু ভাবটা এমন যে আমাদের কথাবার্তার বিষয়ে শুধু তার আগ্রহ, ঠিক সেইটিতে,

যাতে ওর নামমাত্র আগ্রহ ছিল না। আমার স্ত্রী উদাসীন ভাব দেখাবার চেষ্টা করল, কিন্তু ঈর্ষান্বিত স্বামীর কৃত্রিম হাসি (হাসিটা ওর হাড়ে হাড়ে চেনা) ও অভ্যাগতটির কামুক কটাক্ষে বিচলিত না হয়ে ওর উপায় ছিল না। লোকটিকে প্রথম দেখার পরে আমার স্ত্রীর চোখে একটি বিশেষ দীপ্তি আমার নজরে পড়ল, আর সম্ভবত আমার ঈর্ষার ফলেই ওদের দুজনের মধ্যে যেন চলল একটি তড়িৎ প্রবাহ, দুজনের হাসি, দৃষ্টি ও মুখের ভাব হয়ে উঠল একই রকম। আমার স্ত্রী লাল হয়ে উঠল — লোকটিও; লোকটি হাসল — আমার স্ত্রীও। গান বাজনা, প্যারিস, আজেবাজে নানা জিনিস নিয়ে আলাপ হল। যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা কম্পমান ঊরুতে লাগিয়ে হাসি মুখে ও কখনো আমার দিকে, কখনো স্ত্রীর দিকে চাইতে লাগল। যেন আমরা কী করি দেখায় অপেক্ষায় আছে। সে মুহূর্তটি আমার বিশেষ করে মনে আছে, কেননা তখন ওকে নেমন্তন্ন না করতে পারতাম আর তাহলে কোনো কিছু ঘটত না। কিন্তু ওর দিকে একবার তাকালাম, তারপর স্ত্রীর দিকে, মনে মনে স্ত্রীকে বললাম, "ভেবো না আমার হিংসে হয়েছে," লোকটিকে মনে মনে বললাম, " ভেবো না তোমাকে ভয় পাই," আর ভায়োলিন নিয়ে এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কোনো

সন্ধ্যায় বাজাতে আমন্ত্রণ জানালাম। অবাক হয়ে আমার দিকে চাইল আমার স্ত্রী, লাল হয়ে উঠে, যেন ভয় পেয়েছে এমনভাবে আপত্তি জানিয়ে বলল ওর সঙ্গে বাজাবার মতো হাত তার নেই। ওর প্রত্যাখ্যানে আরো বিরক্ত লাগল, আরো জোর দিয়ে আসতে বললাম লোকটাকে। পাখির মতো লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ও, মনে আছে কী বিচিত্র মনোভাবে তাকিয়েছিলাম ওর মাথার দিকে, দুপাশে টেরি কাটা কালো চুলের নিচে শাদা ঘাড়ের দিকে। এই জীবটির উপস্থিতি আমার পক্ষে যন্ত্রণাকর, নিজের কাছে স্বীকার না করে পারলাম না। "ওর সঙ্গে আর কখনো যাতে দেখা না হয়, সে তো আমার ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে," ভাবলাম। কিন্তু দেখা না করার মানে দাঁড়ায় ওকে ভয় পাই। না, ওকে ভয় পাই না! ভয় পাওয়াটা অত্যন্ত অপমানকর, মনে মনে বললাম। আর এখানে, করিডরে, আবার জোর দিয়ে বললাম সেদিনই সন্ধ্যায় যেন ভায়োলিন নিয়ে আসে; জানতাম স্ত্রী আমার গলা শুনতে পাচ্ছে। কথা দিয়ে ও চলে গেল।

'সেদিন সন্ধ্যায় ভায়োলিন নিয়ে ও এল, বাজাল দুজনে। কিন্তু অনেকক্ষণ বাজনাটা জমল না। দরকারী স্বরলিপিগুলো ছিল না ওদের কাছে, যা ছিল সেটা

বিনা প্রস্তুতিতে আমার স্ত্রী বাজাতে পারল না। গান বাজনা আমার অত্যন্ত প্রিয়, আমিও যোগ দিলাম — লোকটির জন্য একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে স্বরলিপির পাতা উলটিয়ে দিতে লাগলাম। কয়েকটি সুর ওরা বাজাল, কথা বিহীন কয়েকটি গান, মোজার্টের একটা সোনাটা। চমৎকার বাজাল লোকটি, যাকে "টোন" বলে তার সুন্দর দখল ওর। তাছাড়া, যে মিহি মার্জিত রুচির পরিচয় দিল সেটা ওর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না মোটেই।

'স্বভাবত আমার স্ত্রীর চেয়ে অনেক ভালো হাত ওর, স্ত্রীকে সাহায্য করল ও, সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রভাবে স্ত্রীর তারিফ করা চলল। আচরণ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। স্ত্রীকে দেখে মনে হল শুধুমাত্র সঙ্গীতে তার আগ্রহ, তার ব্যবহার অত্যন্ত সহজ ও অকপট। আমিও ভান করলাম একমাত্র সঙ্গীতে আমার আগ্রহ, কিন্তু সারা সন্ধ্যাটা হিংসেয় দগ্ধে মরলাম।

'দেখলাম, স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করার প্রথম মুহূর্ত থেকেই সমাজ ও শোভনতার সমস্ত আইনকানুন জলে দিয়ে ওদের ভেতরকার সেই পশু জিজ্ঞেস করছে, "কী, হবে নাকি?" আর উত্তর আসছে, "হ্যাঁ, হবে না কেন?" বুঝলাম, ও ভাবতে পারে নি যে, আমার

স্ত্রী, মস্কোওয়ালী, এত মোহিনী হতে পারে, দেখে বেজায় খুশি ও। মুহূর্তের জন্য ওর সন্দেহ ছিল না যে, আমার স্ত্রী ওকে গ্রহণ করবে। হতচ্ছাড়া স্বামীটা ব্যাঘাত ঘটাতে যাতে না পারে, এই যা চিন্তার বিষয়। চরিত্র শুদ্ধ হলে এটা আমার মাথায় ঢুকত না, কিন্তু বিয়ের আগে বেশীর ভাগ লোকের মতো স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমার মনোভাব একই ছিল, তাই খোলা বই' এর মতো ওর মনের কথা স্পষ্ট পড়তে পারলাম। আর একটি ব্যাপার বিশেষ যন্ত্রণা দিল আমাকে: আমি জানতাম, স্থিরভাবে জানতাম যে, কামের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত মুহূর্ত ছাড়া আমার প্রতি স্ত্রীর মনোভাব হল শুধু বিরক্তির, আর এই লোকটাকে যে আমার স্ত্রীর পছন্দ হবে তাই নয়, নিঃসন্দেহে লোকটি অক্লেশে জয় করবে তাকে, ধামসাবে, মোচড়াবে, দড়ি পাকাবে, যা খুশি করবে তার সঙ্গে; সেটা করবে বাইরের চাকচিক্য ও অভিনবত্বে, বিশেষ করে সঙ্গীতে তার অসাধারণ দক্ষতায়, একসঙ্গে বাজানোর ফলে যে ঘনিষ্ঠতা হয়, তার জোরে, সংবেদনশীল মনের ওপর সঙ্গীতের, বিশেষ করে ভায়োলিনের প্রভাবে। এটা না বুঝে আমার অন্যথা ছিল না, আর বুঝে অত্যন্ত যন্ত্রণার ভার। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কিম্বা হয়ত এরি জন্য, আমার ইচ্ছার বিরোধী কোন শক্তির বশে আমি

লোকটির সঙ্গে শুধু যে বিশেষ ভদ্র হলাম তা নয়, এমনকি সমাদরই করলাম। ওকে ভয় পাই না সেটা স্ত্রীকে কিম্বা ওকে দেখিয়ে দেবার জন্য সেটা করলাম, না নিজের জন্য, নিজেকে ঠকাবার জন্য, বলতে পারি না, কিন্তু লোকটির সঙ্গে সহজ সরল হওয়াটা একেবারে গোড়া থেকে অসম্ভব লাগল। তক্ষুনি ওকে মেরে ফেলি এই ইচ্ছে, সেটা দাবাবার জন্যই নিশ্চয় সমাদর করতে হল। আহারের সময় দামী মদ খাওয়ালাম, ওর বাজানো নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলাম, কথা বলার সময়ে মুখে আনলাম স্মিত হাসি, পরের রবিবার আমাদের সঙ্গে খেতে ও স্ত্রীর সঙ্গে আবার বাজাতে অনুরোধ জানালাম। আরো বললাম সঙ্গীতপ্রিয় আমার কয়েকটি বন্ধুকে ডাকব ওর বাজানো শুনতে। সেদিনের সন্ধ্যাটার শেষ এইখানে।'

অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থা পজ্‌দ্‌নীশেভের, নড়েচড়ে বসে তিনি সেই অদ্ভুত আওয়াজটি করলেন।

আত্মস্থ হবার স্পষ্ট প্রয়াস করে তিনি আবার শুরু করলেন, 'লোকটার উপস্থিতিতে আমার প্রতিক্রিয়াটা অদ্ভুত। দু' এক দিন পরে একটা প্রদর্শনী থেকে ফিরে হলে ঢুকেছি, হঠাৎ বুকটা পাথরের মতো ভারি হয়ে গেল, কেন যে বুঝতে পারলাম না। করিডর হয়ে যাবার সময় কিছু একটা দেখেছিলাম যেটা ওর কথা

মনে করিয়ে দেয়। পড়ার ঘরে ঢুকলাম, শুধু তখনি জিনিসটা কী তার হুঁশ হল, নিশ্চিত হবার জন্য করিডরে ফিরে গেলাম। না, ভুল করি নি; ওর কোটটা ঝুলছে; সৌখীন ওভারকোট, বুঝলেন কিনা। (ওর সবকিছু আমার অজ্ঞাতসারেই অত্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছিলাম)। জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁ, তাই বটে, লোকটা এসেছে। হলে গেলাম, ড্রয়িং-রুম দিয়ে নয়, বাচ্চাদের পড়ার ঘর হয়ে। আমার মেয়ে লিজা বই নিয়ে ব্যস্ত, ছোট্টটিকে নিয়ে আয়া টেবিলের পাশে বসে কী একটা ঢাকনা নাড়াচাড়া করছে। হলের দরজা বন্ধ, কানে এল arpeggio*, ওর আর আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর। কান পেতে রইলাম, কিন্তু কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না। তার মানে, নিজেদের কণ্ঠস্বর, হয়ত বা চুম্বনের শব্দ ঢাকার উদ্দেশ্যে পিয়ানো বাজানো হচ্ছে। হে ঈশ্বর! তখন আমার ভেতরে ঝড় বইল! সে মুহূর্তে আমার ভেতরকার সেই পশুটির কথা মনে পড়লে এখনো গা শিউরে ওঠে। আমার হৃৎপিণ্ড সংকুচিত হয়ে এল, থেমে গেল, তারপর যেন হাতুড়ির ঘা। সবচেয়ে জোরালো ভাবটা ছিল আত্ম-করুণার, প্রচণ্ড রাগের সময়ে হামেশা এটা হয়। ভাবলাম, "বাচ্চাগুলোর

---

* সুরের সমতাল গৎ।

সামনে! আয়ার সামনে!” লিজা অদ্ভুতভাবে তাকাল আমার দিকে, আমাকে নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। “কী করি?” শুধালাম নিজেকে। “ভেতরে যাব? সাহস হচ্ছে না। কী করে বসব, ভগবান জানেন।” কিন্তু চলে যেতেও পারি না। আয়া এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছে। “ভেতরে যেতেই হবে,” নিজেকে বলে ঝট করে দরজাটা খুলে ফেললাম। বড়ো পিয়ানোটার সামনে বসে বড়ো বড়ো শাদা আঙুলের বাঁকা ডগায় লোকটা দ্রুত আরোহী সুর একটার পর একটা তুলছে, আর পিয়ানোর কোণের কাছটায় স্বরলিপি খুলে দাঁড়িয়ে আছে আমার স্ত্রী। প্রথমে সেই আমাকে দেখল বা আসার শব্দ শুনল, তাকাল মুখ তুলে। হয়ত ভয় পেল, ভান করল ভয় পায় নি, কিম্বা হয়ত মোটেই ভয় পায় নি। যা হোক, ও চমকে বা নড়েচড়ে উঠল না; শুধু রাঙা হয়ে উঠল, আর তাও পরে।

‘ “তুমি যে এসে পড়েছ বেজায় খুশি লাগছে; রবিবারে কী বাজানো হবে আমরা ঠিক করে উঠি নি,” যে সুরে কথাটা বলল, আমার সঙ্গে একলা থাকলে কখনো বলত না। এতে এবং ওই লোকটা আর নিজেকে নিয়ে “আমরা” শব্দটির ব্যবহারে

চটলাম। কোনো কথা না বলে লোকটিকে অভ্যর্থনা জানালাম।

'করমর্দন করে হেসে — হাসিটা আমার মনে হল স্রেফ তামাসা — ও বোঝাতে লাগল রবিবারে যা বাজানো হবে, তার স্বরলিপি সে এনেছে, কিন্তু ঠিক কী বাজানো হবে — একটা শক্ত ধ্রুপদী সুর, বিঠোফেনের ভায়োলিন-পিয়ানো সোনাটা, না ছোটোখাটো কিছু গৎ — সে বিষয়ে ওরা একমত হতে পারে নি। সবই এত সহজ ও স্বাভাবিক যে, আপত্তি করার মতো কিছু নেই, তবু আমার কোনো সন্দেহ ছিল না, ও যা বলছে তার সবটা ধাপ্পা, আমাকে কী ভাবে ঠকাবে তার একটা গোপন চুক্তি হয়েছে ওদের মধ্যে।

'ঈর্ষান্বিতদের পক্ষে (আমাদের সমাজে সবাই ঈর্ষান্বিত) চরম যন্ত্রণার একটি উপকরণ হল এমন একটা সামাজিকতা, স্ত্রীপুরুষের অত্যন্ত নিকট ও অত্যন্ত বিপজ্জনক শারীরিক সান্নিধ্য যা অনুমোদন করে। নাচের আসরে শারীরিক সান্নিধ্য, ডাক্তার ও রোগীর শারীরিক সান্নিধ্য, চারুশিল্প, চিত্রকলা, বিশেষ করে সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের শারীরিক সান্নিধ্য ঘোচাবার চেষ্টা কেউ করলে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হবে। দুজনে গান বাজনা শিখছে, মহান শিল্পকলা; তার

জন্য দরকার খানিকটা সান্নিধ্য, আর সে সান্নিধ্যে নিন্দে করার মতো ছিটে ফোঁটা নেই; অবাঞ্ছনীয় কিছু একটা খুঁজে পেতে পারে কেবল এমন স্বামী যে সবচেয়ে নির্বোধ ও ঈর্ষান্বিত। অথচ, সবাই জানে যে, এ ধরনের শিক্ষার, বিশেষ করে সঙ্গীত শিক্ষার ফলে, আমাদের সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে ব্যভিচারের সূত্রপাত হয় সবচেয়ে বেশী করে। আমার বিচলিত অস্বস্তির ভাবটা মনে হল ওদের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে; অনেকক্ষণ একটিও কথা বলতে পারলাম না। আমার অবস্থাটা উল্টো করে ধরা বোতলের মতো, এত ভর্তি যে, তা থেকে কিছু বেরনো অসম্ভব। ইচ্ছে হল ওকে ধমকাই, বের করে দিই বাড়ি থেকে, কিন্তু বুঝলাম ওর সঙ্গে আবার ভদ্র ও অমায়িক হতে হবে। হলামও। সবকিছুতে খুশির ভান করলাম, ওর উপস্থিতি যত কণ্টকর লাগে তত সৌজন্য দেখাতে হয় যে বিচিত্র আবেগে, তারি প্রভাবে বললাম আমি ওর রুচির সমঝদার, স্ত্রীকেও সেই পরামর্শ দিলাম। ভয়ার্ত মুখে হঠাৎ ঘরে ঢুকে গুম হয়ে থাকার দরুন যে অপ্রীতিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল সেটা কাটিয়ে উঠতে যতটুকু সময় লাগে ঠিক ততটুকু ও রইল, তারপর পরের দিন কী বাজানো হবে সেটা শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে এই ভান করে চলে গেল।

আমার কোনো সন্দেহ রইল না, সম্পূর্ণ আলাদা কিছুতে ওদের মন এত ব্যাপৃত, যে কী বাজানো হবে তাতে ওদের কিছু এসে যায় না।

'ওকে এগিয়ে দিলাম বিশেষ সৌজন্য করে (যে লোক গোটা সংসারের সুখশান্তি ছারখার করে দিতে এসেছে তাকে অন্য কী ভাবে এগিয়ে দেওয়া যায় বলুন!)। বিশেষ সমাদরে চাপ দিলাম ওর নরম শাদা হাতে।'

২২

'বাকি দিনটা একটিও কথা বললাম না স্ত্রীর সঙ্গে। বলতে পারলাম না। ওর সান্নিধ্যে আমার এত বিদ্বেষ যে, নিজেকে নিয়ে ভয় পেলাম। খাবার সময়ে বাচ্চাদের সামনে ও আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি কবে যাব; পরের সপ্তাহে আঞ্চলিক সম্মেলনে যাবার কথা। বললাম কবে যাব। রাস্তায় নেবার জন্য কিছু আমার দরকার কিনা জিজ্ঞেস করল। কোনো উত্তর দিলাম না। কিছু না বলে টেবিলে কিছুক্ষণ বসে রইলাম, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে পড়ার ঘরে গেলাম। হালে ও পড়ার ঘরে আমার কাছে আসা ছেড়ে দিয়েছিল, বিশেষ করে এ সময়টায়। পড়ার ঘরে শুয়ে ক্রোধের ইন্ধন জোগানো চলল। হঠাৎ কানে এল চেনা পায়ের শব্দ।

মনে এল একটি ভয়াবহ, বিকট কথা — ও তাহলে উরিয়ার* স্ত্রীর মতো নিজের পাপ ঢাকার জন্য এমন একটা অস্বাভাবিক সময়ে আসছে আমার কাছে। "সত্যি কি আমার কাছে আসছে?" ক্রমশ কাছে আসা ওর পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে ভাবলাম। যদি আসে, তাহলে আমি যা ভেবেছি তাই ঠিক। ওর প্রতি অকথ্য ঘৃণায় মন ভরে যেতে লাগল। কাছে, আরো কাছে এল পায়ের শব্দ। দরজা পেরিয়ে হলে চলে যাবে নাকি? না, দরজায় কিঁচ করে আওয়াজ একটা, আর সেখানে দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রী, দীর্ঘাকৃতি, সুন্দর, চোখে মুখে মিনতির ভীরু চাউনি, সেটা লুকোবার চেষ্টা করলেও ধরা পড়ল আমার কাছে, এ চাউনির অর্থ আমি বুঝি। এতক্ষণ নিশ্বাস রোধ করে রইলাম যে, দম প্রায় বন্ধ হয়ে এল। ওর মুখ থেকে চোখ না ফিরিয়ে সিগারেট কেসটা হাতড়ে বের করে একটা সিগারেট ধরালাম।

' "কথা বলতে এলাম আর তুমি সিগারেট ধরালে, কেমন ধারা ব্যাপার?" সোফায় কাছ ঘেঁষে বসে আমার দিকে ঝুঁকে ও বলল।

'সরে গেলাম পাছে ও আমাকে ছোঁয়।

---

* উরিয়া — বাইবেলে কথিত চরিত্র।

' "রবিবারে বাজাতে চাই বলে তুমি চটেছ দেখছি," ও বলল।

' "মোটেই চটি নি," বললাম।

' "যেন আমি টের পাই নি!"

' "টের পেয়ে থাক তো বেশ। আর আমি, আমি শুধু টের পেয়েছি যে তোমার ব্যাভারটা বাইজীর মতো..."

' "গাড়োয়ানের মতো গালিগালাজ করলে চলে যাব।"

' "যাও গে, শুধু মনে রেখো, বাড়ির ইজ্জৎ তোমার কাছে কিছু না হতে পারে (গোল্লায় যেতে পার তুমি) বাড়ির ইজ্জৎ আমার কাছে অনেক কিছু, তুমি নও।"

' "কী? কী বলছ তুমি?"

' "যাও এখান থেকে! দোহাই তোমার, চলে যাও!"

'যেন ব্যাপারটা কী বোঝে নি এমন ভান করল, হয়ত বা সত্যিই বোঝে নি, ক্রুদ্ধ অপমানিতভাবে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু চলে না গিয়ে ঘরের মাঝখানটায় দাঁড়াল।

' "সত্যি সত্যি তুমি অসম্ভব হয়ে পড়েছ," শুরু করল বলতে। "তোমার সঙ্গে স্বর্গের দেবী পর্যন্ত ঘর করতে পারবে না।" বরাবরকার মতো আমার সবচেয়ে দুর্বল জায়গাটায় ঘা দেবার চেষ্টা করে আমার বোনের সঙ্গে সেই ব্যাপারটির কথা মনে করিয়ে দিল

(রাগের মাথায় বোনকে যাতা বলেছিলাম; স্মৃতিটি আমার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর, সেটা জানা ছিল বলে এখন কথাটা আবার পাড়ল।) "ওর পর, তোমার কোনোকিছুতে আমার অবাক লাগে না," আমার স্ত্রী বলল।

'মনে মনে বললাম, "তোমার ইচ্ছেটা হল আমাকে অপমান করা, নিচু করা, অপদস্থ করা, আর তারপর দোষটা আমার ওপর চাপানো।" হঠাৎ ওর প্রতি এমন একটা ঘৃণা আমাকে পেয়ে বসল যে আগে কখনো সে রকম হয় নি।

'আর এই প্রথম ইচ্ছে হল ঘৃণাটার দৈহিক প্রকাশ দেখাই। লাফিয়ে উঠে গেলাম ওর দিকে, কিন্তু মনে আছে লাফাবার সঙ্গে সঙ্গে হুঁশ হল কী করছি, নিজেকে শুধালাম, রাগের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়াটা উচিত কী না, জবাব দিলাম উচিত, কেননা তাহলে ও ভয় পাবে। তাই ঘৃণা না দাবিয়ে সেটা জ্বালিয়ে তুললাম, অন্তরে ঘৃণার তোলপাড় চলেছে অনুভব করে খুসিই লাগল।

'"খুন করে ফেলব, চলে যাও বলছি," কাছে গিয়ে হাতটা সজোরে চেপে ধরে বললাম চেঁচিয়ে। বলার সময়ে ইচ্ছে করে ঘৃণার সুরটায় জোর দিলাম, আমাকে নিশ্চয়ই ভয়াবহ দেখাচ্ছিল, কেননা ও এত

ভয় পেল যে, নড়ার ক্ষমতা চলে গেল। শুধু বলল:

' "ভাসিয়া এ কী, কী হয়েছে তোমার?"

' "বেরিয়ে যাও!" আরো জোরে গর্জিয়ে বললাম। "আমাকে রাগে পাগল করে দাও তুমি। কিছু করে বসলে আমি দায়ী নই বলছি।"

'ক্রোধের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে উল্লাসমত্ত আমি, ইচ্ছে হল বন্য আবেগের চরম তীব্রতা জাহির করার জন্য অসাধারণ কিছু একটা করি। তীব্র বাসনা হল ওকে মারি, খুন করি, কিন্তু জানতাম সেটা করা চলবে না, তাই রাগ প্রকাশের জন্য কাগজ-চাপাটা এক ঝটকায় তুলে নিয়ে ওর পাশ দিয়ে ছুঁড়ে মারলাম, চেঁচিয়ে বললাম, "বেরিয়ে যাও!" পাশ ঘেঁষে মারার লক্ষ্যটা খাসা হয়েছিল, কাগজ-চাপাটা ওর গায়ে না লেগে পেরিয়ে গেল। তখন বেরিয়ে গেল ও, থামল দোরগোড়ায়। ও তখনো দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছে আমি কী করি (দেখাবার জন্যই করলাম) আমি লেখার টেবিলের জিনিসগুলো, বাতিদান কটা, দোয়াতদানিটা তুলে মেঝেতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলাম।

' "বেরিয়ে যাও!" চেঁচিয়ে বললাম। "বেরিয়ে যাও! কিছু করে বসলে আমি দায়ী নই বলছি!"

'ও চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমি থামলাম।

'ঘণ্টা খানেক পরে আয়া এসে খবর দিল স্ত্রীর

হিস্টিরিয়া হয়েছে। গেলাম ওর কাছে। দেখলাম ও কাঁদছে, হাসছে, বলতে পারছে না কিছু, সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। ভান করছিল না, সত্যি অসুস্থ।

'সকালের দিকে ও শান্ত হল, আর যে জিনিসটাকে প্রেম বলা হয় তার কৃপায় আমাদের হল পুনর্মিলন।

'সকালে যখন ত্রুখাচেভস্কির প্রতি আমার ঈর্ষা স্বীকার করলাম, একটুও বিব্রতভাব দেখাল না ও, অত্যন্ত স্বাভাবিক একটা হাসি হেসে শুধু বলল ত্রুখাচেভস্কির মতো মানুষের প্রতি আসক্ত হবার সম্ভাবনা তার কাছে অদ্ভুত লাগে।

' "ওরকম একটা লোকের প্রতি কোনো ভব্য মেয়ের বিন্দুমাত্র আসক্তি হতে পারে? গান বাজনার আনন্দটা শুধু, আর কিছু নয়। তুমি যদি চাও, ওর সঙ্গে আর কখনো দেখা করবো না, এমনকি রবিবারে নয়, যদিও সেদিন সবাইকে আসতে বলা হয়েছে। আমার শরীর খারাপ বলে একটা চিঠি ওকে পাঠিয়ে দাও, ব্যস তাহলেই সবকিছু চুকে যাবে। আমার দুঃখটা শুধু এই যে, কেউ, বিশেষ করে ও লোকটা, নিজেকে ভাববে যে, সর্বনাশ করার ক্ষমতা তার আছে। এরকমটা ভাবতে দেওয়া আমার গর্বে বাধে।"

'ও মিথ্যে কথা বলছিল না; যা বলল তাতে ওর নিজের বিশ্বাস ছিল। ওর আশা ছিল নিজের এসব

কথার ফলে লোকটাকে ঘৃণার চোখে দেখতে পারবে, ওর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে, কিন্তু ব্যর্থকাম হল ও। সবকিছু ওর বিরুদ্ধে, বিশেষ করে পোড়ার গান-বাজনা। এই ভাবেই মিটল, রবিবারে আমাদের অতিথিরা এলেন, আমার স্ত্রী ও লোকটা বাজিয়ে তাঁদের শোনাল।'

২৩

'আমি যে, অহঙ্কারী লোক, সেটা বলার প্রয়োজন বোধহ'য় নেই; অহঙ্কার না থাকলে আমাদের সমাজে বেঁচে থাকার মতো কী আর আছে? তাই রবিবারে রুচিবাগীশের মতো খানাপিনা আর সান্ধ্যসঙ্গীতের আয়োজন করলাম। নিজে খাবার কিনলাম, অতিথিদের নেমন্তন্ন করলাম নিজে।

'ছ'টার মুখে এলেন তাঁরা, লোকটিও হাজির, পরনে ফ্রক কোট, রুচিহীন হীরের বোতাম, অত্যন্ত গায়ে পড়া ভাব, সায় দিয়ে, বুঝদারের হাসি হেসে তাড়াতাড়ি সব উত্তর দিল, বুঝেছেন তো, মুখের সেই বিশেষ ভাবটা তাতে প্রকাশ পেল যে, সবাই যাকিছু বলছে বা করছে আগে থেকে ওর জানা। ওর ভব্যতার অভাবের প্রত্যেকটি লক্ষণ দেখে বিশেষ আনন্দ পেলাম, সেটা আমাকে স্বস্তি জোগাল, প্রমাণ

করল যে লোকটা আমার স্ত্রী যেমনটি বলেছিল ওর অনেক নিচুতে, এত নিচুতে যে, তাতে আসক্ত হবার মতো হেয় নিজেকে ও করবে না। ঈর্ষার হাতে আমি আর আত্মসমর্পণ করলাম না। প্রথমত, ঈর্ষায় ভুগেভুগে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল; দ্বিতীয়ত, আমার স্ত্রীর আশ্বাসে বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম, বিশ্বাস করলামও। ঈর্ষা ছিল না বটে, তবু খাওয়াদাওয়া ও গানবাজনার আগের সমস্ত সময়টা দুজনের কারো সান্নিধ্যে স্বচ্ছন্দ লাগে নি, ওদের গতিবিধি, ওদের দৃষ্টি বিনিময় দেখছিলাম বারবার।

'খাওয়াদাওয়ার পর্বটা যেমন হয়ে থাকে, তেমন একঘেয়ে, মেকি। গানবাজনা শুরু হল বেশ আগেভাগে। সেদিন সন্ধ্যার খুঁটিনাটি সমস্তকিছু আমার মনে কী দাগ কেটেই না বসেছে! মনে আছে বাক্সটা খুলে কোনো একটি মেয়ের হাতের কাজ করা ঢাকনাটা সরিয়ে ভায়োলিনটা ও বের করল, তারপর সুর বাঁধতে লাগল। মনে আছে নিজের সলজ্জভাব (বাজাতে পারে বলেই প্রধানত লজ্জার ভাবটা) ঢাকার জন্য ঔদাসীন্যের ভান করল আমার স্ত্রী, মনে আছে মুখে সেই কপট ভাব নিয়ে বসল পিয়ানোয়। তারপর বরাবরের মতো "ধা" এ টিপে বেহালায় সুর বাঁধা, স্বরলিপি ঠিক করা। মনে আছে ওদের দৃষ্টি বিনিময়, সমবেত

অতিথিদের দিকে তাকানো, নিজেদের মধ্যে কী যেন বলা, তারপর বাজাতে শুরু করা। প্রথম কর্ডটি বাজাল আমার স্ত্রী। নিজের সুরের প্রতীক্ষায় কান পেতে, পিয়ানোতে সাড়া দিয়ে সাবধানী আঙুলে ভায়োলিনের তারে চাপ দিল লোকটি, তখন ওর মুখের গম্ভীর কঠিন সুন্দর ভাবটির কথা মনে আছে। এবং শুরু হল...'

থেমে ভদ্রলোকটি পরপর কয়েক বার সেই আওয়াজটা করলেন। আবার কথা বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে, থেমে গেলেন।

'ওরা বিঠোফেনের ক্রয়টজার সোনাটা বাজাল। প্রথম প্রেস্টোটি আপনার মনে আছে? মনে আছে?' চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। 'উঃ! সোনাটাটা কী ভয়াবহ! বিশেষ করে প্রথম প্রেস্টোটা। আর মোটের ওপর সঙ্গীত জিনিসটাই ভয়াবহ। জিনিসটা কী? আমি তো বুঝি না। সঙ্গীত জিনিসটা ঠিক কী? কী করে জিনিসটা? আর কেন করে? লোকে বলে মানুষের মন উন্নত হয় সঙ্গীতের প্রভাবে। ছেঁদো কথা। মিথ্যে কথা। প্রভাব আছে সন্দেহ নেই, প্রভাবটা সাংঘাতিক, আমি শুধু নিজের কথা বলতে পারি, কিন্তু মনকে উন্নত করার মতো প্রভাব নয়। সঙ্গীতে মন উন্নত বা হীন, কিছুই হয় না; সঙ্গীত শুধু

উত্তেজনা জোগায়। কথাটা ঠিক কী করে বোঝাই? সঙ্গীতে আমি নিজের কথা, আমার সত্যিকারের অবস্থার কথা ভুলে যাই; আমাকে এমন একটা অবস্থায় তুলে ধরে যেটা আমার নিজস্ব নয়। সঙ্গীতের ঝোঁকে কল্পনা করি অনেক জিনিসের অনুভূতি হচ্ছে, অনেক জিনিস বুঝতে পারছি, সেগুলো সত্যি সত্যি কিন্তু অনুভব করি না, বুঝি না, মনে হয় অনেক জিনিস করতে পারি, কিন্তু সেগুলো সত্যি আমার সাধ্যের বাইরে। আমার বক্তব্যটা বুঝিয়ে বলতে পারি এইভাবে যে, আমার ওপর সঙ্গীতের প্রতিক্রিয়াটা হাই তোলা বা হাসির মতো: ঘুম নেই চোখে, কিন্তু কেউ হাই তুললে, আমিও তুলি; হাসার মতো কিছু নেই, কিন্তু অন্য কেউ হাসলে আমিও হাসি।

'সঙ্গীত শোনামাত্র সুরকারের ধ্যানের অবস্থায় গিয়ে পড়ি। আমার আত্মা বিলীন হয় সুরকারের আত্মায়, এক ভাব থেকে অন্য ভাবে তার যাত্রায় সহচর হই, কিন্তু কেন যে আমাকে এই ভাবান্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয় বলতে পারি না। সুরকার কিন্তু — ধরুন ক্রয়টজার সোনাটার রচয়িতা বিঠোফেন — জানতেন কেন তাঁর এই বিশেষ ভাব। সে মনোভাব থেকে তিনি কয়েকটি ক্রিয়ার সাধক, তাই তাঁর কাছে ভাবটির অর্থ আছে, কিন্তু কোনো অর্থ নেই আমার কাছে। আর

তাই সঙ্গীত কেবল উত্তেজনা জোগায়, শেষ হয় না। অবশ্য সামরিক বাজনা বাজালে সৈন্যরা মার্চ করে চলে যায়, সঙ্গীতের উদ্দেশ্য সফল হয়। নাচের বাজনা বাজল, নাচলাম, সঙ্গীত সার্থক হল। ধর্মসঙ্গীতের বেলায় একই কথা, আমি স্যাক্রামেণ্ট নিলাম, ব্যস। কিন্তু এ শুধু উত্তেজনা, তার জন্য কী করতে হবে, তা কিছু নেই। সঙ্গীতের প্রভাব তাই এত ভয়ঙ্কর, মাঝে মাঝে এত ভয়াবহ। চীনদেশে রাষ্ট্রিক আওতার মধ্যে সঙ্গীত পড়ে। আর সেটাই উচিত। ইচ্ছে হলেই কেউ অন্য কাউকে এমনকি অনেককে যাদু করে তাকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নিচ্ছে, সেটা কি অনুমোদন-যোগ্য? যাদুকার আবার নীতিজ্ঞানবর্জিত অধঃপতিত লোক, সবচেয়ে খারাপ হল সেটা।

'অস্ত্রটি ভয়াবহ, যার তার হাতে দেবার মতো নয়। ক্রয়টজার সোনাটার কথাটা ধরুন, প্রথম প্রেস্টোটা। ড্রয়িং-রুমে গলা খোলা জামা-পরা মেয়েদের সামনে প্রেস্টোটা বাজানো কি যায়? বাজানো হল, হাততালি, তারপর আইসক্রীম খাওয়া আর একেবারে হালের নানা গলপগুজব। এধরনের সঙ্গীত বাজানো উচিত শুধু নির্দিষ্ট অর্থ-ও গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে, সঙ্গীতের অনুযায়ী নির্দিষ্ট, অর্থপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদনের প্রয়োজন যখন থাকে শুধু তখনি। বাজানোর

পরে সুরের প্রতিক্রিয়ায় যে কাজের উদ্যম আসে, তা করা চাই। তা না হলে স্থান ও কালের অনুপযুক্ত, উদ্যমহীন এইসব রুদ্ধ অনুভূতি সর্বনাশ বাঁধাবে, সন্দেহ নেই। আমার ওপর অন্তত এই সঙ্গীতের প্রতিক্রিয়াটি হয়েছিল সর্বনেশে। একেবারে নতুন সব অনুভূতি ও সম্ভাবনার জগৎ আমার কাছে খুলে গেল, যাদের বিষয়ে আমার কোনো চেতনা আগে ছিল না। মনে হল ভেতরে আমার কেউ বলছে, আরে এই তো, এইভাবে, তুমি যেমন ভাবতে, যেমন থাকতে সে রকম মোটেই নয়। নতুন ঠিক কী জানলাম, বলতে পারি না, কিন্তু নতুন অবস্থাটির চেতনা আনন্দ জোগাল আমাকে। চেনা সব লোকজনকে, আমার স্ত্রী ও সেই লোকটাকেও, দেখলাম একেবারে নতুন আলোয়।

'প্রেস্টোর পরে ওরা andante* বাজাল, মিঠে কিন্তু গতানুগতিক সেটা, বিস্তারটা সূক্ষ্ম নয়, শেষটা কাঁচা। অতিথিদের উপরোধে আরো কয়েকটি সুর ওরা বাজাল — আরন্স্টের** একটি শোক সঙ্গীত বোধহয়, কিম্বা অন্য কিছু। সুরগুলো ভালো বটে, কিন্তু প্রথমটি আমার মনে যে দাগ কেটেছিল, তার শতাংশের

---

* ধীর লয়ে বাদিত সঙ্গীতাংশ বা আলাদা গীত।

** আরন্স্ট হেনরিখ ভিলহেল্ম (১৮১৪—১৮৬৮) — বিখ্যাত অস্ট্রীয় বেহালা-বাদক, বহু বেহালা সঙ্গীতের রচয়িতা।

একাংশ নয়। আমার মনে প্রথমটির প্রভাবের পটভূমিকায় অন্য সুরগুলি শুনলাম। বাকি সন্ধ্যাটা খুশিতে, হালকা মেজাজে আমার কাটল। সে দিন সন্ধ্যায় আমার স্ত্রীরও যে ভাব, তা আগে কখনো দেখি নি। চোখে দীপ্তি, বাজানোর সময়ে মুখভাবের গাম্ভীর্য ও অর্থঘনতা, সমাপ্তির সময়ে ওর সম্পূর্ণ অসহায় ভাব, ওর অস্ফুট হাসি, চরম সুখের ছাপ তাতে, অথচ করুণ। সবকিছু চোখে পড়ল, কিন্তু অন্য কোনো অর্থ আরোপ করলাম না, অর্থ শুধু এই করলাম যে আমার মতো ওরও কাছে খুলে গেছে নতুন অননুভূত সব আবেগ, যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে তা। সন্ধ্যেটা শেষ হল ভালোভাবে, সবাই বাড়ি চলে গেল।

'দিন দুয়েকের মধ্যে সম্মেলনে যাব ত্রুখাচেভস্কি জানত, বিদায় নেবার সময় বলল, আজকের সন্ধ্যেটা যা উপভোগ করেছে, আশা করে পরের বার এসে আবার তার পুনরাবৃত্তির হবে। তাহলে আমার অবর্তমানে আমাদের বাড়িতে আসা অসম্ভব মনে করে ও, কথাটার এই মানে করে খুশি লাগল। ও চলে যাবার আগে সম্মেলন থেকে ফিরব না, তাই ধরে নিলাম, ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না।

'এই প্রথম আন্তরিক প্রীতির সঙ্গে ওর করমর্দন করলাম, যে আনন্দ দিয়েছে, তার জন্য ধন্যবাদ

জানালাম। যেন অনেক দিনের জন্য চলে যাচ্ছে, এমন ভাবে ও আমার স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিল। মনে হল, ওদের বিদায় নেওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও ভব্য, সমস্ত কিছু চমৎকার, আমার স্ত্রী ও আমি সন্ধ্যেটা নিয়ে বেজায় খুশি।'

২৪

'দুদিন পরে বেশ সহজভাবে স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খোশমেজাজে উয়েজদ'এ রওনা হলাম। উয়েজদে হামেশা একটা না একটা কিছু লেগে থাকে, কাজের আর শেষ নেই, উয়েজদের জীবনটা আলাদা, জীবনযাত্রার ধরণটা নিজস্ব। প্রথম দুটো দিন কাছারিতে এক নাগাড়ে দশ ঘণ্টা করে রইলাম। তৃতীয় দিনে আমার স্ত্রীর একটা চিঠি পেলাম। তক্ষুনি পড়লাম সেটা। লিখেছে ছেলেমেয়েদের কথা, কাকা, আয়া আর কেনাকাটার কথা, তারপর হঠাৎ কথাচ্ছলে, যেন অত্যন্ত সামান্য একটা ব্যাপার, লিখেছে যে, ত্রুখাচেভস্কি যে কয়েকটি স্বরলিপি আনার কথা দিয়েছিল সেগুলো নিয়ে এসেছিল, বাজাতে চেয়েছিল, কিন্তু সে রাজী হয় নি। ওকে স্বরলিপি এনে দেবার কথা দিয়েছিল বলে মনে পড়ল না; আমার তো ধারণা হয়েছিল,

আমার স্ত্রীর কাছ থেকে ও শেষ বিদায় নিয়েছে, তাই অপ্রীতিকর ও অবাক লাগল। কিন্তু এত কাজ ছিল যে, সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ফিরে চিঠিটা আবার না পড়া পর্যন্ত ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর পাই নি। তখন মনে হল, আমার অবর্তমানে ত্রুখাচেভস্কির আসার খবরটা ছাড়াও ওর চিঠির সমস্ত ধরণটা কেমন আড়ষ্ট। গুহায় গর্জিয়ে উঠল ঈর্ষার বুনো জানোয়ার, লাফিয়ে বেরতে চাইছিল কিন্তু জোর করে সেটাকে দাবালাম, ওর ভয়াবহ শক্তিতে আমার এত ভয়। নিজেকে বললাম, "ঈর্ষাটা কী নীচ অনুভূতি! ও আমাকে যা লিখেছে, তার চেয়ে স্বাভাবিক আর কী হতে পারে?"

'শুয়ে পড়লাম, ভাবতে লাগলাম পরের দিনের নানা কাজের কথা। সম্মেলনের সময়ে অচেনা জায়গায় সাধারণত সহজে আমার অনেকক্ষণ ঘুম আসে না, কিন্তু সে রাত্রে খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু হঠাৎ, মাঝে মাঝে যেমন হয়, যেন বিজলীর আঘাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে ওর কথা, ওর প্রতি আমার কামানুরাগের কথা, ত্রুখাচেভস্কির কথা। মনে হল ওদের দুজনের মধ্যে যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। বিভীষিকা আর চণ্ডাল রাগে বুক আড়ষ্ট হয়ে গেল। নিজের সঙ্গে যুক্তিতর্ক শুরু করলাম। বললাম নিজেকে,

"সব বাজে কথা। এমন ভাবার কোনো কারণ নেই; ওদের দুজনের মধ্যে কিছু হয় নি, কিছু ছিল না কখনো! এরকম একটা ভয়াবহ কথা ধরে নিয়ে ওকে এবং নিজেকে নীচু কী করে করতে পারি? দুর্নামওয়ালা ভাড়াটে বাজিয়ে একটা, আর ও হল ভদ্রঘরের মেয়ে, ছেলেমেয়ের মা, শ্রদ্ধেয়া স্ত্রী! কী বেখাপ্পা ব্যাপার!" যুক্তিতর্কের একটা দিক হল এটা, কিন্তু অন্যটা হল: "কেনই বা হবে না?" সহজ, সাধারণ ব্যাপারটা ছাড়া আর কী হতে পারে শুনি? ওটার জন্যই তো ওকে বিয়ে করেছি, ওটার জন্যই তো ওর সঙ্গে থাকি। ওর কাছ থেকে শুধু ওটাই তো আমি চাই, সবাই ওটাই চায় ওর কাছে, বাজিয়েটাও। লোকটা অবিবাহিত, স্বাস্থ্যটি খাসা, (কাটলেটের হাড়টা দাঁতের জোরে কড়মড় করে ভেঙ্গে ফেলে লাল ঠোঁটে এক পাত্তর মদ এক চুমুকে সাবাড় করেছিল, মনে পড়ে গেল), চেহারাটি মসৃণ, নধর, ওর কোনো নীতিবোধ নেই শুধু তা নয়, ওর একমাত্র নীতি হল হাতের কাছে সুখের সুযোগ এলে কখনো না ছাড়া। আর ও এবং আমার স্ত্রী সঙ্গীতের ডোরে-বাঁধা, কাম জাগানোর এর চেয়ে সূক্ষ্ম মোদক আর কিছু নেই। ওকে সংযত করার মতো কী আছে? কিছু নেই। বরং লোকটাকে উৎসাহ দেবার খোরাকের অভাব নেই। আর

আমার স্ত্রী? কে সে? একটা হেঁয়ালি, বরাবরকার মতো হেঁয়ালি। ওকে আমি চিনি না। আমি শুধু চিনি ওর পশু প্রকৃতিকে। আর পশু কোনো বাধা মানে না, সংযত থাকার কথা নয় তার।

'সেদিন সন্ধ্যায় ক্রয়টজার সোনাটা বাজাবার পর আবেগে তীব্র, ইন্দ্রিয়ের লাস্যে-ভরাট ছোট্ট একটা সুর — কার রচনা ভুলে গিয়েছি — ওরা বাজায়, সে সময়ে ওদের মুখের ভাবটা শুধু তখনি মনে পড়ল। মনে পড়াতে ভাবলাম, "ওখান থেকে কী করে চলে আসতে পারলাম? সে দিন সন্ধ্যায় সবকিছু ওদের মধ্যে ঘটেছিল, সেটা কি অতি স্পষ্ট নয়? স্পষ্ট নয় যে, সেদিন সন্ধ্যায় ওদের মধ্যে কোনো বাধা তো ছিলই না, দুজনের মধ্যে যা ঘটেছে তা নিয়ে ওরা দুজনে কিছু লজ্জিত ছিল, বিশেষ করে আমার স্ত্রী?" মনে পড়ল ওর ক্ষীণ, করুণ চরম সুখে-ভরা সেই হাসি, আমি পিয়ানোর কাছে যাওয়াতে কী ভাবে নিজের রক্তিম, স্বেদাক্ত মুখ ও মোছে। এমনকি তখনি তারা পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় এড়িয়ে চলছে; সাপারের সময়ে শুধু লোকটা ওকে যখন জল ঢেলে দেয়, তখন পরস্পর তাকায় ওরা, মুখে ফোটে মৃদু হাসি। গভীর বিভীষিকায় সেই দৃষ্টি, সেই চকিত হাসির কথাটা মনে হল। কে যেন বলল, "সব শেষ",

আর একটা স্বর শুনলাম বলছে সম্পূর্ণ অন্য কথা। বলছে, “তোমার কী যেন একটা হয়েছে। এটা হতে পারে না।” অন্ধকারে শুয়ে থাকা অসহ্য লাগল। দেশলাই জ্বালালাম। হলুদ দেয়ালকাগজ-লাগানো ছোট্ট ঘরটায় ভয় হল। সিগারেট ধরিয়ে খেতে লাগলাম, কোনো অসাধ্য সমস্যার একই চক্রে ঘুরপাক খেতে থাকলে সর্বদা আমি তাই করি। ধূমপান করছি তো করছি, একটার পর একটা সিগারেট, যাতে করে অনুভূতি ভোঁতা হয়ে আসে, সমস্যাটা চোখে না পড়ে।

‘সারারাত ঘুম এল না। পাঁচটা বাজল, মনস্থির করে ফেললাম এ যন্ত্রণা অসহ্য, এক্ষুনি বাড়ি রওনা হতে হবে, আর তক্ষুনি উঠে পড়ে, যে চৌকিদার আমার কাজ করত, তাকে জাগিয়ে ঘোড়া ডাকতে পাঠালাম। বিশেষ জরুরী কাজে মস্কোতে আমার ডাক পড়েছে বলে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলাম সম্মেলনে, অনুরোধ জানালাম যেন আমার জায়গায় অন্য কাউকে নিযুক্ত করে। আটটার সময়ে একটা টারানন্তাসে চেপে রওনা দিলাম।’

২৫

কামরায় কণ্ডাক্টর এল। মোমবাতিটা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে দেখে নিভিয়ে দিল সেটা, নতুন বাতি

আর দিল না। বাইরে আকাশ ফরসা হয়ে আসছে। গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বসে রইলেন পজ্দ্নীশেভ, কণ্ডাক্টর যাওয়া না পর্যন্ত চুপ করে থাকলেন। ও চলে গেলে পর আবার নিজের কাহিনী শুরু করলেন; আবছা কামরায় আর কোন শব্দ নেই, শুধু দুলন্ত ট্রেনের জানলার কিঁচকিঁচ আর দোকান-কর্মচারীটির একটানা নাক ডাকানো। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় পজ্দ্নীশেভকে দেখতে পারছি না একেবারে, শুধু শুনতে পাচ্ছি তাঁর গলার স্বর, বিক্ষোভ ও যন্ত্রণার টান তাতে ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে।

'ঘোড়ার গাড়িতে পঁয়ত্রিশ ভার্স্ট আর ট্রেনে আটঘণ্টা কাটাতে হল আমাকে। টারান্তাসে যাত্রা চমৎকার লাগল। হেমন্তের কনকনে সকাল, আকাশে দীপ্ত সূর্য — জানেন নিশ্চয়, সে ধরণের সকাল যখন আর্দ্র রাস্তায় গাড়ির টায়ার গভীর দাগ কেটে যায়। রাস্তা মসৃণ, ঝকঝকে আলো, সঞ্জীবনী হাওয়া। তারান্তাসে চেপে যাওয়াটা অপরূপ লাগল। ভোর বেলায় যাত্রা করে আমার মেজাজটা আগের চেয়ে হালকা হল। ঘোড়া, মাঠঘাট, পথ-চলতি লোকজনকে দেখতে দেখতে ভুলে গেলাম কোথায় যাচ্ছি। মাঝে মাঝে মনে হল ঘোড়ার গাড়ি চেপে বেড়াতে বেরিয়েছি শুধু, যাত্রার কারণগুলো একেবারে কাল্পনিক। ভুলে

যেতে পারাতে বিশেষ আনন্দ বোধ করলাম। কোথায় যাচ্ছি মনে পড়লেই নিজেকে বলছিলাম: "ভেবো না কিছু; দেখা যাক কী হয়।" মাঝপথে একটা জিনিস ঘটল, তাতে আমার দেরী হয়ে গেল, আরো বেশি মনটা গেল অন্যদিকে: টারান্তাসটা অচল হয়ে পড়াতে সারাতে হল সেটাকে। দুর্ঘটনাটির পরিণাম বিরাট: এর জন্য এক্‌স্‌প্রেস ট্রেনটা ধরতে পারলাম না, যেতে হল প্যাসেঞ্জার ট্রেনে, ভেবেছিলাম মস্কোয় পেঁছিব পাঁচটার সময়, পেঁছিলাম মাঝ রাত্তিরে; বাড়িতে এলাম বারোটার পর। গাড়ি খোঁজা, মেরামত, হিসেব নিকেশ চুকোনো, পথের সরাইখানায় চা পান, জমাদারের সঙ্গে কথাবার্তা — এ সব জিনিসে ব্যাপৃত রইল আমার মন। সন্ধ্যার মধ্যে সব ঠিক, আবার যাত্রা শুরু হল, আর গোধূলিতে যাত্রাটি এমন কি সকালের চেয়েও প্রীতিকর লাগল। শুক্লপক্ষের চাঁদ আকাশে, অল্প বরফ পড়েছে, রাস্তাটা অদ্ভুত ভালো, ঘোড়াগুলো খাসা, সহিসটি ফূর্তিবাজ, সব মিলিয়ে দারুণ ভালো লাগছিল, আমার কপালে কী আছে তা নিয়ে বলতে গেলে আর ভাবছিলাম না; হয়ত কী আমার কপালে আছে জানতাম বলেই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করে নিচ্ছিলাম, বিদায় নিচ্ছিলাম জীবনের সব আনন্দের কাছ থেকে। কিন্তু আমার এই স্থৈর্য, নিজের

অনুভূতি দাবিয়ে রাখার ক্ষমতা টারান্তাসে যাত্রা শেষের সঙ্গে সঙ্গে উবে গেল। রেলকামরায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ আলাদা একটি অনুভূতি। রেলে আটঘণ্টার সেই যাত্রার যন্ত্রণা যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন মনে থাকবে। যন্ত্রণার কারণ, বোধ হয়, এই: কামরায় ঢুকে মনে হয়েছিল বাড়িতে প্রায় এসে গিয়েছি, কিম্বা হয়ত রেল ভ্রমণ লোকের স্নায়ুকে উত্তেজিত করে। কারণ যাই হোক, কামরায় বসার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কল্পনাকে আর বাগ মানাতে পারলাম না, আমার ঈর্ষাকে উত্তেজিত করে সে কল্পনা একটার পর একটা অত্যন্ত স্পষ্ট ছবি জোগাতে লাগল, প্রত্যেকটি ছবি উত্তরোত্তর নির্লজ্জ, আর সবই কেবল অনুপস্থিতিতে কী ঘটল, কেমন করে স্ত্রী আমাকে ঠকিয়েছে, তাই নিয়ে। রাগে, বিদ্বেষে দগ্ধে যাচ্ছিলাম, এ সব ছবির কথা ভেবে নিজের অবমাননাতেই কেমন একটা মত্ততা বোধ হচ্ছিল! ছবিগুলো থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে, সরে আসতে, মুছে দিতে তাদের, মানসচক্ষে না দেখে পারলাম না। আর কল্পিত ছবিগুলো নিয়ে যত ভাবছি, তত তাদের বাস্তবতায় বিশ্বাস বাড়ছে। আমার কাছে ছবিগুলো এত জ্বলজ্বলে যে, তাতেই যেন প্রমাণ হচ্ছিল আমার কল্পনাগুলো বাস্তব। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো

একটা শয়তান যেন নানা ভয়াবহ কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছে আমায়। ত্রুখাচেভস্কির ভাই-এর সঙ্গে বহুবছর আগেকার একটি আলোচনা মনে পড়ে গেল, সেটির সঙ্গে ত্রুখাচেভস্কি ও আমার স্ত্রীকে জড়িয়ে কী একটা উল্লাসে নিজের হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করলাম।

'আলোচনাটি হয়েছিল বহু বছর আগে, তবু মনে পড়ে গেল। বেশ্যালয়ে যায় কি না জিজ্ঞেস করাতে ত্রুখাচেভস্কির ভাই বলেছিল, ভদ্রলোকে ওখানে যাবে কেন, ভদ্রঘরের মেয়ের তো অভাব নেই, ওখানে রোগের ভয়, তাছাড়া মোটামুটি জায়গাটা জঘন্য ও নোংরা। আর দেখ দিকি! ওর ভাই বাগিয়েছে আমার স্ত্রীকে। ''অবশ্য একেবারে প্রথম যৌবন নয়, পাশে একটা দাঁত নেই, একটু বেশী মোটাসোটা,'' ত্রুখাচেভস্কির হয়ে কথা জোগাচ্ছি আমি, ''কিন্তু কী আর করা যায়; যার অদৃষ্টে যা জোটে!'' নিজেকে আমি বললাম, "হ্যাঁ, রক্ষিতা করে আমার স্ত্রীকে ও কৃতার্থ করে দিচ্ছে। কিন্তু ওর কাছ থেকে রোগ হবার তো কোনো ভয় নেই!'' তারপর গভীর আতঙ্কে নিজেকে বললাম, "না না, এ যে অসম্ভব! কী সব ভাবছি আমি? ওরকম কিছু ঘটে নি, কিছু না। ওরকম কিছু ধরে নেবার এতটুকু কারণ নেই। ও কি বলে নি, এরকম একটা লোককে নিয়ে ঈর্ষা করাটা ওর পক্ষে

অপমানকর? বলেছিল বটে, কিন্তু মিথ্যে কথা সেটা, মিথ্যে কথা!'' মনে মনে চেঁচিয়ে বললাম তারপর আবার সবকিছু শুরু হল... কামরায় মাত্র আর দুজন যাত্রী — একটি বৃদ্ধা ও তার স্বামী, দুজনেই অত্যন্ত স্বল্পভাষী। একটা স্টেশনে তারা নেবে গেলে আমি একেবারে একলা, অবস্থাটা হল খাঁচায় পোরা জানোয়ারের মতো, এক একবার লাফিয়ে উঠে জানলার কাছে যাচ্ছি, তক্ষুনি আবার টলতে টলতে পায়চারি করছি, যেন তাতে ট্রেনের গতিবেগ বাড়বে। কিন্তু জানলা আর বেঞ্চ নিয়ে খটখটিয়ে ট্রেন চলল নিজের বেগে, আমাদের ট্রেনটা এখন যেমন যাচ্ছে।'

লাফিয়ে উঠে দু'একবার পাক খেয়ে আবার বসলেন পজ্‌দ্‌নীশেভ।

'ট্রেনে যেতে আমার ভয়, ভয়ানক ভয়, আতঙ্ক হয় সর্বদা; হ্যাঁ, ট্রেনে যাওয়াতে আমার আতঙ্ক,' বলে চললেন তিনি। 'নিজেকে বললাম, ''অন্য কথা ভাবি, এই ধরো যেখানে চা খেয়েছিলাম, সেই সরাইখানার কর্তার কথাটা।'' আর মানসচক্ষে দেখলাম লম্বা দাড়িওয়ালা জমাদার ও তার বাচ্চা নাতিকে, বাচ্চাটার বয়স হবে আমার ভাসিয়ার মতো। আমার ভাসিয়া! একদিন ও দেখবে বাজিয়েটা তার মা'কে চুমু খাচ্ছে! তখন বেচারীর মনে কী হবে! কিন্তু

তাতে ওর মায়ের কী! উনি প্রেমে পড়েছেন... আবার সেই একই জিনিস। না, না, স্থানীয় হাসপাতাল দেখতে গিয়েছিলাম, সেটার কথা ভাবি। কাল রুগীটা ডাক্তারের নামে কেমন নালিশ করল। ডাক্তারটার গোঁফটা গ্রুখাচেভস্কির মতো। কী বেহায়া লোকটা — চলে যাব বলে দুজনেই ওরা আমাকে ধাপ্পা দিয়েছিল। আবার শুরু। প্রত্যেকটি জিনিস, যাকিছু ভাবছি তার সঙ্গে ওর যোগাযোগ। অসহ্য যন্ত্রণা, সবচেয়ে বড়ো যন্ত্রণার মূলে আমার অজ্ঞতা, আমার সন্দেহ, আমার অনিশ্চয়তা, ওকে ভালোবাসা উচিত না ঘৃণা করা উচিত—জানি না, সেটা। এত গভীর সে যন্ত্রণা, যে মনে আছে কামরা থেকে নেমে রেললাইনে শুয়ে সবকিছু শেষ করার কথাটা ভেবে ভালো লাগল। তাহলে অন্তত সন্দেহ আর অনিশ্চয়তা আমাকে আর দগ্ধে মারবে না। একটি মাত্র জিনিস এটা করতে দিল না আমাকে— আত্ম-করুণা, সঙ্গে সঙ্গেই যাতে আমার স্ত্রীর ওপর গভীর ঘৃণা হত। আর লোকটার ওপর আমার ঘৃণার সঙ্গে জড়িত ছিল নিজের অবমাননা এবং ওর জয়লাভের একটি বিচিত্র বোধ; কিন্তু স্ত্রীর ওপর ঘৃণাটা ছিল, ভীষণ ঘৃণা। "আত্মহত্যা করা চলবে না, তাহলে তো ও ছাড়া পাবে; ওকেও অন্তত খানিকটা যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, আমি যে যন্ত্রণা পেয়েছি

টের পেতে হবে ওকে,'' মনে মনে বললাম। চিন্তার মোড় ঘোরাবার জন্য নামলাম প্রত্যেক স্টেশনে। একটা স্টেশনের রেস্তরাঁয় দেখলাম কয়েক জন মদ খাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে নিজে ভোদকা খেলাম। পাশে দাঁড়িয়ে একটা ইহুদী, সেও মদ খেল। কথা বলতে শুরু করল আমার সঙ্গে, আর নিজের কামরায় যাতে একলা থাকতে না হয়, তাই ওর সঙ্গে গেলাম তৃতীয় শ্রেণীর নোংরা, সিগারেটের ধোঁয়ায়-ভরা কামরায়, মেঝেতে সূর্যমুখী বীজের খোসা ছড়ানো। ওর পাশে বসলাম, ও নানা বিষয়ে বকবক করে চলল, চুটকি গল্প অনেক শোনাল। শুনছিলাম বটে, কিন্তু নিজের ভাবনায় মন ভরা ছিল বলে মাথায় ঢুকল না কিছু। সেটা লক্ষ্য করে ও চাইল ওর কথায় মন দিই। তখন উঠে নিজের কামরায় চলে গেলাম। নিজেকে বললাম, ''ব্যাপারটা ভেবে দেখা দরকার, যা ভাবছি তা সত্যি কি না, যা যন্ত্রণা পাচ্ছি তা পাবার কোনো কারণ আছে কি না।'' শান্তভাবে ভেবেচিন্তে দেখার জন্য বসলাম, কিন্তু শান্তভাবে ভাবা আর হল না, আবার সেই একই জিনিস। যুক্তিসঙ্গত চিন্তার বদলে শুধু ছবি আর কল্পনা। ঈর্ষার আগেকার সব প্রকোপের কথা ভেবে বললাম নিজেকে, ''এর আগে কতবার না এরকম কষ্ট পেয়েছি, আর প্রত্যেকবার দেখা গিয়েছে ব্যাপার কিছু নয়। এবারেও

হয়ত, হয়ত নয়, নিশ্চয় দেখব ও শান্তিতে ঘ্রমোচ্ছে; জেগে উঠে আমাকে দেখে খ্রশি হবে, ওর কথায় আর দৃষ্টিতে টের পাব কিছ্র ঘটে নি, সব আমার উদ্ভট কলপনা শ্রধ্র। তাহলে কী দার্রণ ভালো না হবে?" কার যেন কণ্ঠস্বর বলল, "না; বারবার ওরকমটা ঘটেছে বটে, কিন্তু আর সেরকম হবে না," আর আবার সব শ্রর্র। হ্যাঁ, আমার শাস্তি হল তাই। লালসা সারাবার জন্য ছোকরাদের সিফিলিসের হাসপাতালে নিয়ে যাব না; তাদের দেখাব আমার অন্তরের ভেতরটা, অন্তর যারা ছিঁড়ে খাচ্ছে দেখাব সেই শয়তানদের! আর ভয়াবহ কথা হল এই: আমার স্ত্রীর দেহের উপর একচ্ছত্র, অবিসম্বাদিত মালিকানার দাবী আমার, যেন ওটা আমার দেহ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্রঝলাম যে, ওর দেহ অধিকার করার জোর আমার নেই, দেহটা আমার নয়, ওর খ্রশি মতো সেটা বিলি করতে পারে, আর যেভাবে আমি চাই সেভাবে বিলি করার ইচ্ছে নেই ওর। আর আমি ওর বা লোকটির কিছ্রই করতে পারি না। গানের সেই ভাঙকা-পাহারাওয়ালার মতো লোকটি ফাঁসি কাঠে যাবার সময়ে চিনি-ঢালা ঠোঁটে চুম্বন টুম্বনের গান করবে। আর জয় হবে ওরই। আর স্ত্রীকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা আমার আরো কম। পাপ এখনো আমার স্ত্রী করে নি

হয়ত, করার ইচ্ছে কিন্তু আছে, আমি জানি তার ইচ্ছে আছে, আর তাই ব্যাপারটা আরো খারাপ, বরং কর্ক, কিন্তু আমার জানা থাক, অনিশ্চিত কিছ্ব না থাকে! কী চাইছিলাম আমি বলতে পারি না। যেটা না চেয়ে ওর উপায় নেই সেটা যাতে না চায় তাই চাইছিলাম আমি। সমস্ত জিনিসটা একেবারে পাগলামি!'

২৬

'শেষ স্টেশনের আগেরটায় কণ্ডাক্টর টিকিট নিতে এল, ব্যাগটা তুলে গিয়ে দাঁড়ালাম বাফারে; প্রায় এসে পড়েছি, যবনিকা পতন আসন্ন এই বোধ আমার উত্তেজনাকে আরো বাড়িয়ে দিল। শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, চিব্বক এত কাঁপছে যে দাঁতে ঠকঠক করতে লাগল। যন্ত্রচালিতের মতো ভিড়ের সঙ্গে স্টেশনের বাইরে গেলাম, একটা গাড়ি ডেকে, তাতে চেপে রওনা হলাম। যেতে যেতে দেখলাম রাস্তায় অল্প কয়েকটি লোক, জমাদার, রাস্তার আলোয় বিক্ষিপ্ত ছায়া কখনো আমার গাড়ির সামনে পড়ছে, কখনো বা পিছনে, দেখলাম কিছ্ব না ভেবে। আধ ভার্স্ট যাবার পরে পায়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগল, মনে পড়ল ট্রেনে উলের

মোজাটা খুলে চামড়ার ব্যাগে রেখেছিলাম। ব্যাগটা কোথায় গেল? এখানে? এই যে। আর ঝুড়িটা? মালপত্রের কথা সব ভুলে গিয়েছিলাম, এবার মনে পড়েছে, কিন্তু রসিদটা খুঁজে পেয়ে ভাবলাম, মালপত্রের জন্য ফিরে যাবার কোনো মানে হয় না; এগিয়ে চললাম।

'যতই না চেষ্টা করি, সে সময়ে আমার অবস্থাটা মনে করতে পারি না। কী ভাবছিলাম? কী চাইছিলাম? জানি না, শুধু মনে আছে আমার জীবনে ভয়ঙ্কর কিছু, গভীর গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু ঘটবে, তার চেতনা আমার অন্তরে ছিল। আমার ওই ভাবনা থেকে নাকি আমার পূর্বাভাসের দরুন গভীর গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা ঘটেছিল কিনা জানি না। কিম্বা হতে পারে যা ঘটল, তা ঘটে যাবার পর আমার স্মৃতিতে তার আগেকার সমস্ত মুহূর্তগুলো বিষাদে ভরে উঠেছিল। গাড়িবারান্দায় গাড়ি ঢুকল। বারোটা বেজে গেছে। জানলায় আলো দেখে সোয়ারীর আশায় বাড়ির সামনে কয়েকটা ছ্যাকরা-গাড়ি দাঁড়িয়ে (আলোকিত জানলাগুলো আমাদেরই ফ্ল্যাটে, ড্রয়িং-রুম আর হলে)। এত রাত্তিরে ঘরে আলো কেন না ভেবে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঘণ্টা বাজালাম, তখনো ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটবে তার প্রত্যাশা মনে। চাকর —

বোকাসোকা, ভালোমানুষ, পরিশ্রমী ইয়েগর — দরজা খুলল। প্রথমেই চোখে পড়ল গায়ের অন্যান্য ওভারকোটের সঙ্গে ওর কোটটাও বারান্দায় ঝুলছে। অবাক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হলাম না; যেন এরি অপেক্ষায় ছিলাম। "তাহলে ঠিকই ভেবেছিলাম", মনে মনে বললাম। কে এসেছে জিজ্ঞেস করাতে ইয়েগর বলল, ত্রুখাচেভস্কি। আর কেউ আছে কি না শুধালাম।

' "আর কেউ না, হুজুর," ও বলল।

'মনে আছে এমন সুরে কথাটা ও বলেছিল, যেন আমায় খুশি করতে চায়, আর কেউ আছে এমন সন্দেহ দূর করে দিচ্ছে। "আর কেউ না, বেশ!" যেন বললাম নিজেকে।

' "আর বাচ্চারা?"

' "সবাই ভালো, ভগবানের দয়ায়। অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে।"

'নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, চিবুকের থরথরানি আটকানো দায়। "তাহলে যা ভেবেছিলাম, সেরকম হয় নি। আগে ভাবতাম দুর্বিপাক হবে, দেখা যেত কিছু হয় নি; সবকিছু আগের মতোই। এবারে কিন্তু আগের মতো নয়। মনে মনে যেটা কল্পনা করেছিলাম

এবং ভেবেছিলাম ওটা নেহাৎ কল্পনা সেটা সবই বাস্তব...”

‘আরেকটু হলেই প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠতাম, কিন্তু তক্ষুনি পিশাচ সেই শয়তান কানে কানে বলল, “তুমি কেঁদে কঁকিয়ে একাকার করবে আর ওদিকে ওরা বেশ চুপিচুপি সরে পড়বে, ওদের পাপের কোনো চিহ্ন রাখবে না, আর তুমি চিরকাল সন্দেহে দুলবে, চিরকাল যন্ত্রণা পাবে?” আর সঙ্গে সঙ্গে আমার আত্মকরুণা উবে গেল, তার জায়গায় এল অদ্ভুত একটি মনোভাব। হয়ত আপনি বিশ্বাস করবেন না, সে অনুভূতি আনন্দের; এবার আমার যন্ত্রণার শেষ হবে, এখন ওকে শাস্তি দিতে পারব, ওকে সরাতে পারব, বিদ্বেষের হাতে নিজেকে তাহলে ছেড়ে দিতে পারব। আর বিদ্বেষের হাতেই নিজেকে ছেড়ে দিলাম আমি — জানোয়ার বনে গেলাম, হিংস্র ধূর্ত জানোয়ার।

‘ “দাঁড়াও,” বললাম ইয়েগরকে, ও ড্রয়িং-রুমে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, “এই যে, রসিদটা নিয়ে মালপত্তরের জন্য স্টেশনে যাও। তাড়াতাড়ি একটা গাড়ি নিয়ে যাও। জলদি — ”

‘করিডর হয়ে নিজের কোট আনতে গেল ও। ওদের চমকে দেবে আশঙ্কা করে ওর সঙ্গে ওর ঘরে গেলাম, কোট না পরা পর্যন্ত সবুর করলাম। অন্য

ঘর পেরিয়ে ড্রয়িং-রুম থেকে কানে এল মৃদু কণ্ঠে আলাপ, ছুরি ও রেকাবের ঠুনঠুন। ওরা খাচ্ছে, দরজার ঘণ্টার শব্দ কানে যায় নি। "ওরা যেন না বেরিয়ে আসে এখন!'' ভাবলাম। আস্ত্রাখান কলার দেওয়া কোট পরে চলে গেল ইয়েগর। দরজা পর্যন্ত ওর সঙ্গে গিয়ে দোর বন্ধ করে দিলাম। এবার একলা, এবার কিছু করতে হবে জেনে মনে এল গম্ভীর একটা ভয়। কীভাবে করব তখনো জানি না। শুধু জেনেছিলাম এবার সবকিছু শেষ, ও নির্দোষ সে কথাটা আর ওঠে না, ওকে শাস্তি দেবার, ওর সঙ্গে সম্পর্ক চোকানোর সময় এসেছে।

'আগে আগে ইতস্তত করেছি, নিজেকে বলেছি, "হয়ত এটা সত্যি নয়, হয়ত ভুল আমার।" এবার দ্বিধা নেই। সবকিছু চূড়ান্তভাবে স্থির। আমাকে লুকিয়ে ওর সঙ্গে একলা, রাত্রে! সাবধানতা জলাঞ্জলি দিয়েছে বেমালুম। কিম্বা হয়ত আরো খারাপ: এই ধাষ্টামো, পাপ করার এই বেপরোয়া ভাবটা হয়ত ইচ্ছাকৃত, কোনো দোষ নেই প্রমাণ করার জন্য ইচ্ছাকৃত ধাষ্টামো। সবকিছু জলের মতন স্পষ্ট। কোনো সন্দেহ আর নেই। শুধু একটা জিনিসে আমার ভয়: পালিয়ে যেন না যায়, প্রবঞ্চনার কোনো নতুন ফন্দি করে, চাক্ষুষ প্রমাণ ও শাস্তিদানের সুযোগ থেকে আমাকে

বঞ্চিত না করে। তাই ওদের হাতেনাতে ধরে ফেলার উদ্দেশ্যে, ড্রয়িং-রুম না হয়ে, করিডর ও বাচ্চাদের ঘর হয়ে পা টিপে গেলাম হলের দিকে, যেখানে ওরা বসেছিল।

'বাচ্চাদের প্রথম ঘরে ছেলেগুলো ঘুমোচ্ছে। বাচ্চাদের দ্বিতীয় ঘরে নড়েচড়ে উঠল আয়াটা, একটু হলে ঘুম ভেঙে যেত। সবকিছু জানতে পারলে ও কী ভাববে, সেটা কল্পনা করে এমন তীব্র আত্মকরুণা হল যে, চোখের জল সামলাতে পারলাম না। পাছে বাচ্চাগুলোর ঘুম ভেঙে যায়, পা টিপে টিপে দৌড়িয়ে করিডর হয়ে গেলাম পড়ার ঘরে, সেখানে সোফায় ধপাস করে বসে পড়ে ডুকরে উঠলাম।

'মনে মনে বলছিলাম: "বাপ-মায়ের ছেলে আমি, সৎ লোক; সারা জীবন সুখী সংসারের স্বপ্ন দেখেছি; ওর স্বামী আমি, কখনো ওকে ঠকাই নি— আর ও পাঁচছেলের মা, কণ্ঠলগ্না হয়েছে একটা বাজিয়ের, বাজিয়েটার ঠোঁটজোড়া লাল বলে! ও মানুষ নয়, ও কুত্তী, নেড়ি কুত্তী! পাশের ঘরে বাচ্চারা, যে বাচ্চাদের ভালোবাসার কী ভানটা না করে এসেছে সারা জীবন! আর কীসব কথাই না লিখেছে চিঠিতে! বেহায়ার মতো লোকটার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে! সত্যিই তো, কী জানি আমি? হয়ত বরাবর এরকম করে

এসেছে। হয়ত চাকরবাকরের ঔরসে বাচ্চা পয়দা করে আমার বাচ্চা বলে চালিয়েছে। কাল বাড়ি ফিরলে আমার সঙ্গে দেখা করত, মধুরভাবে চুল বাঁধা, লোভনীয় কটিরেখা, চলাফেরার ভঙ্গিতে কী অলস লাবণ্য (ওর সুন্দর ঘৃণ্য মুখটার সমস্ত খুঁটিনাটি চোখের সামনে দেখলাম), আর আমার বুকে ঈর্ষার সেই কালসাপটা দিনে দিনে বিষিয়ে দিত আমাকে। আয়া কী ভাবে, কী ভাবে ইয়েগর! আর বেচারী লিজা! এরি মধ্যে তো ও কিছু কিছু টের পেয়েছে। কী নির্লজ্জ বেহায়াপনা! কী মিথ্যা! কী পশুসুলভ লালসা, যেটা আমার হাড়ে হাড়ে চেনা!"

'উঠে দাঁড়াতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না। বুক এত জোরে ধড়াস্ ধড়াস্ করছিল যে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারলাম না। অপস্মারে মারা পড়ব নিশ্চয়। ও আমাকে মেরে ফেলবে। তাই তো ও চায়। কিন্তু আমাকে খুন করবে ও? না, তাহলে তো অত্যন্ত সহজে পার পেয়ে যাবে, সে আনন্দ ওকে দেব না। কিন্তু আমি বসে আছি, ওদিকে ওরা খাচ্ছে আর হাসছে আর... হ্যাঁ, খুব টাটকা মাল না হতে পারে, তবু ওকে ভোগ করায় লেশমাত্র সঙ্কোচ নেই লোকটার: যাই হোক, চেহারাটি তো মন্দ নয়, সবচেয়ে বড়ো কথা হল, আমার স্ত্রী অন্তত ওর মহার্ঘ স্বাস্থ্যের কোনো

বিপদ ঘটাবে না। গত সপ্তাহে পড়ার ঘর থেকে স্ত্রীকে বের করে দিয়েছিলাম, জিনিসপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম, সে ঝগড়াটার কথা মনে করে নিজেকে শুধালাম, "তখনি ওকে মেরে ফেলি নি কেন?" সে সময়ে নিজের অবস্থাটার কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মনে পড়ল; মনে পড়া শুধু নয় — ভাঙার, ছারখার করার যে বাসনা আমায় তখন পেয়ে বসেছিল, সেটাকে ফের টের পেতে লাগলাম। মনে আছে কোনো কিছু করার কী বাসনা তখন হয়েছিল, আর সেটা করার পক্ষে যেটুকু দরকার, সেই বিবেচনাটুকু ছাড়া আর সব কিছুই বিতাড়িত হল মাথা থেকে। আমার অবস্থাটা জন্তুর মতো বা সেরকম লোকের মতো, বিপদ-কালের দৈহিক উত্তেজনায় যে সঠিক ভাবে, বিনা তাড়াহুড়োয়, এক মিনিট সময় নষ্ট না করে কাজ করে চলে কেবল একটি মাত্র নির্দিষ্ট লক্ষ্যে।'

২৭

'প্রথমেই জুতো খুলে ফেলে মোজা পায়ে সোফার কাছে গেলাম, সেখানে দেয়ালের ওপর বন্দুক ও হাতিয়ার টাঙ্গানো, একটি বাঁকা দামাস্ক ছোরা নিলাম, কখনো ব্যবহার করা হয় নি সেটাকে, অত্যন্ত ধারালো। খাপ থেকে বের করলাম ছোরাটা। মনে আছে সোফার

পেছনে পড়ে গেল খাপটা, মনে আছে নিজেকে বলেছিলাম, "পরে এটাকে কুড়িয়ে না নিলে নয়, নইলে হারিয়ে যাবে।" এতক্ষণ গায়ে ওভারকোট ছিল, সেটা খুলে নিঃশব্দে মোজা পায়ে গেলাম সেখানে।

'চুপিচুপি গিয়ে হঠাৎ দরজা খুলে ফেললাম। ওদের মুখভাবের কথাটা মনে আছে। মুখভাবের কথাটা মনে আছে কেননা সেটা দেখে যন্ত্রণাময় আনন্দে বুক টনটন করে উঠেছিল। ভাবটা বিভীষিকার। ঠিক সেটাই চেয়ে ছিলাম। আমাকে দেখার প্রথম মুহূর্তটিতে ওদের মুখের মরিয়া আতঙ্কের যেই ভাবটা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে থাকবে। লোকটা বোধ হয় বসেছিল টেবিলের পাশে, কিন্তু আমাকে দেখে বা আমার আওয়াজ পেয়ে লাফিয়ে উঠে আলমারিটার দিকে পিঠ করে দাঁড়ায়। ওর মুখে ছিল শুধুই বিভীষিকার একটা নিঃসন্দেহ ভাব। আমার স্ত্রীর মুখের ভাবটাও বিভীষিকার, কিন্তু বিভীষিকার সঙ্গে অন্য কিছু ছিল। শুধু বিভীষিকা হলে হয়ত যা ঘটল, তা ঘটত না। ওর মুখে, অন্তত প্রথম সেই মুহূর্তটিতে মনে হয়েছিল, আরো ছিল হতাশার বিরক্তির একটা ছাপ, প্রেম-করায়, সুখে বাধা পড়েছে বলে। ওর সুখে যেন বাধা না পড়ে, এ ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু চায় না সে। মুখভাবটা ক্ষণিক মাত্র।

লোকটার বিভীষিকার ভাব কেটে গিয়ে তক্ষুনি এল জিজ্ঞাসার একটা ভাব: মিথ্যে বলা সম্ভব কি না? সম্ভব হলে এখুনি শুরু করতে হয়। সম্ভব না হলে, একটা কিছু ঘটল বলে। কিন্তু সেটা কী? ও আমার স্ত্রীর দিকে তাকাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। লোকটার দিকে তাকিয়ে হতাশা ও বিরক্তির ভাবটা কেটে গিয়ে স্ত্রীর মুখে এল ওর জন্য উৎকণ্ঠার ছাপ। অন্তত আমার তাই মনে হল।

'মুহূর্তখানেক দোরগোড়ায় রইলাম দাঁড়িয়ে, ছোরাটা পেছন দিকে রাখা। ঠিক সেই মুহূর্তটিতে লোকটা হাসল, প্রায় হাস্যকর গোছের নির্বিকার গলায় বলল:

' "আমরা এই একটু বাজাচ্ছিলাম..."

' "একেবারে ভাবি নি," ওর গলার সুর নকল করে স্ত্রী শুরু করল।

'কিন্তু কথা শেষ করার সুযোগ দুজনের কেউই পেল না। গত সপ্তাহের সেই প্রচণ্ড ক্রোধে আবার আমি আচ্ছন্ন। ভাঙার, চুরমার করার আবার সেই তাড়না; ক্রোধের উল্লাসে নিজেকে ছেড়ে দিলাম।

'কথা শেষ করার সুযোগ পেল না দুজনের কেউ। যেটা ঘটবে বলে লোকটার ভয় সেটা ঘটতে শুরু করেছে, ওদের কথা এক নিমেষে বন্ধ করে দিল সেটা।

ঝাঁপিয়ে পড়লাম স্ত্রীর ওপর, ছোরাটা তখনো লুকোনো, পাছে ওর স্তনের নিচে বুকের কাছে সেটা বসাতে লোকটা বাধা দেয়। প্রথম থেকে জায়গাটি ঠিক করে রেখেছিলাম। ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা ছোরাটা দেখে আমার হাত ধরে ফেলল, ও যে এটা করবে ভাবি নি।

'"কী করছেন, পাগলামি ছাড়ুন! বাঁচাও!" চিৎকার করে উঠল ও।

'হাতটা এক ঝটকায় ছিনিয়ে নিয়ে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম নিঃশব্দে। চোখোচোখি হল, হঠাৎ ওর ঠোঁট পর্যন্ত কাগজের মতো শাদা হয়ে গেল, চোখে এল অদ্ভুত একটা দীপ্তি, আর পিয়ানোটার নিচে কার্ণিক মেরে ছুটল দরজার দিকে, ও যে ওটা করবে তাও ভাবি নি। ওর পিছু ধাওয়া করতাম, কিন্তু বাঁ হাতে কীসের ভার। আমার স্ত্রী। চেষ্টা করলাম নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার। আরো শক্ত করে আমাকে আঁকড়ে ধরে যেতে দিল না ও। অপ্রত্যাশিত এই বাধায়, এই ভারে, ওর ঘিনঘিনে স্পর্শে রাগ আরো চড়ে গেল। টের পেলাম একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছি, নিশ্চয় নিজেকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে, তাতে খুশি হলাম। প্রাণপণ শক্তিতে এক ঝটকায় বাঁ হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম, কুনুই দিয়ে মারলাম সোজা ওর

মুখে। আর্তনাদ করে ও হাতটা ছেড়ে দিল। লোকটার পেছনে দৌড়বার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মোজা পায়ে স্ত্রীর নাগরকে ধাওয়া করাটা হাস্যকর হবে, হঠাৎ মনে হল। হাস্যকর হতে চাই না, হতে চাই ভয়ঙ্কর। ক্রোধের সেই উন্মত্ত অবস্থাতেও ওদের ওপর আমার প্রতিক্রিয়াটি কী হচ্ছে সে বিষয়ে বরাবর সজাগ ছিলাম, আর সে প্রতিক্রিয়া আমাকেও কিছুটা চালাচ্ছিল। ফিরলাম ওর দিকে। সোফায় পড়ে গিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, যে চোখটায় চোট দিয়েছিলাম সেটাতে একটা হাত রাখা। আমার প্রতি, শত্রুর প্রতি, ভয় ও ঘৃণার ছাপ মুখে। ইঁদুর ধরা পড়েছে, কলটা তুলে ধরলে তার মুখে আসে এ ধরনের ছাপ। আমি অন্তত ওর মুখে এই ভয় ও ঘৃণার ছাপ ছাড়া আর কিছু দেখি নি। ঠিক সেই ধরনের ভয় ও ঘৃণা, যাতে অপর পুরুষটির প্রতি প্রেম জাগার কথা। তা সত্ত্বেও ও চুপ করে থাকলে হয়ত আত্মসংযম করতে পারতাম, যা করেছিলাম তা হয়ত করতাম না। কিন্তু হঠাৎ ও কথা বলতে শুরু করল, যে হাতে ছোরা সে হাতটা চেপে ধরল।

‘“পাগলামি ছাড়ো, করছ কী, কী হল তোমার? কিছু করি নি আমরা, কিছু না, কিছু না! গা ছুঁয়ে বলছি!”

'ইতস্তত হয়ত করতাম, কিন্তু ওর শেষ কথাগুলোর অর্থ ঠিক উল্টো আমার কাছে, তার মানে, সবই ঘটেছে, তার প্রত্যুত্তর দিতে হবে। আর যে অবস্থায় নিজেকে নিয়ে গিয়েছিলাম, যে অবস্থাটা crescendo*য় যাচ্ছে, এমনি ভাবেই যা উত্তাল হয়ে উঠতে থাকবে, উত্তরটা হওয়া চাই তারই উপযোগী। উন্মত্ততারও নিজস্ব নিয়ম আছে।

'"মিথ্যে কথা, মাগী কোথাকার!" চেঁচিয়ে বাঁ হাত দিয়ে ওর হাত চেপে ধরলাম, কিন্তু ও জোর করে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। ছোরাটা ফেলে না দিয়ে বাঁ হাতে টুঁটি চেপে চিৎ করে ফেললাম ওকে, গলা পিষতে লাগলাম। কী শক্ত গলা... টুঁটি ছাড়িয়ে নেবার আশায় দুই হাতে সে হাতটা চেপে ধরল আমার, ঠিক যেন এরি অপেক্ষায় ছিলাম, প্রাণপণে বুকের বাঁ দিকে পাঁজরের নিচে ছোরাটা বসিয়ে দিলাম।

'লোকে যে বলে ক্রোধে উন্মত্ত অবস্থায় কী করছে তার হুঁশ থাকে না, সেটা বাজে কথা, মিথ্যে কথা। প্রত্যেকটি জিনিস মনে আছে, ভুলি নি নিমেষের জন্য। আমার প্রচণ্ড ক্রোধে যত বাষ্পের সৃষ্টি, তত উজ্জ্বল আমার চেতনা, তাই যা করছি তা সবকিছু চোখে

---

* চরমের দিক।

না পড়ে উপায় ছিল না। প্রতিটি মুহূর্তে জানতাম কী করছি। যা করব আগে থেকেই জানতাম, সেটা বলতে পারি না, কিন্তু ঠিক সে মুহূর্তে কী করছি আমার জানা ছিল, এমনকি মনে হল একটু আগে থেকে জানতাম, জানতাম এই জন্য যেন পরে অনুশোচনা করতে পারি, বলতে পারি নিজেকে যে হয়ত থামা যেত। জানতাম পাঁজরার নিচে ছোরা বসাব, ছোরাটা ঢুকবে সেখানে। ছোরা বসাবার মুহূর্তে জানতাম ভয়ংকর কিছু একটা করছি, আগে কখনো এর মতো কিছু করি নি, যা করছি তার পরিণাম হবে সাংঘাতিক। বিদ্যুতের মতো মনে সে চেতনার ঝিলিক আর চেতনার পরে তক্ষুনি কর্ম। অস্বাভাবিক স্পষ্ট সে কর্মের উপলব্ধি। মনে আছে বডিসের আর কী একটার ক্ষণিক প্রতিরোধ বোধ করেছিলাম, তারপর নরম মাংসে বসে গেল ফলকটা। দুহাতে ছোরাটা আঁকড়ে ধরল ও, হাত কেটে গেল, কিন্তু ফলকটা পারল না আটকাতে। পরে জেলে থাকার সময়ে, তখন আমার নৈতিক রূপান্তর ঘটেছে, মুহূর্তটির কথা অনেক দিন ভেবেছি, যথাসম্ভব মনে করে তলিয়ে দেখতে চেয়েছি। একটি স্ত্রীলোককে হত্যা করছি, ইতিমধ্যে হত্যা করেছি, একটি অসহায় স্ত্রীলোককে, নিজের স্ত্রীকে, এই ভয়ংকর চেতনাটা যে মুহূর্তের জন্য, মাত্র মুহূর্তের জন্য, কর্মের আগের

সেই দ্রুত মুহূর্তটিতে আমায় আচ্ছন্ন করেছিল তা মনে পড়ে, উপলব্ধিটির ভয়ংকরতা আমার মনে আছে, সেজন্য সিদ্ধান্তে এসেছি এমনকি ঝাপসা মনেও পড়ছে যে, ছোরাটা বসিয়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ টেনে বের করে নিয়েছিলাম সেটাকে, চেয়েছিলাম কৃতকর্ম শোধরাই, ক্ষান্ত হই। মুহূর্তখানেক নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম, কী ঘটবে দেখার প্রতীক্ষায়, যা করেছি সেটা শোধরানো সম্ভব কিনা। ও লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, চিৎকার করে বলল:

' "আয়া! আমাকে ও মেরে ফেলল!"

'শব্দ শুনে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল আয়া। আমি দাঁড়িয়েই রইলাম, অপেক্ষা করছি, বিশ্বাস হচ্ছিল না। এই সময় ওর বডিসের নিচে থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল। শুধু তখনি খেয়াল হল শোধরানো আর যায় না। তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেললাম যে, শোধরাবার প্রয়োজনও নেই, এটাই আমি চেয়েছিলাম, এটাই ঘটা উচিত। দাঁড়িয়ে রইলাম, ও পড়ে গেল, "হে ভগবান!" বলে চিৎকার করে আয়া ছুটে এল ওর কাছে, আর শুধু তখুনি ছোরাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

' "উত্তেজিত হলে চলবে না, যা করছি ভেবেচিন্তে দেখতে হবে," বললাম নিজেকে, ওর বা আয়ার দিকে

তাকালাম না। চিৎকার করে আয়া ডাকল ঝিকে। করিডর হয়ে গিয়ে ঝিকে পাঠিয়ে দিলাম, গেলাম নিজের ঘরে। "এখন কী করা দরকার?" শুধালাম নিজেকে। কী করা উচিত বুঝলাম তক্ষুনি। পড়ার ঘরে গিয়ে সোজা দেয়ালের কাছে গিয়ে একটা রিভলভার নামিয়ে নিলাম, পরীক্ষা করে দেখলাম সেটাকে, টোটা ভরা ছিল — লেখবার টেবিলের ওপরে রাখলাম। তারপর সোফার পেছনে পড়ে যাওয়া ছোরার খাপটা তুলে সোফায় বসে পড়লাম।

'অনেক, অনেকক্ষণ বসে রইলাম। কিছু ভাবলাম না, মনে পড়ল না কিছু। সোরগোল কানে এল। গাড়ি করে কে যেন এল আওয়াজ পেলাম, তারপর আর একজন কে। দেখলাম ইয়েগর আমার মালপত্র ঘরে নিয়ে এসেছে। যেন মালপত্রে কারো এখনো দরকার!

'"কী ঘটেছে শুনেছ?" বললাম ওকে। "দারোয়ানকে বলো পুলিশে খবর দিতে।"

'কোনো কথা না বলে ও বেরিয়ে গেল। উঠে দরজা বন্ধ করে দিলাম, সিগারেট আর দেশলাই বের করে সিগারেট খেতে আরম্ভ করলাম। সিগারেটটা শেষ করতে না করতে ঘুম এসে গেল। ঘণ্টাদুয়েক ঘুমিয়েছিলাম বোধ হয়। মনে আছে স্বপ্ন দেখেছিলাম ওর আর আমার ভাব হয়ে গিয়েছে; ঝগড়া করেছিলাম,

মিটে গেছে, দুজনের মধ্যে কী একটু খিঁচ্, কিন্তু ভাব হয়ে গিয়েছে। দরজায় কে যেন ধাক্কা দেওয়াতে ঘুম ভেঙে গেল। "পুলিশ এসেছে," জেগে উঠে মনে হল। "ওকে তো মনে হয় খুন করেছি। কিন্তু হয়ত ও-ই এসেছে, কিছুই ঘটে নি।" আবার দরজায় ধাক্কা। সাড়া দিলাম না, ভাবতে লাগলাম ব্যাপারটা সত্যি ঘটেছে কি ঘটে নি? হ্যাঁ, ঘটেছে। মনে পড়ে গেল ওর বডিসের সেই বাধা, তারপর ছোরাটার বসে যাওয়া, আর শিরদাঁড়া শির শির করে উঠল। "হ্যাঁ ঘটেছে। এবার আমার পালা," বললাম মনে মনে। কিন্তু সেটা বলার সঙ্গে সঙ্গে জানলাম আত্মহত্যা করব না। তবু উঠে একবার রিভলভারটা নিলাম। অদ্ভুত ব্যাপার; মনে পড়ে গেল এর আগে কতবার না আত্মহত্যার কথা ভেবেছি, সেদিনই যেমন ট্রেনে ভেবেছিলাম; মনে হত জিনিসটা অত্যন্ত সহজ — সহজ, কেননা তাতে ও কী শাস্তি পাবে জানতাম। আর এখন আত্মহত্যা করার কথাটুকু ভাবতে পারলাম না, করা তো দূরের কথা। "কেন আত্মহত্যা করব?" শুধালাম নিজেকে, জবাব পেলাম না কোনো। আবার দরজায় সেই ধাক্কা। "প্রথমে দেখতে হবে কে ধাক্কা দিচ্ছে। আত্মহত্যা করা চলতে পারে পরে।" রিভলভারটা নামিয়ে কাগজ চাপা দিলাম। দরজায়

গিয়ে খিল খুললাম। আমার শালী, সহৃদয়া বোকাসোকা বিধবা।

' "ভাসিয়া! কী করেছ?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি; সর্বদাই উপচে পড়তে প্রস্তুত চোখের জল আর বাঁধ মানল না এবার।

' "কী চাই তোমার?" রূঢ়ভাবে জিজ্ঞেস করলাম। রূঢ় হওয়ার কারণ নেই, কোনো দরকার নেই তার, বুঝেও অন্য সুরে কথা বলতে পারলাম না।

' "ভাসিয়া, ও তো মরতে বসেছে! ইভান ফিওদরভিচ তাই বললেন।" ইভান ফিওদরভিচ ডাক্তার, আমার স্ত্রীর ডাক্তার, তার পরামর্শদাতা।

' "ও, তিনিও এসেছেন নাকি?" জিজ্ঞেস করলাম, বুঝলাম স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ আবার চড়ছে। "বেশ, তাতে কী?"

' "ভাসিয়া, ওর কাছে যাও একবারটি। ও, কী ভয়ঙ্কর!" তিনি বললেন।

' "ওর কাছে যাব?" নিজেকে শুধালাম। তক্ষুনি উত্তর মিলল। হ্যাঁ, যেতে হবে অবশ্য, যাওয়াটা দরকার, সর্বদা তাই করা হয়, আমার মতো নিজের স্ত্রীকে খুন করলে লোকের অবশ্য যাওয়া দরকার স্ত্রীর কাছে। "তাই যদি করা হয়," নিজেকে বললাম, "তাহলে যেতেই হবে। আর দরকার হলে ওটা করারও

সময় পাব,” নিজেকে গুলি করার সংকল্পের কথা ভেবে চললাম ওর কাছে। “এবার যত বাখানি মুখবিকৃতির পালা, কিন্তু আমি টলছি না,” বললাম নিজেকে।

‘ “দাঁড়াও,” ওর বোনকে বললাম, “মোজা পায়ে গেলে হাস্যকর দেখাবে। চটিজোড়াটা পরে নিতে দাও অন্তত।” ’

২৮

‘আশ্চর্য ব্যাপার! ঘর থেকে বেরিয়ে অত্যন্ত পরিচিত সব কামরা হয়ে যেতে যেতে আবার আশা জাগল যে কিছু ঘটে নি। কিন্তু আয়োডোফর্ম, কার্বলিক এ্যাসিড ইত্যাদি ডাক্তারী শয়তানির গন্ধে স্তম্ভিত লাগল। না, ঘটেছে তাহলে। বাচ্চাদের পড়ার ঘর বরাবর করিডর হয়ে যাচ্ছি, লিজাকে দেখলাম। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ও চাইল আমার দিকে। আমার এমনকি মনে এল পাঁচটা বাচ্চার সবকটি ওখানে, সবাই এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। দরজায় পেঁছলাম। দরজা খুলে দিয়ে ঝি নিজে বেরিয়ে গেল। প্রথমে চোখে পড়ল আমার স্ত্রীর ধূসরোজ্জ্বল শাদা পরিচ্ছদ চেয়ারে পড়ে আছে, কালো হয়ে উঠেছে রক্তে। হাঁটু মুড়ে ও শুয়ে আছে আমাদের জোড়াখাটে, আমি যেখানে শুতাম সে দিকটায়, ওইটাই সবচেয়ে

সহজ। বালিশের ওপর প্রায় সমতল ক'রে ওকে শোয়ানো হয়েছে। গায়ের জ্যাকেটটা খোলা। ক্ষতচিহ্নের ওপর কী একটা চাপা দেওয়া। ঘরে আয়োডোফর্মের তীব্র গন্ধ। সবচেয়ে বেশী করে আমার স্তম্ভিত লাগল ওর গাল নাকের কিছুটা আর একটা চোখের নিচুটা ফুলে গিয়েছে—কালশিটে পড়েছে, আমাকে আটকাতে গিয়ে কুনুই'এর ধাক্কা খাওয়ার ফল। ওর চেহারায় সুন্দর বলে আর কিছু নেই, এমনকি কদর্য মনে হল ওকে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লাম।

' "যাও, ওর কাছে যাও," বলল শালী।

'ভাবলাম, "হয়ত ও ক্ষমা ভিক্ষা করতে চায়। মাপ করব? হ্যাঁ, ও মরে যাচ্ছে, তাই মাপ করা চলে," ভাবলাম, চেষ্টা করলাম বদান্য হবার। সোজা গেলাম ওর কাছে। বহুকষ্টে চোখ তুলে তাকাল ও, একটা চোখ চোট-খাওয়া, থেমে থেমে কষ্ট করে বলল:

' "তোমার সাধ মিটলে তাহলে... আমায় মেরে ফেললে।" আর ওর শারীরিক যন্ত্রণা, ওর মৃত্যুবোধ ছাপিয়ে ফুটে বেরল কঠিন পাশবিক ঘৃণার সেই পুরনো পরিচিত ভাবটি। "কিন্তু তোমাকে... ছেলেমেয়েদের দেব না... তাদের নেবে ও..." (ওর বোন।)

'আসল কথা যেটা আমার বিবেচনায় — ওর পাপ, ওর প্রবঞ্চনা, সেটা উল্লেখ করার যোগ্য বলে ও যেন

মনে করল না।

'"নিজের কান্ড দেখে আহ্লাদ করো," বলল ও, দরজার দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ওর বোন আর ছেলেমেয়েগুলো। "কী করেছ একবার দেখ।"

'তাকালাম ছেলেমেয়েগুলোর দিকে, তারপর ওর দিকে, ওর ছড়ে যাওয়া ফোলা মুখের দিকে, আর সেই প্রথম ভুলে গেলাম নিজেকে, ভুলে গেলাম আমার অধিকার আর গর্বের কথা; সেই প্রথম ওকে দেখলাম মানুষ হিসেবে। আর যা কিছুতে আমার মান গেছে বলে ভেবেছি, আমার ঈর্ষা, সব এত তুচ্ছ ঠেকল, আমি যা করেছি তা এতই গুরুতর, যে নতজানু হয়ে বসে ওর হাতে মুখ চেপে মাপ চাইব ভেবেছিলাম। কিন্তু সাহস হল না।

'চুপ করে গেল ও, চোখ বুজল, স্পষ্টত আর কথা বলার শক্তি নেই। তারপর ওর ক্ষতবিক্ষত মুখ থরথর করে কেঁপে উঠল, কুঁচকে গেল। দুর্বল হাতে আমাকে কাছ থেকে ঠেলে দিল।

' "কেন এটা ঘটল? কেন?"

' "মাপ করো আমায়," আমি বললাম।

' "মাপ? যত বাজে কথা!.. শুধু যদি মরতে না হত!.." নিজেকে একটু তুলে জ্বরবিকারগ্রস্ত জ্বলজ্বলে

চোখ আমার চোখে রেখে চেঁচিয়ে বলল ও। "হ্যাঁ, তোমার সাধ তো মিটেছে!.. তুমি আমার দুচক্ষের বিষ!.. আঃ, ও!" আর্তনাদ করে উঠল ও, বিকারের ঝোঁকে কিছু একটাতে ভয় পেয়েছে বোঝা গেল। "নাও, মারো না, খুন করো! আমি ভয় পাই না... কিন্তু সবাইকে মেরে ফেলো, সবাইকে! ওকেও! পালাল, পালাল ও!"

'ওর বিকার আর কাটল না। আমাদের কাউকে আর চিনতে পারল না। সেই দিনই দুপুরবেলায় মারা গেল। তার আগে, আটটার সময়ে আমাকে ওরা নিয়ে গেল থানায়, তারপর জেলে। সেখানে বিচারের অপেক্ষায় এগারোটা মাস নিজেকে নিয়ে অনেক ভাবলাম, ভাবলাম আমার অতীতের কথা, বুঝতে পারলাম সেটা কী। তৃতীয় দিন থেকে বুঝতে শুরু করি। তৃতীয় দিনে ওরা আমাকে সেখানে নিয়ে গেল...'

ভদ্রলোক কী একটা বলতে চাইছিলেন, কিন্তু চাপা কান্না রুধতে না পারায় থামতে হল। বহুকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার শুরু করলেন:

'ওকে কফিনে দেখে আমার বোঝার পালা শুরু হল।' হাঁপিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি বলে চললেন তিনি।

'ওর মরা মুখ যখন দেখলাম, শুধু তখনি বুঝলাম কী করেছি। বুঝলাম আমি, আমিই ওকে মেরে ফেলেছি, এককালে ও ছিল জীবন্ত, উষ্ণ, গতিচঞ্চল, আর এখন আমার জন্যই ও নিশ্চল, ঠাণ্ডা, মোমের মতো, যা করেছি তার আর কখনো, কোথাও, কিছুতে প্রতীকার নেই। এর মধ্য দিয়ে না গেলে ব্যাপারটা উপলব্ধি করা যায় না... ওঃ, ওঃ, ওঃ!' ভদ্রলোক আর্তনাদ করে উঠলেন কয়েক বার, তারপর চুপ করে গেলেন।

অনেকক্ষণ কোনো কথা না বলে দুজনে বসে রইলাম; ভদ্রলোক ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছিলেন, চাপা কান্নায় শরীর কাঁপছে।

'মাপ করবেন...'

মুখ ফিরিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন, গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে। সকাল আটটায় আমার গন্তব্য স্টেশনে ট্রেনটা এসে পড়ল, বিদায় নিতে গেলাম ওঁর কাছে। ঘুমোচ্ছেন না মটকা মেরে পড়ে আছেন বুঝতে পারলাম না, নড়ছিলেন না ভদ্রলোক। ওঁর হাত ছুঁলাম। কম্বলটা টেনে সরিয়ে দিলেন ভদ্রলোক, দেখলাম ঘুমোন নি।

'আসি তাহলে,' হাতটা ওঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম।

উনি হাতটা আমাকে দিলেন ক্ষীণ হেসে, হাসিটা এত করুণ যে আমার কান্না পেল।

'মাপ করবেন,' যা বলে কাহিনীর উপসংহার করেছিলেন তারই পুনরুক্তি করলেন তিনি।

১৮৯১

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন

২১, জুবোভস্কি বুলভার

মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

Л. Н. Толстой, «Повести»
на языке бенгали.
Перевод сделан по книгам:
Л. Н. Толстой, Собрание сочинений,
Москва, 1952 г.